উনিশ শতকের বামা লেখনী

কৃষ্ণকলি বিশ্বাস



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা * ২০০০

UNISH SATAKER BAMA LEKHANI
by Krishnakali Biswas

প্রকাশক ঃ
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০০, কলকাতা

প্রচ্ছদ ঃ সত্যব্রত চক্রবর্তী

মুদ্রক ঃ
শঙ্কর প্রসাদ নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১।১ই. রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

ঁরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।

ভূমিকা

প্রেরণাই গতি, সম্মুখে এগিয়ে চলবার সাথী। ঊনবিংশ শতাব্দী নবজাগরণের। পুরুষের ছায়ায়, পর্দার আড়ালে নিজেকে গুটিয়ে রাখা নারীসমাজকেও এ শতাব্দী কাছে টেনে নিয়েছে। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে নানান কুসংস্কার, অশিক্ষার অন্ধকারে আবদ্ধ নারীকে আলোর পথে নিয়ে আসবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এ শতাব্দীর বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব।

সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, এ সমস্ত বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ নারীকে মুক্ত করবার প্রয়াস নিয়েছিলেন যে সমাজ সংস্কারকগণ, তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেই তাঁরা নারীকে সমাজের নানান অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং কিছুটা শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে পেরেছেন। নারী-শিক্ষার সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্ধদশক পরে। কিন্তু সূচনাপর্ব থেকেই নারীগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। তাই অন্তঃপুরবাসিনী নারী কলম তুলে নিয়েছেন এবং নিজেদের কথা বলতে পেরেছেন।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে এসে তাই একশত বৎসর পূর্বেকার লেখিকার লেখনী আমাকে নাড়া দিয়েছে এবং এখানে গবেষণার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখিকাদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। দশজন মহিলা প্রাবন্ধিকের ছোট-বড় মাপের কিছু প্রবন্ধ, যাঁরা হলেন—কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবী, মানকুমারী বসু, রাজলক্ষ্মী দেব্যা, হেমলতা সরকার এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত, প্রমুখের রচনা আলোচিত হয়েছে।

কৈলাসবাসিনী দেবীর প্রবন্ধে তৎকালীন নারীর হীনাবস্থা অর্থাৎ বঞ্চনার চিত্র ফুটে উঠেছে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর রচনায় নারীশিক্ষার সঙ্গে শিশু শিক্ষার কথা স্থান পেয়েছে। এছাড়াও স্বাদেশিকতার বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'ইংরাজ নিন্দা ও দেশানুরাগ" প্রবন্ধে। স্বর্ণকুমারী দেবীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পুস্তক 'পৃথিবী' সম্পূর্ণ তথ্যাভিত্তিক। জীবনীমূলক পুস্তক রচনায় পারদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে প্রসন্নময়ী দেবীর 'তারাচরিত' গ্রন্থ। শরৎকুমারী দেবীর রম্য-রচনাগুলি যথাক্রমে, 'যৌতুক' (গল্প), 'কলিকাতাব স্ত্রী সমাজ', 'শাশুড়ী ও

বৌ', 'একাল ও একালের মেয়ে', 'মেয়েযজ্ঞি', 'আদরের না অনাদরের', যেখানে আছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নারীসমাজের কথা। লেখিকা তাঁর রচনায় তৎকালীন সমাজের নারীর অবস্থানের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। 'সোনার-ঝিনুক' গল্পে নারীর ভিতরকার সুপ্ত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখিকা, যেখানে অনু নিজের সন্তানের সুখের জন্য নামবদল করে সুযোগ গ্রহণ করবার মতো ঘৃণ্য কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

স্বামীর জীবনের কর্মধারার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইন্দিরা দেবী, তাঁর 'প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন চরিত ও প্রবন্ধকুসুম' গ্রন্থে। সদ্য বিধবা যুবতীর অন্তরের ব্যথার জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে মানকুমারী বসুর 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়' প্রবন্ধ গ্রন্থের ছোট-মাঝারি বেশ কিছু প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মধর্মের বিষয় মোটামুটি একটি চিত্র পাই রাজলক্ষ্মী দেব্যার 'ব্রাহ্ম সমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব' প্রবন্ধ গ্রন্থের মাধ্যমে। ভারতের মূলমন্ত্র ঐকতা, এর সঠিকতার প্রকাশ হেমলতা সরকারের ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 'ভারতের সারকথা'য়। ঊনবিংশ শতকের সুপরিচিত মহিলা-কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর (দত্ত) লেখনীতে যেমন বেরিয়ে এসেছে বহু মনমুগ্ধকর কবিতা, তেমনি ইনিই যে একজন সুপত্র লেখিকা এর প্রকাশ তার 'হিন্দু মহিলার পত্রাবলী'-গ্রন্থ।

দশজন লেখিকার কিছু উপন্যাস, বড় গল্প, ছোট গল্প, আখ্যায়িকা, এবং ছয়জন মহিলা কবির নানান স্বাদের রচিত কবিতা এখানে আলোচিত হয়েছে। এরা হলেন যথাক্রমে—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (আশ্চর্য পলায়ন, বড় গল্প), স্বর্ণকুমারী দেবী ('দীপনির্বাণ', 'স্নেহলতা', 'কাহাকে', 'বিদ্রোহ', 'ফুলের মালা', 'ছিন্নমুকুল', প্রভৃতি উপন্যাস), শরৎকুমারী চৌধুরানী ('শুভবিবাহ', উপন্যাস), বিনোদিনী দাসী ('কনক ও নলিনী', কাহিনী কাব্য), প্রসন্নময়ী দেবী ('অশোকা', উপন্যাস), মানকুমারী বসু ('বনবাসিনী', উপন্যাস), ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ('রূপজালাল', আখ্যায়িকা), মিসেস হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স ('ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', উপন্যাস), হেমাঙ্গিনী দেবী ('মনোরমা', আখ্যায়িকা), সরোজকুমারী গুপ্তা (কাহিনী ও ক্ষুদ্রগল্প সংকলন)।

মহিলা কবিগণের মধ্যে অনঙ্গমোহিনী দেবী ('শোক গাথা', 'প্রীতি'), অন্নদাসুন্দরী দেবী ('অবলাবিলাপ'), ইন্দুমতী দাসী ('দুঃখমালা'), কামিনী-সুন্দরী দাসী ('কল্পনাকুসুম'), কৃষ্ণকামিনী দাসী ('চিত্তবিলাসিনী'),

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ('কবিতাহার', 'ভারতকুসুম', 'অশ্রুকণা', 'আভাষ', 'শিখা' 'অর্ঘ্য', 'স্বদেশিনী', 'সিন্ধুগাথা') ।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর গল্পে রাজদ্রোহী বন্দীর পলায়নের ঘটনা কিশোর পাঠকের নজর কাড়ে। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসগুলির মধ্যে সমাজের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরবার পাশাপাশি ইতিহাসাশ্রিত ঘটনার কথাও বলে। শরৎকুমারী দেবীর রচনা শুধুমাত্র নারীর কথাই বলে যা পাঠকের সামনে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। বিনোদিনী দাসীর কাব্য কাহিনী 'কনক ও নলিনী' দুই বোনের জীবনের কথা বলে, যেখানে সংসার জীবন ও অধ্যাত্ম দু-পথেই জীবনের গতি অব্যাহত রাখা হয়।

'অশোকা' উপন্যাসটি প্রেমিকার জন্য প্রেমিকের, পিতার জন্য পুত্রে ত্যাগের একটি প্রজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বনবাসিনী শোভার জীবনের নিদারুণ শোকের কথা বলেছেন মানকুমারী বসু তাঁর 'বনবাসিনী' উপন্যাসে। মিসেস হানা ক্যাথরীন বলতে গেলে প্রথম বাঙলা উপন্যাস রচয়িতা। তার 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের বিষয়েও কিছু কথা বলেছেন। নানান স্বাদের গল্পের সম্মেলন ঘটেছে সরোজকুমারী গুপ্তার 'কাহিনী ও ক্ষুদ্রগল্প সংকলন'-এ। প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা 'রূপজালাল'-এ কিছু অলৌকিক ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটলেও ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী সার্থক লেখিকা।

উল্লিখিত মহিলা কবিদের রচনায় নারী জীবনের ব্যথা বেদনার কথা, নারী মনের বাসনার কথা, সঙ্গে স্বদেশ প্রীতির কথা পাঠকের উপভোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখিকাদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ নির্মল দাস এবং শ্রদ্ধেয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডঃ সত্যবতী গিরি। এঁদের আন্তরিক সাহায্য এবং মূল্যবান উপদেশ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।

বিষয়বস্তু সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু গ্রন্থাগার কর্মীর যথা, জাতীয় গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বাংলাদেশ হাইকমিশনারের কলকাতা দপ্তর গ্রন্থাগার, বালী সাধারণ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার, ব্যাটরা পাবলিক

লাইব্রেরী, চতুরঙ্গ পত্রিকা দপ্তর। এছাড়া কলেজস্ট্রীট অঞ্চলের বেশ কয়েকজন পুস্তক বিক্রেতা, যাঁরা তাদের পুরানো সংগ্রহের থেকে কিছু অমূল্য গ্রন্থ দিয়ে আমার এ কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। বিন্দু বিন্দু জলে যেমন সাগরের সৃষ্টি তেমন নানান জনের শুভাকাংক্ষা আমাকে এ কাজের গতিধারা বজায় রেখে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। উল্লিখিত প্রত্যেকের কাছেই তাই আমি চিরকৃতজ্ঞ।

কথারম্ভ

পুরুষের 'ছায়েবানুগতা' জীবন থেকে উনবিংশ শতাব্দীর নানান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে এই শতাব্দীর সমাজ জীবনের যে বিন্যাসগত রূপান্তর ঘটেছিল, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি তারই অনিবার্য অংশ হিসাবেই অন্বিত ছিল। নারীরা কেউই নারীমুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেননি, তবুও আন্দোলন হয়েছে। তার অনিবার্য প্রভাবও পড়েছে নারীর জীবনে। সমাজের উপরিসৌধ বদলের সঙ্গে সমাজ মৌলেরও আপেক্ষিক পরিবর্তন যে অনিবার্য হয়েছে নারীর লেখায় প্রকাশিত আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে তা ক্রমশঃ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পুরাতন সংস্থান ছেড়ে নতুন সংস্থানকে গ্রহণ করা নারীর পক্ষে সেদিন খুব সহজ হয়নি। দ্বিধাদ্বন্দ্বের আঘাত খেতে খেতে তার বিকাশ হয়েছে। লক্ষ্যটা আমাদের নারী বিশেষের বা কয়েকজন বিশেষ নারীর বিকাশধারাকে লক্ষ্য করা নয়, উনিশ শতকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙ্গালী নারীর দ্বন্দ্বময় মানস-বিকাশের একটি ঐতিহাসিক চালচিত্র খাড়া করা। লক্ষ্যটি অর্জন করতে আলোচনার প্রয়োজন। তাই এ শতাব্দীর কয়েকজন নারীর রচনা নিয়ে আলোচনা করব, তাদের রচনার বিষয়বস্তু অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

(ক) সমাজ বিকাশের ধারায় নারীর স্থান ঃ

বিশ্ব আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে উপনীত। পুরুষের পাশাপাশি আজ নারীও পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। শতাব্দীর পাতা উলটিয়ে যদি পিছনের দিকে চোখ রাখা যায় তবে দেখা যাবে, অতীতের নারী ছিল অবহেলিতা, শোষিতা। অতীত সমাজ নারীকে সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নানান সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে শৃংখলিত করে রাখতো। সময়ের সাথে সাথে সমাজের বিকাশ ঘটেছে, আর এই সঙ্গেই নারীর অবস্থার পরিবর্তনও ঘটেছে। আজ কিন্তু নারীরা সেই শৃংখলের বন্ধন চূর্ণ করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, সম্পূর্ণ না হলেও খানিকটা। বুঝে নিতে শিখেছে তার অধিকার। নিজেকে বিকাশিত করবার ক্ষেত্রেও তাই আজ তার প্রচেষ্টার অন্ত নেই।

সমাজ বিকাশের ধারার সঙ্গে নারী কতটা পা মিলিয়ে এগিয়ে চলতে পেরেছে, এ আলোচনাকে একটু বিস্তৃত করবার আশাতেই একেবারে আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করলে বিষয়টির একটি মোটামুটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া সম্ভব হবে। সমাজে নারীর স্থান কোথায় কি ভাবে নির্ধারিত হয়েছে তা জানতে হলে বিভিন্ন যুগের ও সময়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে নারীর স্থান ছিল একটা মর্যাদাপূর্ণ জায়গায়। এ সমাজের বিশেষত্বই ছিল, নারীজাতির প্রাধান্য। এই সমাজ ছিল মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ। আদিম মানুষের জীবনযাত্রায় যুথকর্ত্রী ছিল স্ত্রী অর্থাৎ পরিবারের কর্ত্রী হলেন স্ত্রী। ফলমূল সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের মাধ্যমেই ছিল মানুষের জীবিকা জীবনোপায়। এরপর মৎস্য ও পশু শিকার করে মানুষের জীবিকা নির্বাহ হত। এই দুই অবস্থাতেই সমাজের স্ত্রী নেতৃত্ব প্রচলিত ছিল।

এ সময়ে নিশ্চিন্ত বিবাহ বা পতিপত্নী সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল না। মাতৃ-পরিবারের কর্ত্রী এ ব্যবস্থাকে খুব একটা সু-নজরে দেখতো না। কারণ, তখন

মাতা মাত্রেই ভবিষ্যতে পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণের আশা করত। এতে পুরানো কর্ত্রীর কর্তৃত্বের সময় দীর্ঘ হতে পারত না। মাতৃকর্ত্রীক পরিবার এ কারণে প্রায়ই ছোট হত। এঙ্গেলস্ এ যুগের স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ককে যূথবিবাহ আখ্যা দিয়েছেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মাতৃসত্তা পরিবারের অস্তিত্ব স্বীকার করেও যূথবিবাহ মানতে চান না। কিন্তু বহু ভ্রাতার একপত্নী বিবাহ করার প্রথা তিব্বতে এবং আরো অন্যান্য দেশে পরবর্তী বেশ কয়েকটি যুগে প্রাধান্য পেয়েছে।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে স্ত্রীপুরুষ কাঠ, পাথর এবং হাড়ের অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করত। শীতের জন্য চামড়ার পোষাক তৈরী করত। আদিম সাম্যবাদী সমাজে সম্পত্তির বিষয়ে দেখা যায় যে, প্রথম অবস্থায় পরিবার গুলিতে শুধু নিজেদের উপযোগী জিনিসপত্রই তৈরী হোত। কিন্তু ক্রমশঃ উৎপাদন গঠনের এই স্বয়ং সম্পূর্ণ অবস্থা ভেঙে যেতে থাকে। তখন বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে জিনিসপত্রের অদল বদল হতে থাকে এবং এভাবেই বিনিময় হতে হতে ধীরে ধীরে বিক্রয়ের নূতন প্রথা আবিষ্কৃত হয়। এতে সমাজে অসমানতা এসে যায় এবং কম্যুনের অর্থাৎ পরিবার সমবায় সদস্যদের মধ্যে সম্পত্তিগত তারতম্য সৃষ্টি হয়। এঙ্গেলস এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আদিম সাম্যবাদী সমাজেও সম্পত্তির উদ্ভব হয়েছিল।

ক্রমশঃ এ অবস্থারও পরিবর্তন হতে লাগল। সভ্যতার বিকাশ ঘটতে শুরু করল। বিবাহক্রম থেকে মোটামুটি দেখা যায় যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজে অর্থাৎ আদিম কম্যুন এবং জনসত্তা এই উভয়ের মধ্যেই মাতৃকর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল।

কিন্তু জনসত্তার পরই এল পিতৃসত্তা অর্থাৎ পিতৃকর্তৃত্বের পালা। এসময় থেকেই শুরু হল দাসত্ব, এরপর ক্রমে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের উদ্ভব হল। জনসত্তিক সমাজ থেকেই নূতন শিশু পিতৃসত্তার জন্ম হয়। জনসত্তার যুগ বলতে এঙ্গেলসের পরিভাষায় বলা হয় পিতৃসত্তার যুগ। পিতৃসত্তার যুগে সমাজে প্রাচীন সাম্যবাদী বিবাহ প্রথার পরিবর্তন হয়। যূথবিবাহের প্রচলন উঠে যায় এবং নিজের গোত্রের মধ্যে বিবাহকার্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মাতাপুত্র, পিতাপুত্রী ও ভ্রাতাভগ্নীর সংসর্গ তখন থেকে অন্যায় বলে বিবেচিত হতে থাকে। এমন কি একরক্ত সম্পর্কিত অনেক আত্মীয়দের মধ্যে তা আর আগের

মত সমর্থিত হয় না। এই যুগের বিবাহ প্রকৃতপক্ষে মিথুন বিবাহ। একে একপত্নী বিবাহের একটা শিথিল রূপভেদ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এ বিবাহে একজন স্ত্রী একটিমাত্র পুরুষের পত্নী হতে পারে।

পিতৃসত্তার যুগে জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব প্রথম থেকেই আমাদের সমাজের পুরুষের উপর ন্যস্ত ছিল। সম্পত্তির অধিকার নারীর থেকে চলে এল পুরুষের হাতে। অবশ্য সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার নারীর ছিল, কিন্তু স্ত্রী কখনও পুরুষের স্বামীনী হতে পারত না। এই সময় থেকেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মর্য্যাদাগত দিক দিয়ে একটা নীচ মনোভাব প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে সমাজের স্বামীদের স্ত্রীকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে দেবার প্রবণতা বাড়তে থাকে।

নারীজাতির পক্ষ থেকে সর্বত্র বিষয়ে প্রতিবাদ করবার উপায় ছিল না। এমনকি নতুন শ্রমবিভাগ এসে স্ত্রীপুরুষের যে কর্তব্য নির্ধারণ করা হল সেখানে সম্পত্তিতেও নতুন রকমের বিভাগ দেখা দিল। এই বিভাগে সম্পত্তিতে নারীজাতির মালিকত্বের কোন প্রশ্নই উঠল না, একমাত্র উপভোগের বস্তু হয়ে নারী সমাজে বাস করতে লাগল। গৃহ কার্যের ভার যদিও আদিম যুগ থেকে নারীর উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে তার দায়িত্ব, বাসস্থান কিছুই আর আগের মত অক্ষুণ্ণ রইল না। আগে নারী ছিল সমাজের প্রধান, তাই গৃহকর্ম পরিবারের উপর তার একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করত। কিন্তু সেই গৃহকর্ম তার কর্তৃত্বচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়াল এই পিতৃসত্তার যুগে। মাতৃসত্তা বা স্ত্রী প্রাধান্য এভাবে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তার জায়গায় পিতৃসত্তা বা পুরুষ প্রাধান্যের নিষ্কণ্টক রাজ্য কায়েম হয়ে গেল। এভাবে পিতৃসত্তা হবার পর আদিম সাম্যবাদের প্রভাব একে একে সমাজ থেকে মুছে গেল।

পিতৃসত্তা স্থাপিত হবার পর সমাজে শ্রেণীভেদ আরম্ভ হয়। তার সঙ্গে সাম্যবাদী রীতিনীতিও সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। নারী জাতির মধ্যেও মানমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবার এবং রক্ষা করবার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সভ্য মানবসমাজ বলতে নিশ্চয়ই কোন স্বার্থত্যাগ পরায়ণ উচ্চমানব সমাজের কথা বোঝাবে। তবে পিতৃসত্তা স্বার্থান্বতাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল এবং সমাজে ব্যক্তিস্বার্থ কায়েম হবার ব্যবস্থা দৃঢ় হয়েছিল। এরূপ ব্যক্তিস্বার্থপূর্ণ সভ্যতাকে তিনটি পৃথক অবস্থায় ভাগ করা যেতে পারে— (১) দাসত্ব যুগ, (২) সামন্তবাদী যুগ এবং (৩) বর্তমান পুঁজিবাদী যুগ।

সভ্য সমাজের পরিবার, রাজনীতিক বিশেষত্ব এবং ব্যক্তিক সম্পত্তি সম্বন্ধে এঙ্গেলস্ বলেছেন, সভ্যতাযুগে পরিবারের যে গতি দেখা যায়, তাহাকে এক বিবাহ, স্ত্রীর উপর পুরুষের শাসন এবং পূর্ব্বের সামূহিক সম্পত্তি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বণ্টন—ইহার অন্যতম বিশেষত্ব।[১]

সভ্যসমাজের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দাসত্বযুগে প্রবিষ্ট হবার পর, নারীদের মর্যাদার আরো হানি হতে থাকে। এ যুগে দাসীরা প্রভুর সম্পত্তি স্বরূপ ছিল। এজন্য সামাজিকভাবে বিবাহ না করেও তাদেরকে ভোগ করা চলত। হিন্দু প্রাচীন গ্রন্থে বা উপাখ্যান বহুপত্নীকতাকে কখনও নিন্দা করা হয়নি ইসলামীয়রা জনবৃদ্ধির জন্য সর্বদা একসঙ্গে চারটি বিবাহ করত। দাসী সংসর্গ রহিত করবার জন্য তাদেরও কোনো সামাজিক নিয়ম ছিল না, এমনকি পুরুষের জন্য এতে সমাজের অনুমোদনই ছিল। হিন্দু জাতির মধ্যে বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টা হয়নি, বরঞ্চ কৃষ্ণ, দশরথ প্রমুখ আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্তে ষোড়শ সহস্র পত্নী ধর্মানুমোদিত হয়ে গিয়েছিল। বহু পত্নীকতার বিষয় বলতে যদি এটা মনে করা যায় যে, সব পুরুষই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত, তবে ভুল করা হবে। প্রকৃতপক্ষে বিবাহের মূল প্রেরণা হল সম্পত্তি। সম্পত্তিশালী শোষকরা ছাড়া বহুবিবাহের বিলাসিতা অন্যের পক্ষে তেমন সম্ভবও ছিল না। পিতৃসত্তাযুগে পদার্পণ করেই পুরুষ হয় সমাজের প্রধান এবং সম্পত্তির উৎপাদক হওয়ায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠা আরো বেড়ে যায়। পুরুষের অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির অধিকারের অনুপাতিক হ্রাস হয় এবং এইভাবে স্ত্রী ক্রমে পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে যায়। স্ত্রীর প্রতি যে সোহাগ বা প্রেম দেখানো হোতো, তা তাদের কোন মানবিক মর্যাদা দেবার জন্য নয়। স্ত্রী, পুরুষের ভোগ্যবস্তু এবং আদর-সোহাগ বা প্রেম এসব ভোগেরই আঙ্গিক।

উপনিষদকারও বলেছেন : ভার্যার কামনার জন্যই ভার্যা প্রিয় নয়, প্রকৃত পক্ষে আত্মকামনার জন্যই ভার্যা প্রিয় (ন বৈ ভার্যা কামায় ভার্যা প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় ভার্যা প্রিয়া ভবতিঃ)। পুরুষ প্রাধান্যতার জন্যই পরিবারে পুত্রের দাম বাড়ে এবং কন্যা আবার সেই অনুপাতে অনাদৃতা হয়। কর্তব্য সম্পর্কে বহুপ্রকার বাগ্‌বিস্তার করেছেন। সামন্তবাদী যুগ, নারী সম্পর্কে এ যুগের ধারণা—"রাজার সম্পত্তি—তাহার সালংকরা নারী, উত্তম অশ্বযুক্ত ও চিত্রবিচিত্র এবং নানাবিধ সূচীকর্মকৃত রথ প্রকোষ্ঠ অট্টালিকা…গবাদি পশু

অজস্র হউক, অলংকৃত স্ত্রী অসংখ্য হউক…এবং মনুষ্যের অন্য ভোগ্যও অপরিমিত হউক…।"[২] ব্রাহ্মণের পুরাতন ও তৎকালীন স্বার্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কথাগুলির উল্লেখ করেছেন বুদ্ধ। অর্থাৎ সামন্তবাদীযুগে ধর্ম-শাস্ত্রকারেরা দেশের রাজা বা প্রজার কর্তব্য সম্পর্কে বাগ্‌বিস্তার করতেন।

এ থেকে সামন্তবাদী যুগে নারীর মর্যাদা যে কতটা সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং নারী যে কিভাবে পুরুষের ভোগ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হত তার একটা চিত্র নিশ্চয়ই উপলব্ধি করা যেতে পারে।

সামন্তযুগে এভাবে পিতৃসত্তার প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য ধীরে ধীরে কত নীচে নেমে যেতে থাকে তা বোঝা যায় নারীর দেহ বিক্রয়ের ব্যবসার প্রচলন থেকে। অর্থাৎ সমাজের উচ্চবর্গের ব্যক্তিরা স্ত্রীকে ভোগ্যবস্তুর অধিক আর অন্য কিছুই মনে করত না এবং আমাদের সম্পত্তিতে তখন স্ত্রীজাতির কোন অধিকার থাকত না-শুধু ভোগের বেলায় স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছাক্রমে তার সহভাগিনী হতে পারত।

পুরুষের চিত্ত প্রসাদনের জন্য নারীকে বসন, ভূষণ, প্রসাধন প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত হতে হোতো। অথচ পূর্ববর্তী বাবুল সমাজে নারীকে কিছু কিছু সুবিধা দান, সমাজ স্বীকার করে নেয়। যথা—সেই সমাজে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেবার অধিকার থাকত, এছাড়া, বিবাহের সময় প্রত্যেক স্ত্রীই সেখানে তার পৈত্রিক সম্পত্তির একাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য হত। বাবুল সমাজে স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে তার পিতৃগৃহ থেকে আনীত সমস্ত সম্পত্তি তাকে ফিরে দিতে হত এবং সেই স্ত্রী সন্তানবতী হলে পৈত্রিক সম্পত্তিরও কিছু অংশ সন্তানের জন্য প্রাপ্য হত।

অবশ্য এই সমাজেই নারীকে বেশ কিছু বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে হত। স্ত্রী স্বেচ্ছাচারী হলে কিংবা পতির অপযশ চাইলে তাকে জলে ফেলে দেবার নিয়ম ছিল। কিন্তু পুরুষ স্বেচ্ছাচারী হলে কিংবা স্ত্রীর অপমানকর কাজ করলে স্ত্রী পিতৃধন নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে পারত। কিন্তু সামন্ত যুগে বিবাহিতা স্ত্রী পতির স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করতে পারত না। গোপনে জহরের গুটির মতো এই নির্মমতাকে সে কণ্ঠলীন করে নিত। এর কারণ, স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারে সমাজের নাক কাটা যেত। আর পুরুষের ভ্রষ্টাচারকে সমাজই ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিত।

এরপর আসে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা। এ অবস্থায় নারীর মূল্য আরও কমে যায়। পণ্য হিসাবে নারীকে ব্যবহার করে সমাজ। এভাবে ক্রমশঃ নারীর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হতে থাকে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের জালে এদেশের সমাজ নারীদেরকে জড়িয়ে ফেলতে থাকে। এল সতীদাহ প্রথা, নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখবার প্রচেষ্টায় নতুন করে সমাজে যে সংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটল তা হল বাল্যবিবাহ। সেন-বংশীয় রাজত্বকালে এল কৌলীন্য প্রথা, যার ফলে বহুবিবাহের মত নারী শোষণের এক সুকৌশলী পদক্ষেপের বলি হতে লাগল এদেশের নিরীহ মেয়েরা। কৌলীন্য প্রথায় সমাজে বংশীয় মানমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবার জন্য শুরু হল গৌরীদান। একজন কুলীন বংশজাতক বহু স্ত্রীকে ভোগ করবার অধিকার পেল বহুবিবাহ প্রথার মধ্য দিয়ে।

সমাজে নারীকে বঞ্চনার শিকার হতে হল সতীদাহ প্রথার মধ্য দিয়ে, এর কারণ আর কিছুই নয়, সম্পত্তির ভোগদখল। কোনো সন্তানহীনা যুবতীর স্বামীর মৃত্যু হলে তার স্বামীর সম্পত্তির ভোগ করবার জন্য আত্মীয় পরিজনেরা তাকে জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে ধর্মের দোহাই দিয়ে সতী বানাতে লাগল। মেয়েদের মনের মধ্যে এ কুসংস্কার বদ্ধমূল করে দেওয়া হল যে, শিক্ষিতা হলে তাকে বৈধব্য গ্রহণ করতে হবে, এই নাকি শাস্ত্রীয় বিধান। এভাবেই এদেশের সমাজকে নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল শতাব্দীরা। চলতে লাগল নারী শোষণের প্রতিযোগিতা।

১২০০ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ সময় পর্যন্ত নারী জাতির উপর এই যে চরম শোষণ এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে প্রধানতঃ পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের নারীর উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতাকে। আর এর ফলে নারী হয়ে উঠল অন্যান্য আর দশ-পাঁচটা ভোগের সামগ্রীর মত ভোগ্যবস্তু। এরই পাশাপাশি দায়ী করা যেতে পারে ব্রাহ্মণের আধিপত্য বিস্তার, যে ক্ষমতার বলে তারা সমাজের নানান ধরনের শাস্ত্রীয় কুসংস্কারের বোঝা অনায়াসেই চাপিয়ে দিতে লাগল নারী জাতির উপর।

এ-ভাবেই এদেশের সমাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর নারী জাতিকে চরম লাঞ্ছনার বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বিদায় নিয়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীকে আহ্বান জানিয়েছিল।

কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন চলতে দিল না উনবিংশ শতাব্দী। এ শতাব্দী নব-জাগরণের শতাব্দী। তাই সমাজের কুসংস্কার, অশিক্ষা, নানান কায়দায় নারী নির্যাতন মোচনের দায়িত্ব অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই নিজেদের উপর তুলে নিলেন এদেশের কয়েকজন সমাজ সংস্কারক। এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়।

ভারতের মাটিতে সতীদাহের মত ঘৃণ্য প্রথাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা যাবে না এবং এ-প্রথা বন্ধ করতে হবে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে একথা ঘোষণা করলেন রাজা রামমোহন। যুক্তি দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়ে রাজা এই প্রথাকে বন্ধ করবার জন্য এগিয়ে এলেন। শুরু হল তাঁর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন।

রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে। সহমরণ অবশ্য কর্তব্য নয় এবং ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের মধ্যে প্রথমটিই শ্রেয় এই অভিমত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার রামমোহনের পূর্বেই প্রচার করেছিলেন। সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে রামমোহন তাঁর প্রচারিত একটি ইংরাজী পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার মহাশয়ের এ-মত উদ্ধৃত করেন—

Some Remarks in vindication of the resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifices in India.

১৮১৯ সালের অকটোবর সংখ্যা মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রে সতীদাহ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় মহাশয় যে অভিমত ব্যক্ত করে প্রবন্ধ লেখেন তা থেকে রামমোহন বেশ কিছু তথ্য পান যা সতীদাহ প্রথা বন্ধ করবার পক্ষে কাজ করবে। তিনি হিন্দুশাস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেন যে, বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে, এমন কোন নির্দেশ নেই। তাঁর আন্দোলনের সুফলও মেলে। ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এ প্রথা আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। যদিও ইতিপূর্বে ১৭৯৫ এবং ১৮০৪ সালে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে পরপর দুটি আইন পাশ হয়। কিন্তু কার্যতঃ তা ফলপ্রসু হয়নি। ১৮২৯ এর নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুরা সহজে মেনে নিতে পারেনি। এতে হিন্দুধর্ম লোপ পাবার ভীতি প্রচারের জন্য ১৮৩০ সালে ১৭ই জানুয়ারী ধর্মসভা বলে একটি সভা করেন তারা। কিন্তু আত্মীয়সভার পুরোধা রামমোহনের যুক্তির জোরের সামনে প্রতিবাদ টিকল না। সতীদাহ প্রথা নিষেধাজ্ঞা জারি

হবার পর আত্মীয়সভার সংস্কারকগণ এর গতিধারা অব্যাহত রাখবার জন্য কাজে নেমে পড়লেন। এঁরা হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নন্দকিশোর বোস, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান মতিচাঁদ প্রমুখ। বহুবিবাহ, দ্বিবিবাহ, কুলীন প্রথা, পণপ্রথা, মেয়ে বিক্রয় প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলবার কাজেও তাঁরা নেমে পড়েন।

এইসব সমাজ সংস্কারকগণের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অবশ্য ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের গৌরব মিশনারীদেরই প্রাপ্য। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির যাজক রবার্ট মে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে প্রথম ১৪টি ছাত্রী নিয়ে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি এদেশের প্রথম স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয়।

১৮১৮ সালে ১২ই আগস্ট মে'র মৃত্যু ঘটে এবং পরে তৎকালীন কোম্পানী সরকার বিদ্যালয়টি শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। তথ্য বলে, শ্রীরামপুরের হানা মার্শম্যান স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে অগ্রণী। তিনি ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তবে তার এ সম্বন্ধে অন্য কোনো পুস্তকে কোনো সমর্থন মেলে না। ১৮১৬—১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারীগণ তাঁদের একটি ছেলেদের স্কুলে মাঝে মাদুরের বেড়া দিয়ে পৃথক করে ক্লাসে কয়েকটি বালিকাকে পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সাংগঠনিকভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উল্লিখিত প্রচেষ্টাগুলি হুগলী জেলার মফস্বলে। অবশ্য একথাও জানা যায় যে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র অধীনস্থ কয়েকটি বিদ্যালয়ে ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষা দেওয়া হত। এই বালিকাদের পরীক্ষা নেওয়া হোতো রাধাকান্তদেব বাড়ীতে।

বঙ্গ মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিপোষণের উদ্দেশ্যে রেভা. ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্সের সভাপতিত্বে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। ঐ বছরেই জুন মাসের প্রথমে মাত্র ৮টি ছাত্রী নিয়ে নন্দনবাগানে অর্থাৎ কলকাতার গৌরীবেড়ে অঞ্চলে 'ফিমেল জুভেনাইল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে গৌরীবেড়ে, জানবাজারে ও চিৎপুর অঞ্চলে যথাক্রমে লিভারপুর স্কুল, সালেম স্কুল ও বার্মিংহাম স্কুল নামে আরও তিনটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে মিস্ মেরি অ্যান কুকের উদ্যোগে 'লেডিজ

সোসাইটি' ও 'লেডিজ এ্যাসোশিয়েসন'-এর মাধ্যমে অনুরূপ অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় চালু হলেও মিশনারীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এদেশীয় মানুষজনের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকায় তাঁদের প্রচেষ্টা তেমনভাবে সাফল্যমণ্ডিত হল না।

নারীশিক্ষা প্রবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন—সেকালের কয়েকজন ব্যক্তিত্ব। আলোচনার সাথে সাথে এঁদের পরিচয় দেওয়া যাবে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শিক্ষাসংসদের কাছে আবেদন করে ব্যর্থ হয়েছিলেন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। দু'বছর পরে শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকারের সহযোগিতায় কালীকৃষ্ণ মিত্র ও ডাঃ জীবনকৃষ্ণ মিত্রের আনুকূল্যে সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে বারাসাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর পরই শিক্ষা সংসদের সভাপতি জন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন এবং দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সাহায্যে ১৮৪৯ সালের ৭ই মে 'ক্যালকাটা-ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়টি স্থাপনের এক পক্ষকাল পরে রাজা রাধাকান্তদেব তাঁর শোভাবাজারের বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় শুরু করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ ভাবেই স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও তখনকার সামাজিক ব্যবস্থায় একটু বেশী বয়সের বালিকাকে পর্দাপ্রথা মানতে হত। নবজাগরণের প্রভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চার হলেও বয়স্কা বালিকাদের অবরোধের বাইরে আসার বাধা ছিল। তাই পর্দাপ্রথাকে মেনে নিয়ে বিশেষ এক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল, তার নাম 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'। এ বিষয়ে চিন্তাভাবনার প্রথম নিদর্শন মেলে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক 'A prize Eassy on Native Female Education' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি তিনি প্রতিযোগিতার জন্য জমা দেন এবং শ্রেষ্ঠ বিজয়ীর পুরস্কার স্বরূপ দুইশত টাকা পান।

এছাড়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি বার্ষিকীতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন—

"The successful essay now before us proves what the Rajah Radhakanta had demonstrated long before, that female education was not uncommon in India in the days of

yore and that the present state of things is one of degeneracy from the former".

প্রসঙ্গত উল্লেখ স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে রাধাকান্তদেব ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সন্তানদের মধ্যে অগ্রণী।

দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' সংগঠনটিও একাজে উদ্যোগী হয়েছিল। এছাড়া উল্লেখ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অধিনায়কত্বে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'-অন্তঃপুর শিক্ষা প্রবর্তনে ব্রতী হয়। ১৮৬৩ এপ্রিল, সভার পক্ষ থেকে বারো জন সফল ছাত্রী পুরস্কৃত হয়। এই বছরের শেষে ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার দায়িত্ব নারীমুক্তির অন্যতম প্রবক্তা উমেশচন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'বামাবোধিনী সভা'র উপর অর্পণ করেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচেষ্টায় তৈরী হয়—বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় (পরে এটি বেথুন-স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়), ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া কলেজ। ব্রাহ্মসমাজের ঔরসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর যে এ বিষয়ে প্রচেষ্টা ছিল তার উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬৫ সালে 'বামাবোধিনী' মহিলাদের জন্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পত্রিকাটি ১৮৬৩ সালে আগষ্ট মাসে 'অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালী' নাম নিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বামাবোধিনী সভা

এই পত্রিকার মাধ্যমে একটি স্ত্রীশিক্ষা পাঠক্রম চালু হয়। এর সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সহকারী সম্পাদক হন বসন্তকুমার দত্ত ও ক্ষেত্রমোহন দত্ত। পত্রিকাটি ষাট বছর ধরে চলেছিল।

ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত মেয়েরা বিশেষ করে ঠাকুর বাড়ীর মেয়েরা সমাজ সংস্কারের কাজে অংশ নিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৬৬ সালে সখি সমিতি, ১৮৮২ সালে 'লেডিস অব্ থিওজোফিক্যাল সোসাইটি ইন ক্যালকাটা' প্রতিষ্ঠা করেন। তদানীন্তন বেশ কয়েকজন লেখিকা এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন-স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রসন্নময়ী দেবী, মৃণালিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, শরৎকুমারী দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরানী প্রমুখ। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলাদেবী চৌধুরানী

নারীদের কিছু সংগঠন তৈরী করার উদ্যোগ নেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর অন্য কন্যা হিরন্ময়ী দেবী মহিলা শিল্পসমিতি গঠন করেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোসের স্ত্রী লেডি অবলা বোস কলকাতায় একটি বিধবাদের জন্য হোম তৈরী করেন, নারী-শিক্ষাসমিতি তিনিই গঠন করেন।

নারী জাগরণের যুগে রামমোহনের পরবর্তী যিনি অন্যতম সমাজসংস্কারক ছিলেন তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর সময়কাল ১৮২০ থেকে ১৮৯১ সাল। এই সময়ের মধ্যে তিনি নারীশিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সমাজ সংস্কারের কাজ করেন। নারী শিক্ষাপ্রসারে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। বেথুন স্কুলের দায়িত্বভার মূলতঃ তাঁর উপর ছিল বেশ কিছুদিন। তাঁরই প্রচেষ্টায় শিক্ষাকে সরকারী সাহায্যের এবং সরকারের হস্তক্ষেপে আনা সম্ভব হয়েছিল। বিদ্যাসাগর শিক্ষাপ্রসার কার্যের পাশাপাশি সমাজে নারীদের লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করবার জন্য যে প্রচেষ্টায় ব্রতী হন তা হোলো বিধবাবিবাহ প্রচলন আইন আন্দোলন। তাঁর এ কাজে সাহায্যকারী হিসাবে কালীপ্রসন্ন সিংহের নামোল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। ১৮৫৫-র গোড়ার দিকে যখন বিধবা-বিবাহ আইন জারীর আয়োজন চলছিল এবং এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র পেশ হয় তখন বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর যুক্ত একটি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করে।

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য রাষ্ট্রীয় বিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এই কারণে ১৮৫৫-র ৪ঠা অক্টোবর তিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্তরের ৯৮৭ জনের মতো স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠান। আবেদন পত্রের বিষয়বস্তু ছিল বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসংগত। ১৮৫৫-র ১৭-ই নভেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহ আইনের খসড়া পেশ করা হলে ভারতের সর্বত্র এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন হয়। রাজা রাধাকান্তদেব ছিলেন কলকাতার ধনী ও রাজাদের মধ্যে গণ্যমান্য একজন। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রায় ৩৭,০০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ভারত সরকারের নিকট পাঠান। অপরপক্ষে এর পক্ষেও আর কিছু আবেদনপত্র জমা পড়ে। অবশেষে ১৮৫৬-র ২৬-জুলাই বিধবা

বিবাহ আইন পাশ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ রোধ আন্দোলন শুরু করেন ১৮৫০ সালে। এ ধরনের কল্যাণকর কাজের প্রতিবাদে তাঁর আন্দোলনকে বিরোধিতা করেও বেশ কিছু জনমত গঠিত হয়েছে, এসময়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে নারী জাগরণের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। আর তারই ফলস্বরূপ নারীরা তাঁদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে খোলা আকাশের নীচে কিছুটা প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পেরেছিল। এ কাজে সমাজসংস্কারকগণের পাশাপাশি নারী-সমাজও পা-মিলিয়ে চলবার প্রচেষ্টা রেখেছিল। আর সেই কারণেই তাঁরা পর্দার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

(খ) ভারতীয় আদর্শে নারী ঃ

ভারতীয় আদর্শে নারীকে দেখতে গেলে প্রথমেই একটা চিত্র ফুটে ওঠে, তা হোলো, হিন্দুনারী আত্মত্যাগের মূর্তিমতী নিদর্শন। কিন্তু অতীতকে নিয়ে যদি চলা যায়, তবে দেখা যাবে যে, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী সমাজেব আদর্শ হচ্ছে দাসত্বের বাস্তব রূপ। এ মন্তব্যটি যে কতটা সত্য তা যদি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নারী অবস্থানের দিকে তাকানো যায় তবে বোঝা যাবে। মনুর বিধানে নারীজীবনের যে একান্ত পরাধীনতা আছে কোন সত্যান্বেষী সে বিষয়ে অজ্ঞতার ভান করতে পারে না। সমস্ত জীবনব্যাপী সে কোন না কোন পুরুষের রক্ষণাধীন থাকতে বাধ্য।

ভারতবর্ষে বহু দীর্ঘ শতাব্দী থেকে নারীর জীবননাট্য অনুষ্ঠিত হয়েছে নাটকের চরিত্রগুলির ব্যর্থতার কারণ নিদর্শন দিয়ে। এই নাটকের বিকাশ হয়েছে উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাবধারা হতে। ধর্মের বিধানের কাছে নীরব আত্মসমর্পণই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নারী যতই নীরবে অন্যায় সহ্য করে তার ব্যক্তিগত জীবনকে আদিম গোত্রবাদের মালিকানা প্রথা অনুযায়ী পরাধীন করে রাখতে পারবে, সে ততই নারী জনোচিত গৌরবের অধিকারিণী। বহু শতাব্দী হতে নারী একটি জীবন্ত পণ্যের মতো হয়ে আছে যা অনিবার্য ভাবে একজন না একজন পুরুষের সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হতে বাধ্য।

অতীত সর্বদাই বর্তমানকে আনবার শঙ্খধ্বনি করে। তাই ভারতীয় নারীর আদর্শকে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেকটা দূরে চলে যেতে হবে। শুরু করতে হবে সেই বৈদিক যুগ থেকে।

বৈদিক যুগ—বৈদিক যুগ বিভাজন চারটি ঃ

(১) ২৫০০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টপূর্ব সময় অর্থাৎ ঋক্‌বেদের সময় কাল।

(২) ১৫০০ থেকে ৫০০ খৃষ্টপূর্ব সময় অর্থাৎ সংহিতার ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের পরবর্তী সময় কাল।

(৩) খৃষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ সময় অর্থাৎ সূত্র, মহাকাব্য সময় এবং স্মৃতিপূর্ব সময়কাল।

(৪) স্মৃতির পরবর্তী সময়কাল অর্থাৎ ৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী সময়।

বৈদিক যুগ বলতে যে যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল অর্থাৎ উল্লিখিত সময়কাল। এই সময়কালের রচিত সাহিত্য বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সে যুগের নারীর আদর্শের একটা চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

এ যুগে ভারতীয় হিন্দু সমাজের নারীরা সভ্যতার স্বপ্ন দেখে, কিছুটা নারী স্বাধীনতাও জন্মে। যদিও নারী পুরুষ অপেক্ষা কম স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, কিন্তু এটা উল্লেখ্য যে নারীরা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেত। মেয়েরাও ছেলেদের মত শিক্ষাগ্রহণ করত এবং ব্রহ্মচর্য সময়কাল অতিবাহিত করত। বৈদিক স্তবগান রচয়িতা যেমনি বহু রচনাকার আছে তেমনি ইন্দ্রানী, উর্বশী, সায়না প্রভৃতি মহিলা রচনাকারের কথা জানা যায় যাঁরা বৈদিক স্তবগানের কিছু অংশের রচয়িতা।

বৈদিক যুগে বাল্য বিবাহ অথবা জোর পূর্বক বিবাহ দানের ব্যাপার সমর্থিত ছিল না। ১৬—১৭ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা পিতামাতার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে যথা—বেদ ও উপনিষদ্, গৃহকর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। এ যুগের সাহিত্যে দেখি, দেবীকে আরাধনা করবার জন্য কিছু প্রার্থনা অথবা শ্লোক আছে। এই শ্লোক গুলিতে নারীজাতির মহত্ত্বের বিষয় চিত্রিত করা আছে, যেমন—দেবীকে পৃথিবীরূপে এবং মা বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। আবার দেবতাগণের মতো দেবী অদিতিকে বহু শব্দ সমন্বয়ে প্রার্থনা করা হয়েছে—তিনি শুধুমাত্র তাঁর সন্তানদের (বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি) উত্তমরূপে দেখাশুনাই

করেন না, মায়ের মত তাদের রক্ষাও করেন। তিনি সমস্ত মানুষকে বিপদ মুক্ত করেন।

বৈদিক সাহিত্য দেবী ঊষার কথা বলা হয়েছে যিনি মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে তুলনাহীন। এছাড়া আছেন দেবী বাক্, তিনি হলেন মানব জাতির শক্তি উদ্যমের উৎস এবং বিশ্বের সবার রাণী। প্রত্যেকে তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। অন্য শক্তিশালী দেবী হলেন ইন্দ্রানী যিনি ইন্দ্রের পত্নী। দেবরাজ ইন্দ্রও কখনও দেবী ইন্দ্রানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যান না। সব দেবতাই দেবরাজ ইন্দ্রের মত তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এই সমস্ত দেবীরা সর্বশক্তিমান, কারণ তাঁরা জীবনের উচ্চ আদর্শ অনুসরণকারিণী। বৈদিক যুগের আদর্শ নারী গার্গী, যিনি ছিলেন বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার অঙ্গনে বিশেষ কীর্তিময়ী।

বৈদিক যুগে ভারতের নারীরা এভাবেই মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বহু নারী ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে পুরুষের সঙ্গে এক সঙ্গে গুরুগৃহে বেদ, বেদান্ত এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। অথর্ববেদে আছে একজন শিক্ষার্থী তার ছাত্রজীবন শেষ না করা পর্যন্ত বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে পারবে না।

ঋক্‌বেদ হল বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। এখানে সরাসরি নারীর অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উক্তি নেই। কিন্তু নানা বর্ণনা উপমান থেকে নারীর স্থান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ঋক্‌বেদের রচনার কয়েকটি স্তর আছে, তার প্রথম স্তরের মন্ত্রগুলিতে নারী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচারিনী। কিন্তু নারীর ইচ্ছাক্রমে বা অনিচ্ছাক্রমে নারী হরণের কথাও ঋক্‌বেদে মধ্যে মধ্যে আছে, —পুরুমিত্রের কন্যাকে বিমদ হরণ করেছেন। বিবাহে কন্যাপণের কথাও পাওয়া যায়। পুরুষের বহুপত্নীত্বের কথা কখনো স্পষ্টত, কখনো বা গৌণভাবে সপত্নী নাশনের মন্ত্রগুলিদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কন্যার শরীরে ত্রুটি থাকলে বরপণের কথা আছে একাধিকবার। কুমারী কন্যার কথাও বেশ কয়েকবার আছে। এদের বলা হত অমাজু বা অমাজুরা অর্থাৎ যারা বাপের বাড়িতেই বুড়ো হয়ে যায়, কিম্বা বৃদ্ধকুমারী বা জরাকুমারী। পরবর্তীকালে বিবাহ যেমন নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল, ঋক্‌বেদের যুগে তা ছিল না।

ঋক্‌বেদের যুগে সহমরণ, পরবর্তীকালে যাকে সতীদাহ বলা হয়েছে, তার কোনো উল্লেখ নেই। বিধবা বেঁচে থাকত, কখনো বা দেবরের সঙ্গে বিয়ে

হত তার, আর কখনো বা বিয়ে হত না। সে যাই হোক তার বেঁচে থাকার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয়নি, ধর্ম বা সমাজের শাস্ত্রীয় অনুশাসনের জালে আবদ্ধ করে পুড়িয়ে মারাও শুরু হয়নি। বেদ রচনার উত্তরপর্বে অর্থাৎ ঋক্‌বেদের প্রথমাংশ রচনার পরে প্রাগার্য প্রভাবেই হোক বা অন্য কোনো কারণে সামাজিক বিবর্তনের ফলেই হোক প্রথম সহমরণের কথা শোনা যায় অথর্ববেদে।

বলা বাহুল্য, সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে, 'যেন বিপত্নীক না হই' এমন প্রার্থনা কোথাও নেই। বরং 'ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার গরু', একথাই শোনা যায়। বৈদিক যুগের নারীর বহু বিবাহের কথাও শোনা যায়। অথর্ববেদে আছে যে নারীর পূর্বে একজন পতি ছিল সে যখন দ্বিতীয় পুরুষকে লাভ করে তখন পঞ্চদশ অজদান করলে তার কোনো ক্ষতি হয় না। অন্যত্র আছে, কোন নারীর দশটি পতি থাকলেও সে যখন ব্রাহ্মণের পত্নী হয়, তখন সেই ব্রাহ্মণই তার পতি, রাজন্ বা বৈশ্য পতিরা পতি নয়। এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য ব্রাহ্মণ পুরুষের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে অন্য বর্ণের হীনত্ব প্রতিপাদন করা। কিন্তু প্রসঙ্গত কোনো নারীর পক্ষে দশটি স্বামী গ্রহণের স্বীকৃতিও এতে আছে।

নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে দেখা যায়, ব্রহ্মচর্য যা বেদ অধ্যায়নের প্রবেশদ্বার তা বহু প্রাচীন যুগেই নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। অতএব শিক্ষালাভের পথ তার রুদ্ধ। অথর্ববেদ বলে, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা নারী স্বামীলাভ করে, মনে হয়, এ ব্রহ্মচর্য কোনো ব্রত বা শিবপূজার মতই কিছু, স্বামী লাভই যার উদ্দেশ্য। ঋক্‌বেদে কিছু ঋষিকার নাম পাওয়া যায়, হয়ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতেন,—যেমন বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা ও গোধা। পাণিনিতে আচার্যা, উপাধ্যায়া শব্দের বুৎপত্তিতে অধ্যাপনায় রত নারীর উল্লেখ আছে, কাশিকাভাষ্যে কাশকৃৎস্না ও আপিশলার নাম পাওয়া যায় যাঁরা মীমাংসা ও ব্যকরণের পণ্ডিত। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্, গার্গী, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতী এঁদের কথাও পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রের নজির দেখলে বোঝা যায় নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগ থেকে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়, ক্রমে যে অবস্থা দাঁড়াল তাতে গণিকা ছাড়া শিক্ষাতে আর কোন নারীর অধিকার ছিল না। অনুমান করা

যায় হয়ত সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রশিল্পে কিছু কিছু কুমারীর অধিকার ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা থেকে সাধারণভাবে সে বঞ্চিতই ছিল।

পুরুষের বহুবিবাহ ঋক্‌বেদের যুগ থেকেই চলে আসছে, তবে ঋক্‌বেদের সময়ে নারীরও বহুপতিত্বে অধিকার ছিল। যদিও এ অধিকার সে অল্প কিছুকালের মধ্যেই হারায়, নারীর স্থান ক্রমেই অন্তঃপুরের গহনে সরে যেতে থাকে। যদিও ঋক্‌বেদে যোদ্ধা নারী মুদ্‌গলিনী, বিশ্‌পলা, বধ্রিমতী, শশীয়সীর কথা পাওয়া যায়, যাদের কেউ যুদ্ধে আহত কেউবা যুদ্ধে বিজয়িনী। তবুও ঋক্‌বেদের প্রথম যুগের পরে প্রকাশ্য সমাজ জীবনে নারীর কোনো ভূমিকা আর রইল না। ব্রাহ্মণের যুগেই নারীকে অবরোধে রাখবার কথা শোনা যায়। নারীর সর্বপ্রধান সংজ্ঞা দুটি, তার স্থানও দুটিতেই সীমাবদ্ধ, সে পুত্রের জননী এবং সে ভোগ্যবস্তু। তৈত্তরীয় সংহিতাতে আছে, 'তস্মাৎ হ স্ত্রিয়ো ভোগমেধ হারয়স্তে', অতএব নারী সম্ভোগ আনে।

উপনিষদের যুগ ঃ

উপনিষদের যুগে নারী সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, জায়া পুরুষের অর্ধাংশ। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীকে একটা বন্ধনে আবদ্ধ রাখার প্রবণতা, সঙ্গে মর্যাদাহানি করবার প্রবণতাও দেখা যায়। এ সময়ে নারীকে অনুউৎপাদনশীল অথবা স্বল্প উৎপাদনশীল কাজ করিয়ে তাদের মর্যাদাকে পরোক্ষভাবে হানি করবার প্রবণতা দেখা দেয় এবং সমাজে তাদের ছোট বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাও হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুজো-অর্চনার ক্ষেত্রে মেয়েদের মুখ্য অংশগুলিকে খর্ব করা হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাজ্ঞবল্ক্য তপশ্চর্যার জন্য বনে যাবার পূর্বে মৈত্রেয়ীকে সম্পত্তির অংশ বিশেষ দিতে চাইলে মৈত্রেয়ী তা গ্রহণ করতে রাজী হয়নি কারণ তিনি স্বামীর সঙ্গে অনুগামিনীই হতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যথার্থ সক্ষমতা আছে জেনেও তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না, অবশ্য মৈত্রেয়ীর অনুরোধে তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন। পর্দাপ্রথা তখনও আসেনি, কিন্তু এই সময়কালে কিছু কিছু নতুন ধরনের যুক্তিহীন মত ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে যা মেয়েদের মর্যাদা হানি করতে সাহায্য করে।

স্মৃতিপূর্ব সময়কাল ঃ

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর সময় থেকেই মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে বয়স ক্রমশঃই কমিয়ে আনা হয় চৌদ্দ অথবা পনেরোতে। ২০০ খৃষ্টাব্দের স্মৃতি রচনাকার বারো বছর বয়সকাল অর্থাৎ মেয়েদের রজোদর্শনারম্ভ সময়কেই বিবাহের বয়স বলে সমর্থন করে। পরে তা আরো কমিয়ে আট বছর হয়। এসব তথ্য বাল্য বিবাহের পক্ষেই কথা বলে। ক্রমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হতে থাকে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারী বঞ্চনার পরিমাণ বাড়তে থাকে। মধ্যযুগে এ অবস্থার আরো অবনতি হয়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নারী আলোচনা প্রসঙ্গে সে যুগের সমাজের নারী চিত্রের রূপ পাওয়া যাবে। পরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীতে অবশ্য এ অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি ঘটতে থাকে এবং নারী বঞ্চনার অবসান হতে থাকে।

ভারতের নারীর আদর্শ, এ আলোচনাকে সমৃদ্ধ করতে হলে মহাভারত এবং রামায়ণ এ দুটি মহাকাব্যকে যদি দেখা যায়, তবে তদানীন্তন সময়ের নারীর চিত্র চিত্রিত করে সামগ্রিক আলোচনার পূর্ণতা প্রদান সম্ভব হবে।

মহাভারতে নারীর স্থান ঃ

মহাভারত রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খৃষ্টপূর্ব নবম শতক। সমাজের প্রতিফলনে রচিত এ মহাকাব্যটি আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। প্রাচীনযুগের নারীর কতকটা স্বাধীন সঞ্চরণের ও আচরণের চিহ্ন মহাভারতে যে রয়ে গিয়েছে, গান্ধারী চরিত্রে তা স্পষ্টতঃ—তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনকে শাসন না করবার জন্য বারে বারে ধিক্কার দিয়েছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিবারণ করেন নি বলে কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছেন।

মহাভারতে নারী সোমপান করত, প্রকাশ্যে চলাফেরা করত এবং নিজেদের সম্বন্ধে বহু সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিত। পিতৃমতী কন্যা পিতার অনুমতি ছাড়াই পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে দেখা যায়—শকুন্তলা, সত্যবতী প্রভৃতি নারী। প্রয়োজনে স্বঈপ্সিত পুরুষটিকে পাবার জন্য প্রকাশ্য রাজসভায় পিতা রাজার সঙ্গে তর্ক করে নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতেও দেখা যায়। যেমন, সাবিত্রী,

অম্বা। স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে দৈহিক মিলনেও সমাজ এমন কি স্বামীর আপত্তি ছিল না, যেমন—কুন্তী, দময়ন্তী। নারীর পুরুষকে প্রেম নিবেদনের স্বাধীনতা ছিল। নারী স্বয়ং প্রেমপ্রার্থিনী হয়ে পুরুষকে যুক্তি ও মিনতি দ্বারা সম্মত করায়। পুরুষ যখন নারীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে প্রার্থনা জানায় তখন নারী নিজের শক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শর্ত স্থাপন করে এবং পুরুষ তা স্বীকার করে—সত্যবতী, গঙ্গা, শকুন্তলা এর দৃষ্টান্ত।

নারীর একাধিক স্বামী অর্থাৎ বহুপতিকা নারীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রৌপদী, জটিলা, বার্ক্ষীর নাম করা যায়। নারী নিজের অভিরুচিমত কুমারী থেকে তপস্যা করতে পারত এ দৃষ্টান্তও আছে—সিদ্ধা, শিবা, শাণ্ডিলের তাপসী কন্যা। ঋষি অত্রির স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে তপস্যা করতে যান। ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে যেখানে নারী সর্বতোভাবে গৌণ এবং পুরুষের অধীন, পূর্বতন অংশে পাওয়া যায় যে পুরুষ প্রলুব্ধ করতে এলে সতী স্ত্রীর অশ্রু অগ্নি হয়ে তাকে দগ্ধ করে। এতে সতীত্বের মাহাত্ম্য ঘোষণার সঙ্গেই আছে যে কোনো নারীকে নির্বিচারে ভোগ অধিকারের অস্বীকৃতি, যা পরে তেমনভাবে আর থাকেনি।

মহাভারতে ব্যভিচারের অপরাধে নারী পুরুষের সমান দণ্ডের কথা দু-একটি স্থলে দেখা যায়, কিন্তু ব্যভিচারে নারী নির্দোষ, কারণ পুরুষ বলাৎকার করলে নারী অসহায়, এমন কথাও আছে। মহাভারতের প্রথম অংশে এমন বহু ব্যভিচারের কাহিনী আছে যার সম্বন্ধে বিচার বা দোষারোপ নেই, যেন তথ্যই পরিবেশিত হচ্ছে শুধু। এমনই স্বেচ্ছা প্রণোদিত নরনারীর মিলনের ফলে মহাভারতের বহু মুখ্য নায়কেরই জন্ম, বেদব্যাস, ভীষ্ম, কর্ণ, পঞ্চপাণ্ডব। সত্যবতী, কুন্তী এবং বহু মৃত বীরের ও কৃষ্ণের স্ত্রীগণের উল্লেখ আছে এঁরা কেহই সহমৃতা হননি, শুধু মাদ্রী একাই সহমৃতা হন এবং সেও সমাজের নির্দেশে নয়, ব্যক্তিগত অপরাধবোধে। এঁরা কেউই পুনর্বার বিবাহ করেন নি। অম্বিকা, অম্বালিকা নিয়োগপ্রথার দ্বারা সন্তান ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এই মহাভারতেরই শেষ অংশে কৃষ্ণ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির নারীর নিন্দা করেছেন এবং তার কলঙ্ক সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন।

রামায়ণে নারীর স্থান ঃ

রচনাকালের দিক থেকে দেখলে রামায়ণ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় থেকে

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের মধ্যে রচিত। রামায়ণের মূল অংশের মধ্যেই অতি পৌরাণিক অংশের কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবুও নারী চরিত্রে স্বাভাবিকতা ততটা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বাধা না থাকার জন্যই কৈকেয়ীর সাহস হয়েছিল রাজাকে পূর্ব প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করতে। রানীরা দশরথের মৃত্যুর পর সহমৃতা হন নি।

সীতা রামায়ণে মুখ্য নারী চরিত্র, তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলেই রামায়ণে নারীর স্থান সম্বন্ধে ধারণা হবে। সীতা স্বামীর বনগমনের সংবাদ পেয়েই তৎক্ষণাৎ মনস্থির করলেন তিনিও সঙ্গে যাবেন। পতিব্রতা বলে নয়, রামকে ভালবাসতেন বলেই স্বেচ্ছায় সানন্দে তাঁর সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরই সঙ্গে প্রায় ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে পরবর্তীকালের পতিব্রতাধর্ম যা ম্লান করে দিয়েছে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত যশস্বিনাম। এখানেই তাঁর মুখ থেকে যে বাক্য শোনা যায়, প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান যে ঐ "পরিভোগায়" শব্দটিতে তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরহস্তগতা নারী সীতা স্বামীর ভোগে লাগবে না। মনে রাখতে হবে, এতটা অপরাধ সীতার প্রতি স্বয়ং রাবণও করেনি। সীতাকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশেই ত্যাগ করতে রামের এতটুকু বাধল না।

প্রাচীন ভারতে নারীর সতীত্ব খুব ভাল বুঝতে 'সতী' শব্দের ঐ অর্থে কোনো পুংলিঙ্গ শব্দও সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ স্বামীর একনিষ্ঠতার অভাব সমাজের চোখে গর্হিত ছিল না, কিন্তু স্ত্রীকে শুধু সন্দেহের বশেই ত্যাগ করা চলত। এতবড় অন্যায় অপমানের পরে সীতা লক্ষ্ণকে চিতা নির্মাণ করতে বললেন। সারাজীবন ধরে অনন্যচিত্তে যে রামকেই তিনি চিন্তা করেছেন, ভালবেসেছেন, অনুগমন করেছেন, রাম কী মূল্য দিলেন তার? নারীর অবস্থার এই অবনমন রামায়ণে অত্যন্ত স্পষ্ট। কাহিনীর মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে পূর্বতন যুগে নারীর কতকটা স্বাধীন আচরণ, যেমন শবরী একাকিনী আশ্রমে বাস করেন। কিন্তু তার পাশাপাশি দেখি গৌতম অহল্যাকে মর্মান্তিক শাপ দেন। অর্থাৎ নারীর সামান্যতম স্খলন সমাজ ক্ষমা করে না। যদিও পুরুষের স্খলন সম্বন্ধে সে অনেক সহিষ্ণু।

ভারতের নারীদের বিভিন্ন সময়ের অবস্থার আলোচনা করবার পর মোটামটি যে চিত্রটি স্পষ্টতঃ তা হোলে,—যুগের পরিবর্তনে যদিও কোনো না

কোনো সময় নারী অকৃপণ স্বাধীনতাভোগ করেছে, কিন্তু মূলতঃ সমাজ নারীর অবমূল্যায়নই করেছে। এর জন্য যে যুক্তি উপস্থাপিত হয় তা হোলো বিভিন্ন সময়ে বহিঃ শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত ভারত নারীকে রক্ষা করার জন্য এই অবরোধপ্রথা বেছে নিয়ে ধীরে ধীরে নানান শৃঙ্খলের বেড়াজালে নারীকে করেছে আবদ্ধ। এই আদর্শেই ভারতের নারীরা এগিয়ে চলেছিল অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টার আদর্শে আদর্শায়িত হতে থাকে নারী।

(গ) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী ঃ

১২০০ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ সময়কালকেই মধ্যযুগ ধরে নেব। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সময় থেকে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত হয়। এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু রচনার উল্লেখ এবং সে বিষয়ের উপরে সমালোচনাত্মক মন্তব্যও পাওয়া যাবে হয়ত। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'বেঙ্গলি লিটারেচার' নামক ইংরাজী প্রবন্ধে, রমেশচন্দ্র দত্তের 'লিটারেচার অফ্ বেঙ্গলি' নামক পুস্তকে, রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক গ্রন্থে কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় যখন বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠন শুরু হয় এবং দীনেশচন্দ্র সেন যখন এই বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন থেকেই একদিকে যেমন মধ্যযুগের নানা পুঁথি সম্পাদিত হতে থাকে তেমনি সে বিষয়ে বিবিধ আলোচনাও শুরু হয়ে যায়।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য মূলত কাব্য ভিত্তিক। প্রধানত সাহিত্যের ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থগুলিতে মধ্যযুগের কবিদের সম্পর্কে নানারূপ আলোচনা দৃষ্ট হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের কবিরা তাঁদের কাব্য সৃষ্টিতে নানান চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে তাঁদের রচনাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। চরিত্রগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

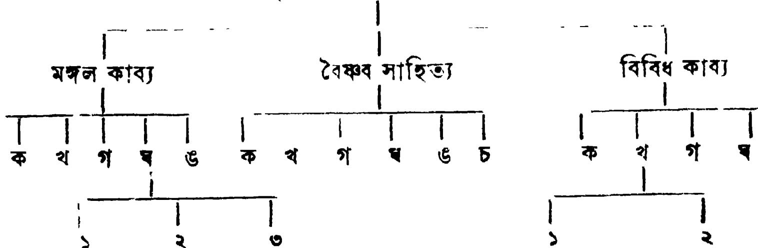
(১) প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র।

(২) প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র।

(৩) গৌণ পুরুষ ও নারী চরিত্র।

যদিও মধ্যযুগের কয়েকটি পুরুষ চরিত্র নানানভাবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে কিন্তু বর্তমানে আলোচনার বিষয় নারী চরিত্র।

মধ্যযুগের সমাজে নারীর স্থান কোথায় ছিল তার চিত্র তদানীন্তন সময়ের সাহিত্যের কাছে পাওয়া যাবে। গার্হস্থ্য ধর্মের এবং বর্ণাশ্রমে শাসিত সমাজের নানান ধরনের রীতিনীতি নারীর অবস্থানকে সংকীর্ণ করে রাখলেও মধ্যযুগের সাহিত্যের বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, পরিবার জীবনে তো বটেই বৃহত্তর সমাজ-জীবনেও নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নারীর সতীত্ব বিষয়ে শাস্ত্রানুশাসনই অবশ্য কঠোর ছিল, কিন্তু মানব চরিত্র বিকাশে তা প্রবল বাঁধা সৃষ্টি করতে পারেনি। পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রথার ব্যাপারটি একটি প্রথানুগ ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু এই ব্যবস্থা বহু ক্ষেত্রেই নারী চিত্তে যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ঘনিয়ে তুলত তা কবিদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। একান্ত লোকায়ত স্তরে, তথাকথিত নিম্নমার্গের সমাজে নারীর যে অর্থ নৈতিক ভূমিকা থাকত তার নিদর্শনও এ-যুগের কাব্যে দেখা যায়। পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে বির্যবত্তায় নারী আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। প্রেমের জন্য বেদে রমণীর দুঃসাহসিকতা নারী চরিত্রের ভিত্তি তৈরী করেছে। অর্থাৎ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এটাই স্পষ্টতঃ যে সে যুগের সমাজ নারীচরিত্রের মুক্তি ও বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে পড়েনি। তবে মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য শুধুই আখ্যানকাব্য এবং পদসাহিত্য, অল্প দু-একটি নাট্যগীতি ধরনের রচনা। সেকালের মৌলিক আখ্যানকাব্যগুলিতেই চরিত্র সৃষ্টির সুযোগ ছিল বেশী। বর্তমানে আলোচনার বড়ভাগটা তাই সে যুগের নানান ধরনের মৌলিক আখ্যানকাব্য অবলম্বন করেই করা যেতে পারে। এবার মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটি চিত্র উপস্থাপিত করা যেতে পারে—



(১) **মঙ্গল কাব্য**—(ক) মনসা মঙ্গল
(খ) চণ্ডী মঙ্গল
(গ) ধর্ম মঙ্গল
(ঘ) অন্নদা মঙ্গল
১. অন্নদা মঙ্গল
২. বিদ্যাসুন্দর
৩. মানসিংহ
(ঙ) শিবায়ন

(২) **বৈষ্ণব সাহিত্য**—(ক) জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'।
(খ) চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।
(গ) বিদ্যাবতীর পদাবলী।
(ঘ) চণ্ডীদাসের পদাবলী
(ঙ) জ্ঞানদাসের পদাবলী
(চ) গোবিন্দদাসের পদাবলী।

(৩) **বিবিধ কাব্য**—(ক) শাক্ত পদাবলী
(খ) নাথ সাহিত্য।
১. গোরক্ষ বিজয়।
২. গোপীচন্দ্রের গান।
(গ) দৌলত কাজীর 'লোর চন্দ্রালী' এবং আলাওলের 'পদ্মাবতী'।
(ঘ) গীতিকা সাহিত্য
১. মৈমনসিংহ গীতিকা।

উল্লিখিত সাহিত্যে মোটামুটিভাবে যে কয়টি নারীচরিত্র দেখা গেল তাঁরা হলেন যথাক্রমে মনসামঙ্গলে মুখ্যচরিত্র মনসা, বেহুলা, সনকা এবং গৌণ চরিত্র চণ্ডী, উষা, এয়োগণ, সনকার দাসী, কমলা, দক্ষিণ পাটন রাজ্যের রানী। চণ্ডীমঙ্গলে মুখ্য চরিত্র ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা এবং গৌণ চরিত্র দুর্বলা, নিদয়া, মুরারির স্ত্রী, লীলাবতী। ধর্মমঙ্গলে মুখ্যচরিত্র রঞ্জাবতী, দুর্গা, নয়ানী, সুরিক্ষা, লক্ষীডুমনি, কানড়া, কলিঙ্গা এবং গৌণ চরিত্র হিসাবে বিমলা ও অমলা নামে লাউসেনের দুই বধূর কথা, আর কয়েকটি গণিকার কথা উল্লেখ আছে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্নদামঙ্গলে দুটি চরিত্র অন্নদা ও ঈশ্বরী পাটনী। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে দুটি চরিত্র বিদ্যা ও হীরামালিনী।

মানসিংহ অংশে চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী।

শিবায়ন কাব্যে একটিই মুখ্য চরিত্র পার্বতী।

বৈষ্ণব সাহিত্যে যথাক্রমে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, বিদ্যাপতির পদাবলী, চণ্ডীদাসের পদাবলী, জ্ঞানদাসের পদাবলী, গোবিন্দদাসের পদাবলী-তে মুখ্য চরিত্র রাধা বিভিন্ন কবিদের কলমে বিভিন্নভাবে রূপ নিয়েছে। এছাড়া আছে অন্য কয়েকটি নারী চরিত্র বড়াই, যশোদা, শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিবিধ কাব্যের মধ্যে শাক্ত-পদাবলীতে শ্যামা ভক্তের আকুতি শ্যামাদেবীর দেবীত্ব কোথাও মানব সম্পর্কের মধ্যে অনুভূত হয়নি। তাই নারীচরিত্র হিসেবে মেনকা এবং উমার উল্লেখ আছে। নাথ সাহিত্যে গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন কাব্যে যে কটি নারী-চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তারা একান্ত গৌরবহীন এবং অস্বাভাবিক। নারী বিরূপতার মাত্রা এত বেশী যে অনেক নারী-চরিত্রের নামই নেই। তবে উল্লেখ্য নারী-চরিত্র পার্বতী, গর্ভেশ্বরের কন্যা এবং কদলীর রানী। নাথ সাহিত্যের গোপীচন্দ্রের গান বা ময়নামতীর গান কাব্যধারায় অঙ্কিত চারটি নারী-চরিত্র বেশী জীবন্ত হয়ে উঠেছে। (১) ময়নামতী, (২) অদুনা, (৩) পদুনা, (৪) হীরানটী। দৌলতকাজীর লোর-চন্দ্রালী এবং আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য দুটির মধ্যে দৌলতকাজী কাব্যের প্রধান নারী-চরিত্র দুটি ময়নাবতী এবং চন্দ্রালী। এছাড়া গৌণ চরিত্রের মধ্যে আছে চন্দ্রালীর সখী, মালিনী ও মহাদেবী।

পদ্মাবতী কাব্যের প্রধান নারী-চরিত্র পদ্মাবতী। এছাড়া উল্লেখযোগ্য একটি গৌণ চরিত্র, রাণী নাগমতি।

গীতিকা সাহিত্যের প্রধান নারীচরিত্রগুলি প্রেমিকা রমণীর চিত্র। সতী-নারীর গার্হস্থ্য প্রণয় এবং বিবাহপূর্ণ প্রণয় রোমান্স দুধরনের প্রেমচিত্র। বহু-সংখ্যক কাহিনীর নারী-চরিত্রের বিচারে যাওয়া সম্ভব নয়। তাদের কাল নির্ণয়ের কোন পন্থা জানা নেই। তাদের কতটুকু মধ্যযুগের, কতটুকু আধুনিক-কালের সে কথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে মৈমনসিংহ গীতিকারে সংকলিত প্রধান কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লোকায়ত স্তরের চরিত্র-

কল্পনার সেকেলে আদলটি কিছুটা ধরা যাবে, তবে এগুলির উপর আধুনিক কালোচিত কিছুটা প্রলেপ থাকার সম্ভাবনা মেনে নিয়ে এগুতে হবে। এরা হলেন চন্দ্রাবতী, মদিনা, সুনাই, মহুয়া।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের নারী চরিত্র বিশ্লেষণের কাজে এগোবার আগে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। কারণ, বিভিন্ন যুগের এবং বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকেরা যত বিচিত্র স্বভাবের নরনারীর চরিত্র আঁকুক না কেন, তাদের কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) টাইপ, (২) ইনডিভিজুয়াল।

চরিত্রের মূল বিশিষ্টতার দিক থেকে চরিত্রের বিভাগ করা যেতে পারে। প্রতি কাহিনীতে সাধারণ চরিত্রগুলিতেই কোনো একটি বা দুটি লক্ষণকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। এই লক্ষণগুলি যদি একাধিকও হয় তারা হয় পরস্পর সহযোগী অর্থাৎ কোনো একটি ব্যক্তি একই সঙ্গে চোর এবং সাধু, ভীরু এবং সাহসী হয় না তবে চোর এবং চতুর, সাহসী এবং বীর হতে পারে। এই ধরনের মানুষদের যে ছবি সাহিত্যে আঁকা হয় তাকেই টাইপ বলে অভিহিত করা যায়। কখনো কখনো এদের ফ্ল্যাট চরিত্রও বলা হয়। আবার দেখা যায় পেশা বা জীবিকার দিক থেকে অথবা সামাজিক বিন্যাসের দিক থেকে কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ শ্রমজীবী, কেউ রাজার সভাসদ। যখন এই পরিচয়গুলি চরিত্রটির পূর্ণ পরিচয় হয়, এই পরিচয়ের বাইরে তার কোনো বিশিষ্টতা প্রকাশ না পায়, তখনও তাকে টাইপ বা সরল চরিত্র বলে অভিহিত করা হয়।

ইনডিভিজুয়াল বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝায় জটিল চরিত্রকে। এর মধ্যে বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, নানান ধরনের বৃত্তির, যারা একে অপরের সহযোগী নয় তাদের সমাবেশও ঘটতে পারে। যখন কোনো মানুষ একই সঙ্গে চোর এবং সাধু দুটোই হয়, যখন কারো সংযম লোভের দ্বারা বারবার আহত হয়, চরিত্রে প্রেম ও ঘৃণা সহবাস করে, তখন সেই চরিত্রকে জটিল চরিত্র অথবা রাউণ্ড ক্যারেকটার বলা যাবে।

অন্য একটি দিক থেকে বিচার করে সাহিত্যের চরিত্রকে দুটি পৃথক ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) স্থির। (২) গতিশীল।

যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকমের থাকে তাদের স্থির বা স্ট্যাটিক চরিত্র বলে। ঘটনার পরিবর্তনে কোনো চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। কিন্তু সেই পরিবর্তন যদি তার মূল চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলিকে বদলে না দেয় তবে তাকে স্থির চরিত্র বলা হবে। টাইপ চরিত্র সর্বদাই স্থির চরিত্র। তবে যদি কোনো টাইপ চরিত্র শেষ পর্যন্ত বদলে যায়, সেটাকে আর টাইপ চরিত্র বলে চিহ্নিত করা যাবে না। ইনডিভিজুয়াল চরিত্রও স্থির হতে পারে। অর্থাৎ যদি এ ধরনের চরিত্রর শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন দেখানো না হয় তবে তা স্থির চরিত্র।

যদি কোনো চরিত্রের শুরুতে যে রকম থাকে শেষ পর্যন্ত তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বদলে যায় তবে তাকে গতিশীল বা ডাইনামিক বলা হবে। ইনডিভিজুয়াল চরিত্র স্থির ও গতিশীল দু-রকমই হতে পারে। কিন্তু টাইপ চরিত্র কোনো সময়ই গতিশীল হতে পারে না।

অন্য একভাবে চরিত্রকে তিনটি পৃথক শ্রেণীতে ফেলা যায়—

(১) সরল। (২) জটিল। (৩) গভীর।

মধ্যযুগের কবিরা চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে আধুনিক কালের সাহিত্য ভাবুকদের পূর্বোক্ত চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তবুও চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে এই শ্রেণী বিভাগ এসে পড়বে এবং এ-বিষয়ে আলোচনা করবার সময় উল্লেখ রাখবার চেষ্টা রাখা যাবে।

মধ্যযুগের নারীচরিত্রগুলিকে আলোচনা করতে গিয়ে যদি চরিত্রের শ্রেণী-বিভাগের দিকে নজর দেওয়া হয়, তবে এরই সঙ্গে নারীচরিত্রগুলিকে কয়েকটি বর্গে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) উচ্চবর্ণের গৃহবধূ—মনসামঙ্গলের সনকা চরিত্র, চণ্ডীমঙ্গলের লহনা চরিত্র।

(২) নিম্নবর্ণের গৃহবধূ—চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা।

(৩) রোমান্টিক প্রণয় নায়িকা—বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধা চরিত্র, দৌলত-কাজীর চন্দ্রালী।

(৪) উচ্চবর্ণের বীরঙ্গণা নায়িকা—ধর্মমঙ্গলের কানড়া চরিত্র।

(৫) নিম্নবর্ণের বীরঙ্গণা নায়িকা—ধর্মমঙ্গলের লক্ষ্মীডুমনি চরিত্র।

(৬) দূতী-কুট্টিনী—অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর অংশের হীরামালিনী চরিত্র,

বৈষ্ণব সাহিত্যের বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এর বড়াই চরিত্র।

(৭) দুশ্চরিত্রা নারী—ধর্মমঙ্গলের সুরিক্ষা চরিত্র।

(৮) যাযাবরী—গীতিকাসাহিত্যের মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া চরিত্র।

(৯) অবৈধ প্রণয় নায়িকা—অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর অংশের নায়িকা বিদ্যা চরিত্র।

এবার মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের মূল কাব্যগুলির নারী চরিত্রদের বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

মনসামঙ্গল কাব্যের নারীচরিত্র ঃ

মনসা—মনসা এই মঙ্গলকাব্যের মূল দেবী। বিজয় গুপ্তের কাব্যের অনুসরণে এ চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা যায় যে, দেবী ভাবনামূলক এবং অতিলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব না দিয়ে সামাজিক, মানসিক দিক থেকে তার ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করতে হবে। যুক্তিবাদী মন সহজেই বাইরের দেব-মাহাত্ম্যের ভিতর প্রবেশ করে মানবিক ভিত্তিটি আবিষ্কার করতে পারে। মনসা চরিত্রে দুটি বৃত্তি পাশাপাশি কাজ করছে—স্বাভাবিক কোমল নারীস্বভাব এবং একটি ক্রুরসর্পস্বভাব অর্থাৎ ইনাডভিজুয়াল চরিত্র। প্রচণ্ড অত্যাচারের মুখেই বারবার তার সর্প স্বভাব কোমল নারী স্বভাবকে আচ্ছন্ন করে প্রবল হয়ে উঠেছিল। মনসা সাপ হয়ে প্রতিপক্ষকে দংশন করে বিষের দ্বারা প্রাণ-সংহার করেছে। এই নারী চরিত্রেই আবার বঞ্চনা, গঞ্জনার ছবি পাওয়া যায়—চণ্ডী তাকে চোখ ফুরে পর্যন্ত দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে মাতৃহীনা বালিকা যেখানে প্রত্যাশা করছে স্নেহের, সেখানে পেয়েছে নিদারুণ অত্যাচার এবং লাঞ্চনা। ফলে তাঁর স্বভাবের অন্তর্লীন ক্রুরবুদ্ধি তাঁর অন্তরের সব শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তাঁকে হিংসা ও আক্রমণে উদ্যত করেছে বারবার, আর সেই কারণেই সে চণ্ডীকে বিষের দ্বারা হত্যা করল। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে দ্বন্দ্বের বিষয়ে দেখা যায় যে সে এক ভীষণ ধ্বংসকারী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছল, বল, কলা-কৌশল কোনো কিছুতেই পিছপা হয়নি। দয়া, মায়া, প্রীতি, ন্যায় কিছুরই তোয়াক্কা করেনি। সৃষ্টির মূলে যে অকল্যানী মাতৃকাশক্তি থাকতে পারে মনসার মধ্যে সেই ফাণ্ডামেণ্টাল ইভিলের চিত্র ফুটে উঠেছে

কাব্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিজয় গুপ্তের কৃতিত্ব হল এই ইভিলকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করা এবং তার চরিত্র উৎস নির্ণয়।

বেহুলা—বেহুলা চরিত্রের চারপাশে অতিলৌকিক কল্পনার কিছু আবরণ আছে। কিন্তু তাকে অতিক্রম করে তার মানবিক ব্যক্তি-চরিত্রে পৌছানো কিন্তু কঠিন কাজ নয়। এ চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজয় গুপ্ত, নারায়নদেব এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মনসার ক্ষেত্রে যেমন বিজয় গুপ্তের স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, বেহুলার বিষয়ে এ ধরনের স্বাতন্ত্র্য নেই। বরং দু-একটি ক্ষেত্রে বর্ণ সম্পাতে খুবই সাধারণ ধরনের পার্থক্যের আভাস পাওয়া যায়। বেহুলা বহু গুণান্বিত সুন্দরী তরুণী নারী। তাঁর স্বামী অর্থাৎ চাঁদ সদাগরের পুত্র লক্ষীন্দরের বিয়ের রাত্রে সর্পদংশনে মৃত্যুতে চতুর্দিকে যে শোক উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তার ভিতরে কিন্তু বেহুলার দিকে অপবাদের ইঙ্গিত ছিল। তাঁর ভাগ্যের দোষে বিয়ের রাত্রে স্বামী মারা গিয়েছে। সুতরাং সে অকল্যাণের প্রতীক এক বিষকন্যা। এরূপ সামাজিক পারিবারিক বিশ্বাস সেকালে অত্যন্ত প্রবল ছিল, কাজেই বেহুলার শোকের মধ্যে অনেকগুলি দিক একসঙ্গে মিলে গিয়েছিল। তার প্রতি যে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত হয় নিজের দুঃখের মধ্যেও সে লজ্জা তাকে পীড়িত করেছে। ক্ষেমানন্দের বেহুলা গর্বিতা রমণী। নারায়নদেব, বিজয়গুপ্ত দুজনই শোকাতুরা বেহুলার মধ্যে এই তরুণীর বৈধব্য যন্ত্রণার ভাবটি প্রকাশ করেছেন। মঙ্গল কাব্যগুলিতে বহু রমণীর বৈধব্যের বিবরণ পাওয়া যায়, অন্য কাব্যেও আছে, কিন্তু কোথাও সহমরণের প্রসঙ্গ নেই। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেলায় যাত্রা করবার দৃশ্যটিতে বেহুলার চরিত্রে বলিষ্ঠতা ফুটিয়ে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত নানান প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করে সে স্বামী এবং অন্যান্য পরিজনকে বাঁচিয়েছে। এই কারণে কোমলতা, সহৃদয়তা, দুঃসাহস, দুঃখের তপস্যা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্রধর্ম নিয়ে চরিত্রটি মধ্যযুগের এক অতি জীবন্ত নারীচরিত্ররূপে বাঙ্গালী পাঠকের মনে স্থান করে নিতে পেরেছে।

সনকা—সনকা বাঙ্গালা জননীর টাইপ রূপেই মোটামুটি পরিবেশিত হয়েছে। নিজের স্বামী এবং আরাধ্য দেবী মনসা দুজনের দ্বন্দ্বে সবচেয়ে বেশী আহত হয়েছে সনকা। মনসা মঙ্গলের কবিরা ঘটনা বিন্যাসের এই সুযোগটি গ্রহণ করে সনকা চরিত্রের একটি জটিলরূপ গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তা

হয়নি। সনকা মোটামুটি সরল স্বভাবা নারী হিসাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তাঁকে শোকাতুরা সর্বংসহা পতিব্রতা বাঙ্গালী রমণীর প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। মধ্যযুগ অনেকদিন চলে গিয়েছে। কিন্তু এখনকার বাঙ্গালী সমাজে সনকার মত মাতৃমূর্তি কিছু দুর্লভ নয়। সনকার চরিত্রে বাৎসল্যের ছবিটিও স্পষ্ট হয়েছে।

চণ্ডী—চাঁদ মনসার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত মনসামঙ্গল কাব্যে দেবখণ্ডের বিবরণ আছে। তাতে চণ্ডী দেবীর যে ভূমিকা বিজয় গুপ্ত অঙ্কন করেছেন তা সম্পূর্ণ মানবিক। কাব্যের মধ্যে নানান কৌতুকপূর্ণ ঘটনা উল্লেখের মধ্যে দিয়ে একান্ত বাস্তব মধ্যযুগীয় বঙ্গ নারীর ছবি ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে কিছুটা কৌতুক থাকলেও শিথিল স্বভাব স্বামীকে নিয়ে বঙ্গনারীর বিপন্ন অবস্থার যে ছবিটা প্রকাশ পায়, তার সত্যতা চিনে নিতে ভুল হয় না। এই চণ্ডীতে অসাধারত্ব কিছু নেই। আছে একান্ত বাস্তব একটি ঘরোয়া ছবি। মধ্যযুগের নারী সমাজ মঙ্গলকাব্যের কবিদের রচনায় যে কত বাস্তব হয়ে উঠেছে তার আলেখ্যরূপে এটি গ্রহণযোগ্য।

উষা—মনসামঙ্গলের দেবখণ্ডে উষা নাম্নী একটি নর্তকীর সংক্ষিপ্ত চিত্র আছে। পৌরাণিক বাণ রাজার কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধর প্রণয় ও বিবাহের যে কাহিনী মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে তার পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই উষা নেহাতই স্বর্গ নর্তকী, মহাদেবের সভায় দেবতাদের মনোরঞ্জন করাই তার কাজ। বিনা অপরাধে কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত এক নর্তকীর ক্রন্দন খুবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে একে পরিপূর্ণ চরিত্ররূপ না বলে চরিত্র-চিত্র বলাই ভাল।

এয়োগণ—বিবাহ আসরে সধবা নারীদের ভিড় প্রায় সব মঙ্গলকাব্যের একটি টিপিক্যাল পরিস্থিতি। স্থূল হাস্যরসের পিছনে সমাজের গার্হস্থ্য নারীদের বিবাহিত জীবনের দারিদ্র এবং অন্যবিধ দুঃখের পরিচয় এদের মাধ্যমেই কবিরা তুলে ধরেন।

সনকার দাসী—মধ্যযুগের বর্ধিষ্ণু পরিবার জীবনে দাসী ও ভৃত্যের ভূমিকা ছিল। কবি সনকার প্রধান পরিচারিকার চরিত্রটিতে অবলা বাঙ্গালী নারীর একটি সবলারূপ, সাহস ও বলিষ্ঠতা প্রকাশ করিয়ে চরিত্রটির বিশিষ্টতা দিয়েছেন।

কমলা—চাঁদসদাগরের সহকারী ধন্বন্তরি ওঝা বা শংকর গাড়ুড়ির স্ত্রীর নাম কমলা। এই চরিত্রটি একেবারে পতিব্রতা, সরল স্বভাবের, প্রায় নির্বোধ নারীচরিত্র যা মধ্যযুগের বাঙ্গালী কুলবধূর অন্যতম টাইপ রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দক্ষিণ পাটন রাজ্যের রাণী—চাঁদ সদাগর বাণিজ্য করতে দক্ষিণ পাটনে যান। সেই রাজ্যের রাণীর চরিত্রের মধ্যে কবি ফ্যাসানপ্রিয় রমণীদের উৎকট শাসন প্রিয়তার ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নারী চরিত্র ঃ

ফুল্লরা—কালকেতুর উপাখ্যানের প্রধান নারী চরিত্র ফুল্লরা। দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরাম উচ্চবর্ণের সীমা অতিক্রম করে ব্যাধ জীবনের বাস্তবতার সংবাদ তুলে ধরেছেন এই চরিত্রে। ফুল্লরা কিছু জটিল চরিত্র নয়, কিন্তু অত্যন্ত জীবন্ত, প্রয়োজনে ছলনা ও চতুরতার আশ্রয় সে গ্রহণ করতে জানে। সুখে দুঃখে শ্রমে দারিদ্রে ফুল্লরার জীবনযাত্রা এবং স্বভাবে যে রূপটি কবিরা এঁকেছেন তার মধ্যে মধ্যযুগের শ্রমজীবী নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ফুল্লরা খুব জীবন্ত হলেও তাকে টাইপ বলে অভিহিত করা যায়। কবি ফুল্লরার দুঃখ প্রকাশ করবার জন্য বারমাস্যা লেখেন নি, এই অশিক্ষিত ব্যাধবধূর চাতুর্য্য প্রকাশই তাঁর লক্ষ্য। তার ঘরে সুন্দরী রমণীরূপী চণ্ডীকে দেখে সতীন সম্ভাবনা দূর করার জন্যই তার এই চেষ্টা। তার দুঃখ ছিল, কিন্তু দুঃখ নিয়ে কাঁদুনি গাইবার মত দুঃখ-বিলাস তার চরিত্রের কোথাও ছিল না। এই একান্ত সাধারণ অথচ অসাধারণ রমণী চরিত্রটিকে কবি উপাখ্যানের বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন যা বিশেষ চোখে পড়ে না।

লহনা—ধনপতি আখ্যানের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র লহনা। লহনা ধনপতির প্রথম পত্নী। বিগত-যৌবনা নিঃসন্তান এই রমণীর চরিত্র ব্যক্তিত্বকে আমরা প্রথম স্পষ্ট করে দেখতে পাই যখন ধনপতি সুন্দরী তরুণী খুল্লনাকে বিয়ে করবার জন্য মেতে উঠল। প্রথমে লহনাকে সতীনের আশঙ্কায় অধিকার লোপের ভয়ে এবং দুঃখে কাতর নারী হিসাবে দেখা গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে পরিচারিকা দুর্বলার সহযোগিতায় সতীনের উপর অত্যাচার করতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। কোন কোন কবি, যেমন স্বয়ং মুকুন্দরাম অবশ্য বলেছেন লহনা প্রথমদিকে সস্নেহ ব্যবহার করতে চেয়েছিল, পরে দুর্বলা ও লীলাবতীর পরামর্শে

সে খুল্লনার প্রতি অত্যাচার শুরু করে। মুকুন্দরাম এর দ্বারা একটু জটিল মনস্তত্ত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছেন। লহনার হৃদয় একেবারে মমতাশূন্য ছিল না বলেই তরুণী খুল্লনাকে স্নেহ করবে কিনা এরূপ একটা দুর্বলতা তার হৃদয়ে কিছুটা ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের গভীরে সপত্নীত্বের জ্বালা এবং ঈর্ষা সমান ভাবে এবং আরও তীব্ররূপে বর্তমান ছিল। লহনা মোটামুটি শান্তিভঙ্গকারী খলনায়িকারূপে চিত্রিত হতে পারত। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের বড় কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাকে জটিল মনস্তত্ত্ববোধের পাত্রীরূপে অঙ্কিত করেছেন। ফলে এই চরিত্রটি শিল্পগুণে এবং কবির মনস্তত্ত্ববোধের সূক্ষ্মতায় চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ নারী-চরিত্র হয়ে উঠেছে। লহনা চরিত্রে বঞ্চিতা-নারীর একটি দিক স্বল্পত প্রকাশ পেয়েছে, যখন পুত্রবতী খুল্লনার পাশে তাকে বন্ধ্যা নারীর জীবন কাটাতে হয়েছে।

খুল্লনা—ধনপতি আখ্যানের প্রধান নারীচরিত্র খুল্লনা। দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম প্রমুখ সব কবিই চরিত্রটি প্রযত্নে এঁকেছেন। চরিত্রটি সাধারণভাবে জীবন্ত; গার্হস্থ্য-প্রেম, দুঃখভোগ এবং বাৎসল্য প্রভৃতি মানসিকতায় উজ্জ্বল। কিন্তু লহনা চরিত্রের জটিলতা তার মধ্যে নেই। খুল্লনার চরিত্রে প্রণয়-রোমান্টিকতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে বসন্ত আগমনে তার মুখে কবি যে সঙ্গীত ধর্মী পদগুলি দিয়েছেন তার মধ্যে দিয়ে। খুল্লনা শুধু মধুর রোমান্টিক নয়, চতুর এবং গার্হস্থ্য। ধনপতির চিঠি যে লহনা জাল করিয়েছিল তা সে অনায়াসে ধরতে পারল। তাকে ছলাকলায় ভুলানো লহনার মত পাকা রমণীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। খুল্লনা বুদ্ধিমতী মেয়ে। ছাগল চরাবার দুঃখকষ্টের মধ্যেও প্রয়োজন ভুলে যায় নি, লহনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি সযত্নে রক্ষা করেছে। কবি খুল্লনাকে মুগ্ধ নায়িকা, নেহাত ভালমানুষ, আপন যৌবন স্বপ্নে মগ্ন ভাবে চিত্রিত করেন নি। খুল্লনার একাকিনী মাঠে বনে ঘুরে ছাগল রক্ষা ব্যাপারটা নিয়ে সমাজে কথা উঠেছে, এবং খুল্লনাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সমকালীন সমাজে নারীর সতীত্ব নিয়ে যে অভব্য রকমের বাড়াবাড়ি ছিল এর মধ্যে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকতে পারে, অন্য কিছু নয়। খুল্লনার চরিত্রে আর একটি পরিচয় প্রকাশ পেল পুত্র শ্রীপতির মাতা হিসেবে। প্রণয় নায়িকা, সতীন-সংসারে বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন দর্পিতা হিসেবে তার যে পরিচয় পাওয়া যায় এখানে এসে সে সব কিছু যেন মাতৃত্বের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে।

খুল্লনাকে অবলম্বন করে কবি বাঙ্গালী সমাজের মাতৃত্বের একটি পরম রমণীয় চিত্র অঙ্কন করেছেন।

চণ্ডী—চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে চণ্ডীকে আমরা নানাভাবে দেখতে পাই।

(১) দক্ষ কন্যা সতীরূপে।

(২) পার্বতীরূপে।

(৩) কালকেতু আখ্যানের দেবী চণ্ডিকারূপে।

(৪) ধনপতি আখ্যানের দেবী চণ্ডিকারূপে।

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে সতী চরিত্রের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। সে চিত্রে তিনি পুরাণের অনুগমন করেছেন, নতুন কিছু করেন নি। মুকুন্দরাম পার্বতীকে এঁকেছেন সেকালের মঙ্গলকাব্যের গার্হস্থ্য পরিবেশের এক রমণী এবং দরিদ্র স্বামীগৃহের গৃহিনী হিসেবে। খুব সংক্ষিপ্ত হলেও মুকুন্দরামের পার্বতী পূবে ধনীর আদুরে দুলালী পরে দরিদ্র গৃহস্থের দুঃখী গৃহিণী। তার মধ্যে বাঙ্গালি সমাজের নারীরূপের একটা বড় টাইপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কালকেতু উপাখ্যানের চণ্ডী মূলতঃ পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং শিকারীদের দেবীও বটে। একই সঙ্গে তিনি শিকার রক্ষা করেন এবং শিকার মিলিয়ে দেন। ধনপতি আখ্যানের চণ্ডী তাঁর দুটি ভিন্নরূপ নিয়ে ভক্তদের বর দিতে এবং ছলনা করতে কয়েকবার আবির্ভূত হয়েছেন। তবে কালকেতুর চণ্ডীকে কিছুক্ষণের জন্য মানবীরূপে দেখা যায়। মুকুন্দরাম এই সুযোগটুকুতেই তাঁর চরিত্রের একটি কৌতুক রসোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করেছেন।

দুর্বলা—দুর্বলা ধনপতি সদাগরের পরিবারে দীর্ঘকাল দাসীরূপে আছে। লহনার সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা। দুই সতীনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করবার কাজে সে পারদর্শিতা দেখিয়েছে। সে চতুরা দাসী। কিন্তু এই চরিত্রের অন্য দিক দেখতে পাওয়া যায় শ্রীমন্তের জন্মের পরে। বাড়ির শিশুটিকে এই পুরানো দাসী যত্নে হাততালি দিয়ে কৃষ্ণগান গেয়ে নাচাচ্ছে। বাৎসল্যরসের এই মধুর ভাবটি মুকুন্দরাম সযত্নে এঁকেছেন।

নিদয়া—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে একান্ত গৌণ তিনটি চরিত্রের উল্লেখ করলেই মুকুন্দরামের চরিত্রাঙ্কনের বিচিত্রতা বোঝা যাবে। কালকেতুর মা নিদয়া ধর্মকেতু ব্যাধের স্ত্রী। সে বালিকা পুত্রবধূকে তাদের গোষ্ঠীগত রীতিনীতি কাজকর্মে শিক্ষিত করে তুলেছে। বার্ধক্যে স্বামীর সঙ্গে তার তীর্থগমন এবং

স্বামীর মৃত্যুতে চিতারোহণ—এই দুই প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম বাস্তবতার হানি ঘটিয়েছেন। তিনি উচ্চবর্ণের জীবনাদর্শের অনুসরণ করতে চেয়েছেন যেটা ব্যাধসমাজের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক হয়নি।

মুরারির স্ত্রী—মুরারি শীল পোদ্দার এবং মহাজন। মুরারির স্ত্রী, নাম না থাকলেও তার একটি জীবন্ত ছবি এ কাব্যে আছে। অল্প অবকাশে একটি স্বার্থপর দুষ্টবুদ্ধি চতুর নারীর বাস্তবরূপ কবি অঙ্কন করেছেন।

লীলাবতী—লীলাবতী লহনাদের প্রতিবেশিনী, গৃহস্থ বধূ, কিন্তু কুচুটে স্বভাবের। প্রতিবেশীর সতীন কলহে ভূমিকা গ্রহণ, বশীকরণ জড়িবুটি ওষুধ, মন্ত্র সরবরাহ করা, জাল চিঠি তৈরী করে দিতে চরিত্রটি তৎপরতা দেখিয়ে খুবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের নারী চরিত্র ঃ

রঞ্জাবতী—রঞ্জাবতী ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র। তরুণী রাণী রঞ্জাবতী বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেনের প্রতি বাঙ্গালী সতী নারীর মনোভাব নিয়ে অনুগত থেকেছে। তার পতিভক্তি বা দেবভক্তি মোটামুটিভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যের আর পাঁচটা নারীচরিত্রের সমতুল্য। রঞ্জাবতী বৈশিষ্ট্য অর্জন করল পুত্র কামনাব দুষ্কর তপস্যা সাধনের মধ্যে অর্থাৎ শালে ভর দিয়ে তপস্যা। কবি রূপরাম শালে ভর দেবার পূর্বে রঞ্জাবতীর মনোভাবের যে ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে স্বাভাবিক মানবিক বোধটি প্রকাশ পেয়েছে। রঞ্জাবতী শেষ পর্যন্ত সাধনায় সফল হয়েছে। কাহিনীর এই পর্যায়ে পুত্র বৎসল রমণী হিসেবে রঞ্জাবতীর যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে বাঙ্গালী সমাজে এবং মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে তা সুলভ। সে দিক দিয়ে কবিরা রঞ্জাবতীর চরিত্রে কোন অভিনব মাত্রা যোগ করতে পারেন নি।

দুর্গা—দেবী চণ্ডী লাউসেনকে মোহিত করবার জন্য অনেক ছলাকলা করেন। যতক্ষণ চণ্ডী অর্থাৎ দুর্গা গণিকাবেশে অবস্থান করেছেন ততক্ষণ হাবভাবে কথায় যুক্তিতে তার কামচঞ্চল রূপই প্রকাশ পেয়েছে। তাকে মানব সমাজের অতি চতুরা এবং সুশিক্ষিতা এক গণিকা বলেই মনে হয়।

নয়ানী—'জামতি পালা'য় যে নারী প্রাধান্য পেয়েছে তার নাম নয়ানী। এখানে নারী সবল এবং পুরুষ দুর্বল। নয়ানী অর্থসম্পদের লোভে নয়, দৈহিক

সৌন্দর্যের কারণে লাউসেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। নয়ানী কামোন্মাদিনী, সে নানাভাবে ছলাকলা বিস্তার করে লাউসেনকে ভোলাতে চলল। কিন্তু লাউসেন তাকে সবলে এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যান করায় সে অন্য মূর্তি ধারণ করল। এই ধরনের মনোবিকার সম্পন্ন নারীর একটি চরমরূপ নয়ানীর মধ্যে কবি দেখিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুশ্চরিত্রা নয়নীর নাককান কাটা গেল। কিন্তু সে হোলো কবির নীতিকথা প্রচার। একটি খল কামুকা নারীর অসাধারণ চরিত্র হিসাবে নয়ানী বাঙলা সাহিত্যে অবশ্য স্মরণযোগ্য।

সুরিক্ষা—গোলাহাট রাজ্যটি একটি বৃহৎ বেশ্যাপল্লী। এখানে প্রধান রমণী সুরিক্ষা। সুরিক্ষা শুধু রূপে যৌবনে নয়, প্রাচীন শ্রেষ্ঠ গণিকাদের মত বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, চাতুর্যে এবং বহুবিধ কলায় নিপুণা রমণী। সাধারণ পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষেরই প্রাধান্য এবং নারীর দাসত্ব, এখানে যেন তার বিপরীত চিত্রটিই কবি এঁকেছেন। বেশ্যাপল্লীর অভ্যন্তরে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিপর্যয়ের একটা বাস্তব বোধের কিছুটা অতিশায়িতরূপ এখানে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা যাই হোক, সুরিক্ষার চরিত্রে প্রভুত্বের মধ্য দিয়ে একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে।

কলিঙ্গা—কলিঙ্গা লাউসেনের পাটরানী। কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যায় তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এবং লাউসেনের অনুপস্থিতিতে সে ময়নাগড়কে আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রথম যুদ্ধ যাত্রা করল, শত্রুবাহিনীকে প্রথমে পর্যুদস্ত করলেও শেষ পর্যন্ত শত্রু সৈন্যদের হাতে বন্দী হবার আগে আত্মহত্যা করে বীরাঙ্গণা হল।

কানড়া—কানড়া রণরঙ্গিনী দুঃসাহসী যুবতী। কানড়া চরিত্রটি সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাবার অবকাশ এখানে নেই। তবে এটুকু বলা যায় কবি কানড়ার মুখ থেকে বিভিন্ন অবস্থায় যে কথাগুলি বলিয়েছেন তাতে চরিত্রটিতে বীরত্ব, আত্মসম্মানবোধ এবং প্রেমের গাঢ়তা একইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে যা মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যে বিরল প্রায়।

লক্ষ্মী ডোমনী—লক্ষ্মী ডোমনী কালু ডোমের স্ত্রী। সে খুব উঁচু পর্যায়ের যোদ্ধারূপে স্বীকৃত ছিল, না হলে কালু ডোম লক্ষ্মীর হাতে ময়নাগড়ের রক্ষার ভার দিয়ে কখনো দেবী পূজার, আবার কখনো কখনো নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বার সুযোগ করে নিত না। লক্ষ্মী তার দায়িত্ব নিষ্ঠা এবং সাফল্যের সঙ্গে পালন

করত। লক্ষ্মী ডোমনী শুধু বীরত্বে নয়, মাতার স্নেহে, পতিভক্তিতে এবং পালক রাজাদের প্রতি আনুগত্যে এক অসাধারণ রমণী।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের নারী চরিত্র ঃ

অন্নদা—অন্নদামঙ্গল কাব্যের আরাধ্যা দেবী অন্নদা। ইনি প্রথমে সতী, পরবর্তীকালে পর্বতদুহিতা উমা এবং পার্বতী। ইনিই অন্নদারূপে কাশীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে কবি কখনও পুরাণাশ্রয়ী কিংবা লৌকিক, মাঝে মাঝে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কখনও ব্যঙ্গশিল্পীরূপে অন্নদার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র চিত্রিত করেছেন।

ঈশ্বরী পাটনী—ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রথম অংশের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু উল্লেখযোগ্য চরিত্র ঈশ্বরীপাটনী। চরিত্রটি একান্ত বাস্তব। এর মধ্যে বাংলার নিম্নস্তরের এক শ্রমজীবী নারীর চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোথাও কোনরূপ কল্পনা বা আতিশয্যের বর্ণপাত ঘটেনি। সে তার কাজ জানে, তার রীতি-নীতিও জানে। পাটনী সরল কিন্তু মূর্খ নয়। তাই সে নদীর ওপারে গিয়েও দেবীর পিছন ছাড়ে না। লোভে নয়, প্রধানত কৌতূহল মেটাবার জন্যই তার উদ্যোগ। কারণ শেষ পর্যন্ত দেবী স্বপরিচয় প্রকাশ করে তাঁকে বর দিতে চাইলে সে কিন্তু ধনসম্পদ, মুক্তি কিছুই চাইল না, এক সাধারণ গরীব জননীর মত বলল, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—এখানেই এই পাটনীর চরিত্রের অসাধারণত্ব প্রকাশ পেয়েছে। একান্ত সাধারণ এই প্রার্থনার দ্বারাই ঈশ্বরী পাটনী অসাধারণত্ব এবং অমরত্ব লাভ করেছে। ভারতচন্দ্রের কবিকল্পনা যে অত্যন্ত উচুমার্গের ছিল এই চরিত্র নির্মাণ তার প্রমাণ দেয়।

বিদ্যা—রোমান্টিক কাব্যের নায়িকা বিদ্যা। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে সে অতুলনীয়া। তার রূপের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন কবি। বিদ্যার গোপনে সুন্দরের সঙ্গে মিলনের যে উল্লসিত বর্ণনা কবি দিয়েছেন তাতে বিদ্যা চরিত্রের ব্যঙ্গ-প্রিয়তা, বুদ্ধির দীপ্তি প্রভৃতি কিছু কিছু প্রকাশ পেলেও যৌবনের স্রোতে প্রবলবেগে ভেসে যাওয়া এক তরুণীরূপেই তার চরিত্র প্রতিষ্ঠা পেল। কোন কোন সমালোচক এর মধ্যে নষ্টবুদ্ধি অসংযত তরুণীর কামুকতাই শুধু দেখেছেন। কেউ কেউ আবার এর মধ্যে সামাজিক প্রথা লঙ্ঘনকারী উচ্ছল যৌবন এবং প্রেমের জয়গান শুনতে পেয়েছেন। আমাদের মনে হয় উল্লিখিত

দুই প্রান্তিক সমালোচনাকে মিলিয়ে নিয়ে বিদ্যা চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যা অপরিণামদর্শী এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তরুণী। নিজেকে সংযত করতে শেখেনি একথা যেমন সত্য, তেমনি তার আচরণের মধ্যে সমাজ সংসার বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীনতা এবং প্রণয়াবেগ সর্বস্বতা যে একটা স্বাধীন ব্যক্তিত্ব তৈরী করেছিল একথাও সত্য। সর্বশেষে বলা যায় যে আরব্য রজনীর বহুসংখ্যক কাহিনীতে বাদশাহী হারেমের রমণীদের অবৈধ প্রণয় কাহিনীর উজ্জ্বল ছবি আছে। হৃদয়াবেগের তীব্র তাড়নায় এই রমণীরা প্রাসাদের বাইরে থেকে প্রেমিক পুরুষকে বিবিধ কৌশলে হারেমের অভ্যন্তরে নেবার ব্যবস্থা করত, বিদ্যার চরিত্র কল্পনায় তার কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

হীরামালিনী—ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী বিদ্যাসুন্দর কাব্যের একটি প্রধান চরিত্র। চরিত্রটি একটি টাইপ। শুধু মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে কেন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও নায়িকার দূতীসহচরীরূপে এ জাতীয় চরিত্র বরাবরই দেখা গিয়েছে। তার রূপ এবং স্বভাবের যে বিবরণ কবি দিয়েছেন তাতে হীরামালিনীর স্বভাবের মূল বৈশিষ্ট্য সহজেই প্রকাশ পেয়েছে। হীরামালিনী কোনোরূপ নীতির ধার ধারে না। শুভবুদ্ধি তার নেই, ভাবভঙ্গীতে তার ছলনা, পুরানো দিনের কামাচারের কিছু কিছু আভাস এখনো অবশিষ্ট আছে। সুন্দরের কাছ থেকে অর্থলাভের জন্যই সে এই অবৈধ প্রণয়ে দূতীয়ালির দায়িত্ব নিয়েছে। গোপনে সুন্দরের রাজকন্যার ঘরে প্রবেশে সহায়তা করেছে বিদ্যাকে নানাভাবে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করেছে। সবমিলে তার চরিত্র একমুখী, এর মধ্যে হৃদয় বৃত্তির কোন স্থান নেই। ধরা পড়ার পরে সে ভয় পেয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে—ক্ষুদ্রমনারা যা করে। তার কথাবার্তায় চালচলনে এক ধরনের ব্যাধিগ্রস্ত চাতুর্য ও বাক্‌ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। সব মিলে সে একটা বিশেষ ধরনের নিম্নস্তরের দুঃশীলা রমণী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী—ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রী, চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী। একবার মাত্র এদের দেখা মিলেছে কাব্যমধ্যে। ধনীগৃহের দুই বধূ। সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে, পূজা আচারে এদের যেটুকু ছবি পাওয়া যায় তার মধ্যে বিশিষ্টতা কিন্তু নেই, বাঙ্গালী পরিবার জীবনের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু স্বামীর উপরে অধিকার নিয়ে দুই সতীনে যে কলহ হয়েছে তার ব্যঙ্গাত্মক চিত্র কবি এঁকেছেন। কবি রঙ্গ কটাক্ষে, লঘু মেজাজে এই চিত্রটিকে ধরেছেন। এই দুই

রমণীর তুইদাসী—মাধী ও সাধী, এদের উসকে দিয়েছে এবং তারা কলহকালে যে ভাষা ব্যবহার করেছে তাতে কোথাও ভব্যতার মাত্রা রক্ষিত হয়নি। ভারতচন্দ্র আসলে একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেই খুশী থেকেছেন, চরিত্রের প্রকাশে উদ্যমী হননি।

শিবায়ন কাব্যে নারী চরিত্র :

পার্বতী—এই কাব্যে পার্বতীকে কৃষক রমণীরূপে তুলে ধরা হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে পার্বতী চরিত্র দরিদ্র কৃষক বধূর প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী গৃহকর্ত্রীর একটি প্রতিনিধি স্থানীয় রূপও স্পষ্টতঃ। রামেশ্বরের শিবায়ন অবলম্বনে পার্বতী চরিত্রের তিনটি দিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—

(১) বাগ্দিনীর ছদ্মবেশে বহির্মুখী স্বামীকে ফিরিয়ে আনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যঙ্গ ও রোমান্স।

(২) শাঁখা পরবার প্রসঙ্গে তরুণী বধূর সাধ-আহ্লাদ মান-অভিমান।

(৩) গৃহকর্ত্রী, পত্নী ও মাতারূপে স্বামী ও সন্তানদের লালন-পালন। আপাতদৃষ্টিতে রূপ তিনটি পৃথক পৃথক হলেও তাদের মধ্যে যোগসূত্র আছে। তিনটি স্বতন্ত্ররূপের সংযোগে দুর্গার একটি পূর্ণ চরিত্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে যখন ভারতচন্দ্রের মতো শক্তিশালী কবিও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টিতে আর উৎসাহী ছিলেন না, তখন রামেশ্বর বাংলার অগণিত কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে বাংলার প্রধান আরাধ্যা দেবী দুর্গাকে চিত্রিত করে একটি নতুন ধরনের সামাজিক চেতনার পরিচয় দিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের নারী চরিত্র :

রাধা—বৈষ্ণব সাহিত্যে ছয় কবি যথাক্রমে জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস রচিত—রাধা চরিত্র পরিস্থিতিগত ঐক্যের মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথম দুই কবির কাহিনী কাব্য অবলম্বন করে রূপায়িত। অন্য চারজনের রচনা বিচ্ছিন্ন পদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই একই ধরনের কাহিনীর সূত্র ভিতরে সক্রিয় থেকেছে এবং সমজাতীয় পরিস্থিতি নির্মিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রেম, রাধার মনে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের উন্মেষ ক্রমে তার পুষ্টি, তাদের প্রণয় লীলার

বৈচিত্র্য, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি 'গীতগোবিন্দ' বা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কবি ঘটনার সূত্রে বেঁধেছেন। গীতগোবিন্দে সূত্র খুব ক্ষীণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গাঢ়। পদাবলীতে এই প্রসঙ্গগুলি আছে, কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য নেই। কাহিনী কাব্য দুটিতেই পদ বা গীতেরই প্রাধান্য এবং উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলিকে আশ্রয় করে রাধার চরিত্রের উপস্থাপনা। এই ছয় জন বিশিষ্ট কবি রাধার ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। এঁদের মতানুযায়ী রাধার চরিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা রইল।

১। জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এঁদের রাধা মানবী, আদৌ দেবী নয়। কিন্তু জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের রাধা দেবীত্ব ও মানবিকতার মিশ্রণে সন্নিবেশিত অর্থাৎ রাধা এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির সার হ্লাদিনী। একে তত্ত্ব ভিত্তিক মানবিকতাযুক্ত, হিসাবেও বলা যায়। অর্থাৎ তত্ত্বের শিল্পরূপ বিশেষভাবে প্রকাশিত।

২। জয়দেব ও বিদ্যাপতির রাধায় রাজসভা সংশ্লিষ্ট নাগরিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের রাধা গ্রামীণ। গোবিন্দদাসের রাধা অধ্যাত্ম পথের সাধিকা তাই সেখানে নাগরিকতা অথবা গ্রামীণতা অনির্দিষ্টই বলা যাবে।

৩। জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে কাম ও দেহ ভাবনার আধিক্য-পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের রাধা এ সবের উর্দ্ধে, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সারভূত বিগ্রহ রাধা অর্থাৎ রাধাই পূর্ণশক্তি। ইন্দ্রিয় প্রেমের সাড়া এখানে মেলেনা।

৪। বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের রাধায় দেহ ভাবনার স্থান থাকলেও মনোভাবনার গভীরতা সেখানে আছে, তার বিচ্ছেদ বেদনা, মিলনানন্দ দুই-ই গভীর এবং আন্তরিক। কিন্তু জয়দেব ও গোবিন্দদাসের রাধায় এ বিষয়ে আন্তরিকতা ও গভীরতার অভাব, কারণ এখানে রাধা আরাধিকা।

৫। চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটেছে বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধায়। নানান পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাধাকে প্রথমদিকে কিছুটা বালিকা স্বভাব, পরে প্রগাঢ় যৌবনা মনোভাব দেখানো হয়েছে। কিন্তু জয়দেব ও গোবিন্দ দাসের রাধা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এরা বিভিন্ন পদ

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রাধার পূর্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ, মিলন, অভিসার প্রভৃতি পর্যায়ে বৈচিত্র্য আনাবার চেষ্টা করেছেন। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের রাধার চরিত্রের কোন ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। চণ্ডীদাসের রাধা, প্রথম থেকেই প্রগাঢ় যৌবনা। জ্ঞানদাসের রাধা সর্বদাই আত্মমগ্ন, নিজের উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করে আত্মহারা।

বড়াই—বড়াই চরিত্রটি একটি সামাজিক টাইপ। এই চরিত্রটি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর। একদিকে নায়িকা অর্থাৎ রাধার সহচরী দূতী অন্য দিকে কামশাস্ত্রবর্ণিত কুট্টিনী। এই দুয়ের মিশ্রণের ফলে চরিত্রটি গড়ে উঠেছে। কূটবুদ্ধিতে ছদ্মঅভিনয়ে সে যেমন নিপুণতা দেখিয়েছে, তেমনি রাধাকৃষ্ণের বিলাসে মিলনে সে দূরে থেকেছে, আবার কলহের সময়ে প্রয়োজনমত এগিয়ে এসে সন্ধিও করিয়েছে। কবি চরিত্রটিকে মোটামুটি স্বার্থশূন্য করে তৈরী করেছেন।

যশোদা—বৈষ্ণবপদাবলীর যশোদা একেবারেই বাংলা দেশের গ্রামীণ জীবনের মায়ের একটি টাইপ। যশোদাকে কেন্দ্র করে পদাবলীর বাৎসল্য রসের কবিতা গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব কবিদের যশোদার বৈচিত্র্য নেই, অসাধারণত্ব নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য স্বাভাবিকতা আছে। সে বাঙ্গালী মাতৃত্বকে প্রকাশ করেছে এবং ভগবান কৃষ্ণকে ঘরের ছেলে করে তুলেছে।

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া—যশোদা পৌরাণিক, শচীমাতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ঐতিহাসিক চরিত্র। চৈতন্য-জীবন-চরিতে শচীমাতাকে আমরা একটু বিস্তৃত ভাবে পাই। কবিদের কাছে তিনি মানবী মাতা। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে শচীমাতা একান্ত স্বাভাবিক জননী-গৃহিনীরূপে জীবনী গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর চরিত্রের বেদনাবিধুর রূপটি প্রকাশিত হয়েছে নিমাই এর সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে। বিশেষ করে বাসুদেব ঘোষের ও বল্লভদাসের কবিতায় এই ভাবটি প্রকাশ পেয়ে শচীমাতার চরিত্রটিকে খুবই জীবন্ত করে তুলেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রটি বৈষ্ণবসাহিত্যে উপেক্ষিতা একটি নারী চরিত্র। ভগবান গৌরাঙ্গের পিছনে পড়ে গিয়েছেন তিনি। তিনি বেদনাবিদ্ধ কিন্তু প্রশান্তচিত্ত নারী। স্বামীর স্মৃতিকে বুকে নিয়ে ভক্তিপ্লুত চিত্তে শুদ্ধ সন্ন্যাসিনী ফলে তার বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি এবং পাঠককূল এই নারী চরিত্রের ট্রাজিক রূপ প্রাপ্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বিবিধকাব্য—শক্তি-পদাবলীর নারী চরিত্র ঃ

মেনকা ও উমা—পুরানো বাঙলা সাহিত্যে বাৎসল্য স্বভাব জননীর যে সব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে মেনকা চরিত্রের ভূমিকা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। শাক্তপদাবলীর মেনকা বৃদ্ধ এবং দরিদ্র পাত্রের হাতে বালিকা কন্যা সমর্পণ করে নানান আশঙ্কায় দিন কাটায়। তার জন্য মায়ের বেদনা একটি চিরস্থায়ী এবং সর্বব্যাপী সামাজিক বাস্তবতা। এই বেদনার সঙ্গে আনন্দও মিশ্রিত থাকে, ফলে নানারঙের আলোছায়ার খেলা মাতৃচরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে কবিদের তৈরী মেনকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। চরিত্রটি তাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মেনকার মতো উমার চরিত্রটিকে কবিরা ততখানি প্রাধান্য দেন নি। বাপের বাড়ী ছেড়ে যাবার এবং বাপের বাড়ীতে না আসতে পারার জন্য অভিমান ; প্রভৃতি ঘটনাকে ঘিরে চরিত্রটি বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে রূপে প্রতিষ্ঠিত। কবিরা অল্প বয়সী বিবাহিতা বঙ্গ বালিকার ক্রন্দনরূপকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এই উমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

নাথ সাহিত্য—গোর্খ বিজয়-এর নারী চরিত্র ঃ

পার্বতী—শিবপত্নী পার্বতী হিন্দুদেবীরূপে যতই মহিমার উর্দ্ধলোকে বাস করুন না কেন 'গোর্খ বিজয়' এ তাঁর লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করা হয়েছে। তার স্বভাবেও কামবৃত্তির প্রাধান্য। গোরক্ষনাথের হাতে তাঁকে রাক্ষসী হতে হয়েছে। শিবের কথায় দেবী অবশ্য শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছিলেন।

গর্ভেশ্বরের কন্যা—গর্ভেশ্বর রাজার কন্যাকে গোরক্ষ শিবের নির্দেশে গ্রহণ করে তার সঙ্গে কোনরকম দৈহিক সম্পর্কে না গিয়েই অবলৌকিক উপায়ে একটি সন্তান দিলেন।

কদলীর রাণী—এই চরিত্রে কোন অতি কামুক ডাকিনীবৃত্তি প্রকাশ পায়নি। তিনি নারীপ্রধান এই রাজ্যের রাজার স্ত্রী হয়েও সন্তান সহ সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনযাপন করতেন। অথচ গোর্খ বিজয়ের কবি সহজ দৃষ্টিতে এদের ছবি আঁকতে চাননি। গোরক্ষনাথের অভিশাপে রাণীকে বাদুড় হয়ে উড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

গোপীচন্দ্রের গানের নারী চরিত্র ঃ

ময়নামতী—ময়নামতী নাগপন্থীদের একজন সিদ্ধা রমণী। তিনি অষ্টসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। কোন নারী যে নিজ চরিত্রগুণে নাথপন্থী সিদ্ধাইদের মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করতে পারে ময়নামতী চরিত্রটি তার প্রমাণ রেখেছে। স্বামীর মৃত্যু শিয়রে এলে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করবার জন্য তিনি তাঁর জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেবতাদের অনুরোধে তাকে নিশ্চেষ্ট হয়ে ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়েছিল। মায়ের বেদনাবোধ দৃঢ় চিত্তে সংযত করে পুত্রকে সন্ন্যাসীর বেশে নির্বাসন পাঠানো এই যে মাতৃ চরিত্রটি পুরানো বাঙলা সাহিত্যে তা এক অভিনব রূপের সন্ধান দেয়।

অদুনা ও পদুনা—গোপীচন্দ্র রাজার দুই স্ত্রী—অদুনা ও পদুনা। ময়নামতী যখন গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস পাঠাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন সদ্য বিবাহিত এই তরুণী নারীদের পতি বিচ্ছেদের বেদনা একান্ত মানবিক রূপে গ্রামীণ কবিরা ফুটিয়ে তুলেছেন। এরা দু-জনে এর পরে কাহিনী থেকে দূরে চলে যায়। দীর্ঘ বারোবছর পরে সিদ্ধকাম রাজা ফিরে এলে এই নারীদের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্ক যে খণ্ডিত হয়ে পড়ে তার দীর্ঘশ্বাস কবি সঠিকভাবে সাজিয়ে তুলতে পারেন নি।

হীরানটী—এই চরিত্র একদিকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করেছে, অন্যদিকে লেখকদের ধর্মীয় মনোভাবের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সেকালীন বারবণিতার টিপিকালরূপ এই চরিত্রটির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তবে নাথপন্থী সাহিত্যে চরিত্রটিকে মূলত কামপিণ্ড স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

লোরচন্দ্রালীর নারী চরিত্র ঃ

চন্দ্রালী—এই চরিত্রটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে অনুজ্জ্বল। লোক প্রচলিত কাহিনীটিতে এবং হিন্দী কাব্যে চন্দ্রালী রোমাণ্টিক নায়িকা মাত্র। মুসলমান কবি দৌলতকাজী এই চরিত্রটিকে এমন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন যেখানে সামাজিক বাধানিষেধকে অস্বীকার করে এই হিন্দু রাজকন্যাকে অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট করে পরকীয়া প্রেমকে মনস্তাত্ত্বিক অপরিহার্যতা দান করতে চেয়েছেন যা মধ্যযুগে স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলে সমাজ মনে করত না।

চন্দ্রালীর সখী—চন্দ্রালীর সখীদের মধ্যে একটি নারী বারবার সামনে এসে পড়েছে, যদিও কবি তার নাম করেন নি। সখীদের চরিত্রে সচরাচর

বৈশিষ্ট্য কিছু থাকে না, তারা সর্বদাই ছাঁচে ঢালা। এই সখীটির মধ্যে কিন্তু কবি চন্দ্রালী সম্পর্কে কিছুটা হৃদয় উত্তাপ সঞ্চারিত করেছেন।

মহাদেবী—চন্দ্রালীর মাতা গোহারী রাজ্যের রাণীকে মহাদেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চরিত্রটি আঁকতে গিয়ে কবি বাস্তবতার প্রতি বিমুখতা করেছেন।

ময়নামতী—চন্দ্রালীর তুলনায় ময়নার চরিত্রে বৈচিত্র্য কম। তবে গভীরতা ও দৃঢ়তার অভাব নেই। ময়নাও বঞ্চিতা নারী, তার স্বামী লোর তাকে রাজপ্রাসাদে ফেলে দেশ পরিক্রমায় গিয়েছে। শুরুতে লোরের সঙ্গে গভীর প্রণয় সম্পর্ক হলেও কিছু কালের মধ্যে তা অতৃপ্তির কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায় স্বামী পরিত্যক্তা হয়েও পরপুরুষের প্রণয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সতীত্বের পরম আদর্শের সব প্রলোভনের মধ্যেও গৌরবময় হয়ে উঠেছে।

মালিনী—চরিত্রটি বাঙলা সাহিত্যে অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে কুট্টনী জাতীয় একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ময়নাকে অবৈধ প্রেমের প্রতি আকৃষ্ট করবার কাজে লাগিয়েছে। অবশ্য ময়নার সতীত্বের তেজের কাছে সে সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছে এবং শাস্তিও কিছু পেয়েছে।

আলাওলের পদ্মাবতীর নারী চরিত্র ঃ

পদ্মাবতী—পদ্মাবতী কাব্যের এটি প্রধান নারী চরিত্র। আলাওল তার কাব্যমধ্যে সুফীবাদের রূপককে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু ধর্মসাধনার আবরণকে অতিক্রম করে পদ্মাবতীকে রোমান্টিক প্রণয় নায়িকা চরিত্র হিসেবে প্রকাশ করিয়েছেন।

নাগমতি—এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সপত্নী বিদ্বেষের রূপটি বঙ্গদেশীয় পারিবারিক চিত্রের ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গীতিকাসাহিত্য ঃ

চন্দ্রাবতী—এটি একটি ঐতিহাসিক নাম। চন্দ্রাবতীর জীবন-কাহিনী অবলম্বনে লোক কবি দ্বিজ কানাই 'চন্দ্রাবতী' পালাটি রচনা করেছেন। চন্দ্রাবতী বাল্য সাথী জয়ানন্দের সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের বিবাহ হয়নি। লোক কবি চন্দ্রাবতীর এই বিরহ বেদনাকে একটু স্বতন্ত্রভাবে

দেখেছেন, গম্ভীর মৌন ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী রূপে চিত্রিত করেছেন। জয়ানন্দ পরবর্তী সময়ে তাঁর কাছে ফিরে এলে চন্দ্রাবতীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত রমণীর ট্রাজিক রূপটি কবি সংযত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

মদিনা—মদিনা চরিত্রে তাঁর বর্ণনার মধ্য দিয়ে জটিলতা নয়, সরল গভীরতার যে আন্তরিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন তা পাঠককে স্পর্শ করে।

সুনাই—সুনাই দেওয়ান ভাবনার কাছে স্বামী মাধবের মুক্তির জন্য আত্মসমর্পণ করেছিল। তাঁর আত্মদানের বিশিষ্টতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বামীর প্রাণ রক্ষায় আত্মবিসর্জন এদেশীয় নারীজাতির মহান ঐতিহ্য। কিন্তু সুনাই একটু অভিনব।

মহুয়া—রচনা হিসাবে মহুয়া একটি উচ্চস্তরের গীতিকা। এই পালার নায়িকা মহুয়া পার্বত্য অঞ্চলবাসিনী বেদের কন্যা। স্বভাবে ও আচরণে তার সঙ্গে অন্যান্য নারীচরিত্রের পার্থক্য আছে। যাযাবরী রমণীর তীব্র কামনা, সব রকম বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যে দুঃসাহসীকতাকে প্রকাশ করেছে তা গৃহস্থ নায়িকাদের থেকে অনেকখানি পৃথক করেছে। সেকালের গ্রাম্য কবি মহুয়ার চরিত্রে রোমান্টিকতার সঙ্গে তীব্র কামবাসনাকে মিলিয়ে ফেলেছেন। নদের চাঁদের সঙ্গে মিলনে তার সামনে এক পর্বতপ্রমাণ বাধা এসে দাঁড়ালেও মহুয়া সাহসিকতায়, বলিষ্ঠতায়, প্রেমের তীব্রতায় এই সব বাধা অতিক্রম করে প্রিয়মিলনের পথ তৈরি করেছে। তার সৌন্দর্য যেমন অগ্নিশিখার মতো তার কামনাও তেমনি কোন বাধা মানেনি। এবজন্য নির্মম ছুরিকাঘাতে শত্রুকে বধ করতেও দ্বিধা করেনি। শেষ পর্যন্ত তার প্রণয় মিলন মাধুর্যে সার্থকতা পায় নি, ট্রাজেডির যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু বাংলার নরম ভেজা মাটিতে এ জাতীয় প্রেমিকা নারীচরিত্র চিত্রণ একটি স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে এসেছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নারী চরিত্রগুলির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত হোলো। আলোচনা থেকে মোটামুটি যে কথাগুলি বেরিয়ে এসেছে তা হোলো—

(১) মধ্যযুগের বাংলার সমাজ, নারীর সতীত্ব, বহুবিবাহ-এ সবের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকলেও নারীর মুক্তি ও বৈচিত্রের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

(২) সাহিত্য রচনাকারগণ তাদের রচনায় নারীচরিত্রের বিচিত্র গার্হস্থ্য রূপটি ফুটিয়ে তুলতে সার্থক হয়েছেন।

(৩) রাধা চরিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের কবিরা নারী চরিত্র রূপায়ণে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে তার সার্থকরূপ প্রদানে সমর্থ হয়েছেন।

(৪) মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে বড় কবিরা কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় প্রবেশ করতে পারলেও সাধারণমানের কবিরা বাইরের ছবিই বেশি পরিমাণে এঁকেছেন।

(৫) মধ্যযুগের নারী চরিত্রগুলি যথাক্রমে—গৃহবধূ (উচ্চ ও নিম্নবর্ণের), রোমান্টিক প্রণয় নায়িকা, বীরাঙ্গণা (উচ্চ ও নিম্নবর্ণের), দুশ্চরিত্রা নারী, দূতী-কুট্টিনী, যাযাবরী, অবৈধ প্রণয়-নায়িকা প্রভৃতি কয়েকটি বর্ণে ভাগ করে আঁকা হয়েছে।

(৬) জটিল মনস্তত্ত্ব বেশ কয়েকটি নারীচরিত্রে লক্ষণীয়।

(৭) দেবী চরিত্রগুলিতে কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও তার বেশীরভাগই মানবিক লক্ষণযুক্ত।

(৮) কোন কোন কাব্যে ধর্ম ও সাধনতত্ত্বের অতিরিক্ত চাপের ফলে নারী-চরিত্রের স্বাভাবিক রূপ ফুটে উঠতে পারে নি।

সর্বোপরি, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য নারীচরিত্র সৃষ্টিতে সমৃদ্ধি, নিপুণতা ও বৈচিত্রের পরিচয় দেয় এবং সমকালীন বাঙ্গালী সমাজের নানান শ্রেণী, বিভিন্ন টাইপের রূপদানের পাশাপাশি সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে চরিত্র রচনায়ও সাফল্য দেখিয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১. 'শিক্ষার অঙ্গনে এদেশের নারী' (পৃঃ ১৩)—কৃষ্ণকলি বিশ্বাস।

২. 'শিক্ষার অঙ্গনে এদেশের নারী' (পৃঃ ১৪)—কৃষ্ণকলি বিশ্বাস।

৩. The English Work of Raja Rammohan Ray' Pub. by Sadharan Brahma Samaj, (1934) PP. 73—74

৪. 'উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আলোকে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১০)—কৃষ্ণকলি বিশ্বাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও রোজনামচা ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দী নবজাগরণের শতাব্দী। এ শতাব্দী সমাজের অন্যান্য ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগতেও আলোড়ন তুলেছিল। শুধুমাত্র পুরুষরাই নয়, নারীগণও এ শতাব্দীতে বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টায় জয়ী হয়েছিল, আর প্রাণভরে মুক্ত বাতাসের স্বাদ উপভোগ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময় অর্থাৎ দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে নারী ছিল পর্দানসীন, সামাজিক নানান কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে পেল স্বস্তি। তবে নারীর এই পর্দার আড়ালে আসীন থাকবার ইতিহাস বেশী দিনের নয়। বিগত দিনে অর্থাৎ বৈদিক যুগে নারী ছিল মুক্ত, পুরুষের মতো নারীও সমাজের একজন স্বাধীন স্বত্তার অধিকারী হিসাবে নানান কর্ম-ধারায় পুরুষের পাশে, হাতেহাত মিলিয়ে এগিয়ে চলত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সে সময়ে ঋষিগণ বেদমন্ত্র রচনা করতেন, নারী-পুরুষ উভয়েই তথায় যজ্ঞীয় কার্য্য নির্বাহ করতে পারতেন। বর্তমানে যেমন শুধুমাত্র পুরুষেরাই পুরোহিতের কর্ম সম্পাদন করবার অধিকারী, পূর্বে সেরূপ প্রণালী প্রচলিত ছিল না। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি বলেছেন—"...বিশ্ববারা নাম্নী অত্রিবংশীয় বিদ্যাবতী রমণী নিজেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন।" (৫ম, ২৮ সং)

বেদের সময়ে দুহিতারা পিতৃধনের অধিকারিণী হতেন, এর স্পষ্ট বিধানও আছে। গৃৎসমদ ঋষি ইন্দ্রের স্তোত্র করতে করতে একস্থানে বলেছেন, "হে ইন্দ্রদেব ! পিতামাতার নিকটে যাবজ্জীবন অবস্থিতা কন্যা যদ্রূপ নিজ পিতৃকুল হইতেই ভাগ প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমি তোমার সমীপে বিত্ত যাঞ্চা করিতেছি ·।" (২য়, ১৭ সং)

বেদের সময়ে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, তবে সবাই যে বিবাহ করত এমন নয়, বিধবারা পাশ ক্রীড়ায় অর্থ উপার্জ্জন করতেন। সুতরাং কতিপয় বিধবা পুনর্বার বিবাহ করতেন না। বিধবাবিবাহ বেদের অনুমোদিত। বেদের বিধান এই—

"এই রমণীরা বৈধব্য যন্ত্রণা অনুভব না করিয়া, অভিমত স্বামী পাইয়া ঘৃত ও অঞ্জন সহিত গৃহে প্রবিষ্ট হউক। অশ্রুজল বিসর্জ্জন না করিয়া নীরোগ ও সালঙ্করা হইয়া গৃহে আসুক।"[১]

বেদের সময়ে সহমরণ বিধি অপ্রচলিত ছিল। যে মন্ত্রটি সহমরণের পোষকমত বলে রঘুনন্দন ভটাচার্য্যের স্মৃতিসংগ্রহে উদ্ধৃত হয়েছে, তা উক্ত ব্যাপারের অনুকূল নহে, কিন্তু প্রতিকূল। "অগ্রে" শব্দের পরিবর্তে "অগ্নে" মনে করে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মহাশয় সতীদাহ বেদের অনুমোদিত প্রমাণ করেছিলেন। তা ঋগ্‌বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম ঋকের অনুবাদ। এর পরবর্তী মন্ত্রে বিধবা বিবাহের যে নির্দেশ আছে তা হোলো—

"হে নারী। তুমি নির্জীবের সমীপে শয়ন করিয়া আছে, তাহার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীব-লোকে (জীবিত লোকের নিকট) আগমন কর…।"[২]

অসবর্ণ বিবাহ এবং স্বয়ংবর প্রথাও প্রাচীনকালের সমাজে চলত। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ২৭ সূক্তের দ্বাদশ ঋকে এবিষয়ে অবগত হওয়া যায়।

"স্বয়ংবর ও গান্ধর্ব পরিণয় দুই স্বতন্ত্র বিষয়, ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন। গান্ধর্ব বিবাহে বর-কন্যা পরস্পর সম্মত হইয়া উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বয়ংবর বিবাহ ওরূপ নয়। ইহাতে কন্যা ভর্তৃনির্বাচন করিবার অধিকারিণী।"[৩]

সুতরাং, উক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টতঃ, নারী প্রাচীন বৈদিক যুগে ছিল সমাজের অগ্রগণ্যা, দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী সময়কালে সমাজই তাকে নানান কায়দায় করে তোলে সমাজের একজন অতি অবাঞ্ছিত জীব। এ অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না বলেই উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারকগণ মাথা চাড়া দিলেন। এবং এঁদের প্রচেষ্টায় নারী পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসতে থাকে। একাজে পূর্ণ সফলতা লাভ সম্ভবপর হয়েছে বলা যাবে না। তবে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সহমরণপ্রথা বন্ধ হয়েছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহপ্রথা আইন স্বীকৃত হয়েছে এবং স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা হয়েছে।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারলাভ কতটুকু হয়েছে সে আলোচনায় না গিয়ে উনবিংশ-শতাব্দীর সাহিত্যজগতে যদি প্রবেশ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, এ শতাব্দীর অর্ধ সময় পার করে সাহিত্য জগতের প্রবেশদ্বার নারীদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে। এ শতাব্দীর নারীদের সাহিত্যচর্চার আলোচনায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে

যদি সাহিত্য-জগতের সামগ্রিক চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা যায় তবে বিষয়টি পূর্ণতা পাবে আশা করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে দু-একখানি আইনের বই বাঙলায় লেখা হয়। এসব বই সাহিত্যের কোটায় পড়ে না, এগুলি দলিল পত্রের মত আরবী-ফারসী শব্দে পূর্ণ। বাঙলা গদ্য সাহিত্যের আরম্ভ উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম থেকে। বিলেত থেকে সদ্য আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজের কার্য্যারম্ভের বছরেই কেরীর 'ব্যাকরণ ও কথোপকথন', রামরামবসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং গোলক নাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' প্রকাশিত হয়। রামরাম বসুর অপর গদ্য 'লিপিমালা' প্রকাশিত হয় ১৮৩২ সালে। ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হয় চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন'।

কেরী, মার্শম্যান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় শিল্প প্রচারকগণ নিজেরা লিখে অথবা পণ্ডিতদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে বাঙলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে থাকেন। এ কার্য্যে বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যথা রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্তদেব, রাজা কালীকৃষ্ণদেব প্রমুখ ব্যক্তিরাও সহোযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এ-যুগের গদ্য গ্রন্থ প্রায় সবই হয় সংস্কৃতে নয় ফরাসী নয় ইংরেজী অনুবাদ। অবশ্য দু-একটি মৌলিক রচনাও হয়েছিল। এ সময়ের বাঙলা গদ্যের রূপ ছিল নিতান্তই অমার্জিত। দু-একজন লোকের রচনার অংশ বিশেষ ছাড়া কোনো লেখার সাহিত্যিক মূল্য খুবই কমই ছিল, যা থেকে গদ্যভঙ্গির অপরিণত রূপই পরিলক্ষিত হয়েছে।

কেরীর উদ্যোগে শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় ১৮১৮ সালে বাঙলা সাময়িকপত্রের প্রবর্তন করেন। এপ্রিল মাসে (১৮১৮ সালে) 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হলেও অল্পদিনের মধ্যে তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ঐবছরেই ২৩-মে প্রথম বাঙলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন জন মার্শম্যান, তবে দেশীয় পাণ্ডিত ব্যক্তিগণই এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সম্ভবতঃ অল্প কিছুদিন পূর্বে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাঙ্গল গেজেটি অর্থাৎ

বেঙ্গল গেজেট বের করেন। বাঙ্গালীর উদ্যোগে প্রকাশিত এ'টিই প্রথম সাময়িকপত্র।

সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়েই শিক্ষিত বাঙ্গালী সর্বপ্রথম গদ্যসাহিত্যের রসগ্রহণ করতে শেখে। পূর্ববর্তী সাহিত্য সবই পদ্যে রচিত এবং এর বিষয়বস্তু ছিল ধর্মসম্বন্ধীয় অথবা সর্বজনবিদিত কাহিনী ঘটিত। নূতন তথ্য বা গল্পের রস যে সাহিত্যে পাবার উপায় ছিল না, সাময়িক পত্রের মাধ্যমে তা পাঠকের সামনে এল। ফলস্বরূপ সাময়িকপত্রের চাহিদা বাড়তে লাগল এবং বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার খুলে গেল। অন্যান্য কিছু সাময়িক ও সংবাদপত্র যথা 'সংবাদ কৌমুদী' (১৮২১), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২), প্রকাশিত হল। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭—১৮৫৮)। তিনি পদ্য ও গদ্য উভয় বন্ধেই পুস্তক রচনা করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই ধারা—প্রাচীন পদ্যবন্ধ এবং আধুনিক গদ্যবন্ধ উভয়ের সম্মিলন ঘটেছিল। ভবানীচরণ দুইপথে চলেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আরো অগ্রসর হয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই যুগের মধ্যে সেতু সংযোগ করলেন। তিনি ছিলেন, সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রসেবী সাহিত্যিক। তিনি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা (১৮৪৩) প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সাময়িকপত্রের প্রথম পর্বশেষ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকেরা পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে যে গদ্যরীতির প্রবর্তন করলেন তা যথাক্রমে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের লেখার ভিতর দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলছিল। একে এই আদিম গদ্যে শ্রী বা ছন্দ বিশেষ কিছু ছিল না, তার উপর চলতি ভাষার শব্দের সঙ্গে আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের উৎকট প্রয়োগের আতিশয্য। সর্বোপরি সংস্কৃত কিংবা ইংরাজী ছাঁচে বাক্যগঠন প্রণালী। প্রথম যুগে পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের একান্ত অনুকরণে বাক্য বিন্যাস করতেন তা যদিও বা বোঝা যেত, কিন্তু অধিকাংশ বিশেষ করে পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর প্রায় সব লেখক ইংরাজী থেকে অনুবাদ করতেন বলে তাঁরা বাক্য রচনায় হুবহু ইংরাজী রীতি অনুসরণ করতে ইতস্ততঃ করতেন না। এই কারণে এই গদ্যভঙ্গি ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য ও সুপাঠ্য বোধ হোতো না।

এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মনীষী পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—১৮৮৫)। তাঁর 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' গ্রন্থমালায় বহু ইংরাজী গ্রন্থের এবং কিছু কিছু সংস্কৃতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যজগতে শ্রীহীন গদ্যভঙ্গি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক ছিল। বাঙ্গালা গদ্যের পরনির্ভরশীলতার দোষমুক্ত করে এবং এর পঙ্গুত্বমোচন করে যিনি একে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের বাহন করে তুলে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তিনি হলেন আধুনিক বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সন্তান পুরুষসিংহ প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাঙ্গলা গদ্যের প্রবর্তনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহযোগী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬)। এছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পন্থা অবলম্বন করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁরা বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজনারায়ণ বসু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাশংকর তর্করত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর. কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ। বাঙ্গালা গদ্যের ভাষাকে ভারি চাল, দরবারি ঢঙের ভাষা থেকে লঘু এবং সর্বদা ব্যবহারযোগ্য করেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—১৮৯৪)।

পুরুষের অভ্যুত্থান আর মহিলার জাগরণ সমমাত্রিক নয়। ১৮৫৮ সালে বাঙালী পুরুষ বি. এ. পাশ করে, ১৮৬৪ সালে সে আই. সি. এস. হয়েছে। কিন্তু ১৮৮৩ সালের পূর্বে কোন বঙ্গললনা বি. এ. উপাধি পাননি, যদিও ১৮৪৯ সালের ভিকটোরিয়া গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা পরে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম বঙ্গললনা কাদম্বিনী বসু (ব্রাহ্ম ১৮৮৩) এবং চন্দ্রমুখী বসু (খৃষ্টীয় ; ১৮৮৩) বি. এ. ডিগ্রী পান। হুগলী জেলার উত্তরপাড়াতে এই সময় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি মেয়েদের স্কুল গড়ে তোলেন এবং একই সময়ে কিশোরীচাঁদ মিত্র একটি ঐ জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হলেও তদানীন্তন সময়ে কিছু কিছু পরিবারে বিশেষ করে ব্রাহ্মপরিবারে মেয়েদের গৃহশিক্ষা গ্রহণের প্রচলন ছিল। যে সমস্ত মহিলা গৃহশিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং কিছু কিছু লেখেনও তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত, কৈলাসবাসিনী দেবী, রমাসুন্দরী দেবী, কুমুদিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ। পিতা বা স্বামীর আনুকূল্যে তাঁদের লেখাপড়া

লেখা সম্ভব হয়েছে। এঁরা শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রী এঁদের ছিল না।

বাঙ্গালা সাহিত্যজগতে মহিলাদের অনুপ্রবেশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধশতকে অর্থাৎ ১৮৫০-এ। যদিও বলা হয়েছে যে, ১৮৫০-এর দশকে মহিলার লেখা প্রকাশিত হয়, কিন্তু ১৮৭০ এর পূর্বে নারী রচিত লেখা যথেষ্ট কম প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য ১৮৫০-এর পূর্বেও দু-একটি পত্র পত্রিকায় মহিলাদের দু-একটি লেখা প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু এ লেখাগুলি খুব সম্ভব মহিলা নাম দিয়ে পুরুষ লেখকেরই। কতকগুলি পত্রিকা, যেমন—'বামাবোধিনী' (১৮৬৩-১৯২৩), 'অবলাবান্ধব' (১৮৫৯-৭৩), 'বঙ্গমহিলা' (১৮৭০-৭৭), 'ভারতী' (১৮৭৭-১৯২৬), মহিলা লেখিকাদের লেখা নিয়মিত প্রকাশ করত এবং মহিলাদের লেখা প্রকাশে নানানভাবে উৎসাহী করত। বিশেষ করে বামাবোধিনী পত্রিকা মহিলাদের রচনার সঠিকতা যাচাই করত, প্রমাণ নিয়ে তবে মহিলাদের লেখা প্রকাশ করত। এর ফলে পুরুষ লেখকের মহিলা ছদ্মনামে লেখবার প্রবণতা কমে গিয়ে মহিলা লেখিকা তৈরী হতে থাকে।

প্রথম দিকের লেখিকারা প্রায় সকলেই এমত পোষণ করতেন যে, 'শিক্ষা ব্যতীত মহিলাদের হৃদয় সংকীর্ণ ও অমার্জিত থেকে যায় এবং অশিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে পশুর তেমন কোনো পার্থক্য নেই'।[৪]

যে মহিলাদের শিক্ষিত স্বামী ছিলেন, তাঁরা অনেকে এমন হীনমন্যতায় ভুগতেন যে তাঁরা মনে করতেন, স্বামীরা তাঁদের হয়তো গৃহপালিত জন্তুর চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন না। মহিলাদের মধ্যে সে সময়ে যাঁরা কিছুটা লেখা-পড়া শিখেছেন তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারেন যে কতটা পর্বতপ্রমাণ মূর্খতার মধ্যে তাঁরা এবং অন্যান্য মহিলারা জীবন ধারণ করছেন। তাঁরা দেখলেন স্বামীরা যে ধরনের সাংস্কৃতিক গুণবিশিষ্ট স্ত্রী চান, বাঙ্গালী মহিলারা মোটেই সেরকম নন। তদুপরি ব্রাহ্মমহিলারা হিন্দু মহিলাদের আচরণে যথেষ্ট কুসংস্কার লক্ষ্য করত বলে তাঁদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখতেন। 'শিক্ষার অভাবই মন ও আত্মার এমন বিবাদের জন্য দায়ী' (রমাসুন্দরী, এদেশে স্ত্রী শিক্ষা, বামাপ, শ্রাবণ ১২৭২, পৃঃ ৭৩), বঙ্গদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মহিলারা তাঁদের মধ্যে নিজেদের এমন একটি মাপকাঠি দিয়ে মূল্যায়ন করতে আরম্ভ করেন, যা ইতিপূর্বে কেবল পুরুষদের বেলাতেই প্রযোজ্য।

মহিলাদের জেগে ওঠার আহ্বানে কেহ কেহ পুরুষদেরই তাঁদের অবনতির জন্য দায়ী করেন।

"পুরুষগণ কেন আমাদিগকে এরূপ নিকৃষ্টাবস্থায় রাখিয়াছেন ? আমরা কি পরম পিতার সন্তান নই ? পুরুষেরা নানারূপ বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ইহকালেই পরমাত্মার রসস্বাদনে অনুপম সুখানুভব করিতে পারেন। আমরা কি উক্ত সুখের কণামাত্রও প্রাপ্ত হইব না ?—আর কতদিন আমরা এই শৃঙ্খলরূপ গৃহরুদ্ধা থাকিব।"[৫]

পুরুষরাই মহিলাদের অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখেন এবং শিক্ষা শেষ না হতেই বিয়ে দেবার জন্য বালিকাদের বিদ্যালয় থেকে নিয়ে আসেন। মহিলাদের অশিক্ষিত করে রাখার কারণ বিশ্লেষণ করে কৈলাসবাসিনীদেবী বলেন,—

"কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকল জাতীয় শাস্ত্রেই কথিত আছে যে পত্নী পতির অর্ধঅঙ্গস্বরূপ এবং সুখ ও দুঃখের সমভাগী, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সেই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অর্ধেক প্রতিপালন ও অপরার্ধেক পরিত্যাগ করিতেন অর্থাৎ দুঃখের অংশটি বিলক্ষণরূপে প্রদান করিতেন কিন্তু সুখের অংশটি দিতে অতিশয় কাতর হইতেন, নচেৎ স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিবেন কেন ? তাহারা বনিতাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব (sic) রাখবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুখময় মাধুর্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিংবা গৃহকর্মে উপেক্ষা করত কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে…।"[৬]

ক্রমশঃ মহিলারা এই সত্যে উপনীত হয় যে, মহিলারা শিক্ষিত ও উন্নত না হলে বঙ্গসমাজ কখনোই উন্নত হতে পারে না। অজ্ঞাতনামা এক মহিলা অকাট্য যুক্তি দেন যে, সমাজোন্নতির জন্যই মহিলাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। কৃষ্ণভাবিনী দাসী এর সপক্ষে বক্তব্য লেখেন (কৃষ্ণভাবিনী দাসী, 'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতা', ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৭, পৃঃ ২০২)। এককথায় বলা যায়, বেশ কিছু মহিলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন এবং মহিলাদের অনগ্রসরতার জন্য পুরুষদেরই দায়ী করেছিলেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাসী এবং কামিনী দত্ত মনে করেন যে, শিক্ষার অভাবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক দারুণ মনাকষ্টের উৎস হয়েছে। কামিনী দত্ত

বলেন, অশিক্ষিত স্ত্রী স্বামীর প্রতি তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নন। আর জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতে একমাত্র শিক্ষাই তেমন আধুনিকা স্ত্রী তৈরী করতে পারে যা আধুনিক স্বামীরা চান।

বাসন্তীকুমারী বসু বলেন, তরু দত্ত, রমাবাই, কামিনী সেন এবং মানকুমারী বসু যে বিখ্যাত হন সে কেবল স্ত্রী শিক্ষার প্রসার হেতু।

শরৎকুমারী চৌধুরানী ১৮৯১ সালে লেখেন যে, একক পরিবার অন্ততঃ এজন্য ভাল যে, তা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ককে উন্নততর হতে সহায়তা করে। বঙ্গদেশের বাইরে বাল্যকাল কাটে বলে এবং স্বামী উচ্চশিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তি বলে, তিনি নিজেই একক পরিবারের সুফল অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে জন্যই তিনি একক পরিবার সমর্থন করেন (দ্রষ্টব্য 'একাল ও একালের মেয়ে' 'ভারতী ও বালক'—আশ্বিন-কার্তিক, ১২৯২ পৃ: ৩১১-১৩, ৬১৪)।

মহিলাদের বাল্য বিবাহের সংস্কারে গৃহে বন্দী করে রাখার বিষয়ে রাসসুন্দরী দেবী, যিনি বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনী লেখেন, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। বারো বছর বয়সে বিবাহ হওয়ার অব্যাবহিত পরেই কেমন করে তিনি পর্দার আড়ালে বন্দী হন। শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়াদের সামনে তাঁর ঘোমটা দিয়ে থাকতে হতো এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলা বারণ ছিল। অনেক বছর পরে তিনি যখন কয়েকটি সন্তানের জননী এবং শাশুড়ীর মৃত্যুর ফলে সংসারের কর্ত্রী হন, তখনো তিনি তাঁর তিন ননদসহ অন্যান্য আত্মীয়াদের সামনে পর্দাপ্রথা পালন করে তাঁর মহিলাসুলভ গুণাবলী বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মজীবনী থেকে মনে হয়, তিন দশক পরে, ১৮৬০-এর দশকে বধূদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাত বছর বয়সে ১৮৫৯ সালে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর শাশুড়ী খুব স্নেহশীল এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই অনেক সময় তিনি জ্ঞানদাকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিতেন। কিন্তু জ্ঞানদা সারাক্ষণ নীরবে ঘোমটা দিয়ে থাকতেন, সে জন্যে তিনি যতটা খেতে পারতেন, তাঁর শাশুড়ী উৎসাহবশতঃ তাঁকে তার চেয়ে অনেক বেশী খাইয়ে দিতেন। ফলে, প্রথম সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বমি করার জন্যে পালাতেন (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্মৃতিকথা, 'পুরাতনী' পৃ: ২১)।

মোক্ষদায়িনী ১৮৭০ সালে বঙ্গমহিলা নামে একটি মহিলা পাক্ষিক প্রকাশ

করেন। ১৮৭০ ও ১৮৮০-এর দশকে যে মহিলারা ইউরোপ যান, তাঁদের মধ্যে সম্ভবত কৃষ্ণ-ভাবিনী দাসীই রক্ষণশীল ধারার সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলেন। তাঁর অবশ্য বাল্যকাল থেকেই অন্তঃপুরের বাইরের জগৎকে দেখার এবং ইউরোপ যাবার প্রবল বাসনা ছিল। ইংলণ্ড সফরের ও সেখানে বাস করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তার ভূমিকায় তিনি বলেন, 'পাঠিকাগণ। আমিও আপনাদের মতো একটি বাড়ীতে বদ্ধ ছিলাম, দেশের, পৃথিবীর কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক ছিলনা···।'

মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে সরলাদেবী তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, তাঁর আত্মীয়স্বজনরা তাঁর চাকুরী গ্রহণ করার প্রশ্নে দারুণ বিরোধিতা করেন। সরলা দাবী করেন যে, তাঁর পুরুষআত্মীয়দের মতো স্বাধীনভাবে উপার্জন করার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেই তিনি চাকুরী নেন, (সরলাদেবী, 'জীবনের ঝরাপাতা')।

মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে প্রথম দাবি করেন সম্ভবত কৈলাসবাসিনী দেবী। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত মহিলাদের দুর্দশা সংক্রান্ত তাঁর প্রথম গ্রন্থ এবং ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত মহিলাদের বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা পুরুষ ও নারীদের সমান করেই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু পুরুষরাই নারীদের বন্দী করে রেখেছেন। তিনি আরো দাবী করেন মহিলাদের দাসত্ব চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই পুরুষরা তাঁদের অশিক্ষিত করে রাখেন (কৈলাসবাসিনীদেবী, 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস···' ইত্যাদি, পৃঃ ১১-১২)।

ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্ভবত ১৮৬০ এবং ১৮৭০-এর দশকেই জোরদার হয়। এসময়কালে বেশ কয়েকজন মহিলা, তাঁরা প্রায় সবাই ব্রাহ্ম মহিলা, মহিলাদের নিম্নমর্যাদা ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। মেয়েদের বন্দী করে রাখার সম্ভাব্য কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে সারদাদেবী যুক্তি দেখান, পুরুষরা মহিলাদের অন্তঃপুরে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী করে রাখেন। কেননা পুরুষরা মনে করেন যে, অন্যথায় মহিলারা অসতী হবেন এবং পরিবারের ওপর কলঙ্ক আরোপ করবেন। তিনি এই ধারণাকে হাস্যকর বলে অভিহিত করেন এবং সমাজে মহিলাদের ন্যায্য স্থান দেওয়ার আহ্বান জানান।

বঙ্গদেশে মহিলা কবিগণের মধ্যে কামিনী রায় এক মর্যাদাপূর্ণ জায়গায়

অবস্থান করছেন। তিনি একথা মেনে নিতে পারেননি যে, মহিলাদের অবস্থা চিরদিনই অতো নীচু ছিল। তাঁর মতে, গার্গী ও লীলাবতীর ন্যায় অসংখ্য মহিলার জন্ম হবে যদি মহিলাদের জন্য অধিকার স্বীকৃত হয়। তিনি বলেন, মহিলাদের পরাধীনতা মোচন না করলে ভারতবর্ষও কখনো যথার্থভাবে জাগ্রত হতে পারে না (কামিনী রায় 'উদ্দীপনা', কবিতা, বামাপ, চৈত্র ১২৮৬)।

মহিলারা যে নিজেদের হীনাবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছেন তা এঁদের রচনা থেকে বোঝা যায়।

সে যুগে যেসব মহিলারা একক পরিবারে বাস করতেন, তাঁদের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই সম্ভবতঃ প্রথম আত্মজীবনী লেখেন। ১২৭৩-এ প্রকাশিত একটি লেখায় বামাবোধিনী পত্রিকায় বলা হয় যে, আধুনিকা স্ত্রী একান্নবর্তী পরিবারের পরিবর্তে স্বামীর কর্মস্থলে স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে একক পরিবারেই বাস করতে চান এবং সেখানে পরিবারের একচ্ছত্র কর্ত্রী হতে চান (নব্যবঙ্গ মহিলা, বামাপ, ফাল্গুন, ১২৭৩, পৃঃ ৩৫৩)। ১৮৬০ এবং ১৮৭০-এর দশকে ব্রাহ্ম মহিলারা একক পরিবারের মধ্যে বাস করার অভিজ্ঞতা লাভ করে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। শরৎকুমারী চৌধুরাণী একান্নবর্তী পরিবার প্রথাকে সেকেলে বলে অভিহিত করেন এবং আধুনিক কালের অনুপযোগী বলে মত পোষণ করেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে মহিলাদের মনোভাব কেমন করে পাল্টে যাচ্ছিলো, তা তখনকার দুজন মাত্র নাম করা লেখিকা—মানকুমারী বসু ও শরৎকুমারী চৌধুরাণীর লেখা থেকে বোঝা যায়।

"সেকালের মহিলারা স্বামীদিগকে ভক্তি স্নেহের সহিত ভয়ও করিতেন··· একালে স্বামী স্ত্রীকে কতকটা বন্ধু ভাবে দেখেন ··· একালের স্বামীকে ততদূর ভয় করেন না ···।"[৭]

বামাবোধিনী পত্রিকা ছিল ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় পূর্ণজাগরণের ফলে একদিকে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক হয়ে ওঠে, অন্যদিকে বাঙালীর অনেকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও সেক্যুলার মানবতার মূল্যমানে খানিকটা আধুনিক হয়ে ওঠে। সামান্য হলেও এ জাগরণ ছিল সেকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এর ফলেই বঙ্গদেশ মধ্যযুগীয়তা থেকে বেড়িয়ে আসে। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের

প্রতি মহিলাদের মনোভাব এবং সেই মনোভাবের ক্রম পরিবর্তন থেকে আধুনিকতার প্রতি মহিলাদের মনোভাব অনেকটা প্রতিফলিত হয়।

১৮৯৪ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মানকুমারী বসু বলেন, সহবাস সম্মতি আইন মহিলাদের মঙ্গলের জন্য প্রণীত। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী দাসী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী কামিনী সেন প্রমুখ লেখিকারা এ সম্বন্ধে নিরব ছিলেন।

বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হওয়ার পর কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা গ্রন্থে কৌলিন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পরিবারে মহিলাদের মর্যাদা এবং স্বামী ও শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্ক বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। সম্ভবত নিজে বিধবা না হওয়ার দরুণই তিনি বিধবা বিবাহ সম্পর্কেও নির্দ্বিধায় মত দেন। তিনি বৈধব্যের কষ্টকে অসহনীয় বলে গণ্য করেন। সারদাদেবী এর সপক্ষে যুক্তি দেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষরা যদি বিয়ে করতে পারেন এবং তা যদি পাপের কাজ বলে বিবেচিত না হয়, তা হলে বিধবা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে দোষ হবে কেন? (সারদাদেবী, বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭৩, পৃঃ ৪০২)।

কৈলাসবাসিনী দেবী ছাড়াও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কৃষ্ণ-ভাবিনী দাসী, সারদাদেবী, মানকুমারী বসু প্রমুখ লেখিকারা বাল্যবিবাহ প্রথার নিন্দা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অন্ততঃ কিছু সংখ্যক মহিলা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হন। তাঁরা তাই মহিলাদের উন্নতির জন্য ক্ষুদ্রাকারে হলেও আন্দোলন শুরু করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণ-ভাবিনী দাসী, সরলাদেবী প্রমুখের মধ্যে অধিকতর সচেতনতা প্রকাশ পায়। এঁরা মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। এ ধরনের সচেতনতা থেকেই বঙ্গদেশে ফেমিনিজম-এর সূচনা হয়।

উনবিংশ শতকের লেখিকাদের রচনার মধ্যে যে ভাব স্পষ্টতঃ হয়েছে তার কিছু পরিচিত উপস্থাপিত হোলো। এ থেকে যদিও বিষয়টা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হবে না অর্থাৎ বিষয়ের গভীরে যাবার প্রয়োজন আছে। তবে আলোচনাকে বিস্তৃত করবার আগে তদানীন্তন কয়েকজন লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় রাখা যেতে পারে। মোটামুটি যাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপিত হবে তাঁরা হলেন

যথাক্রমে (১) রাসসুন্দরী দেবী, (২) সারদাসুন্দরী দেবী, (৩) কৈলাসবাসিনী দেবী (গুপ্তা), (৪) নিস্তারিণী দেবী, (৫) কৈলাসবাসিনী দেবী (মিত্র), (৬) সৌদামিনী দেবী, (৭) মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, (৮) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, (৯) প্রফুল্লময়ী দেবী, (১০) স্বর্ণকুমারী দেবী, (১১) প্রসন্নময়ী দেবী, (১২) সুদক্ষিণা দেবী, (১৩) শরৎকুমারী দেবী, (১৪) ইন্দিরা দেবী, (১৫) নটী বিনোদিনী, (১৬) মানকুমারী বসু, (১৭) কৃষ্ণভাবিনী দাসী, (১৮) লীলাবতী মিত্র, (১৯) কামিনী রায়, (২০) কমলা বসু, (২১) হেমলতা সরকার, (২২) মৃণালিনী দেবী, (২৩) সরলা দেবী চৌধুরাণী, (২৪) ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০):

পাবনা জেলার পোতাজিয়াগ্রামে ১৮০৯ সালে রাসসুন্দরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পদ্মলোচন রায়। বারো বছর বয়সে ফরিদপুর জেলার রামদিয়া গ্রামের ভূস্বামী সীতানাথ সরকার-এর (শিকদার) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

সেকালে মেয়েদের লেখাপড়া শিখবার সুযোগ ছিল না। রাসসুন্দরী দেবী নিজের চেষ্টায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পড়তে এবং লিখতে শেখেন। বিপিন বিহারী, কিশোরীলাল প্রমুখ সাতজন সন্তানের জননী তিনি।

পরম ভক্তিমতী রাসসুন্দরীদেবীর দীর্ঘ জীবন শোক তাপের মধ্যে অতিবাহিত হয়। লেখাপড়া যদিও বাড়ীর মধ্যে থেকেই তাঁকে করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি এর চর্চা করতেন রীতিমত। তাঁর লেখা 'আমার জীবন', বাঙালী নারীর লেখা প্রথম আত্মজীবনী। আমার জীবন গ্রন্থে তাঁর স্বরচিত কবিতা ও সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। পৌত্রী সরলাবালা সরকারের স্মৃতিকথায় তাঁর শেষজীবনের কথা জানা যায়। ১৯০০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সারদা সুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭):

মাতুলালয় ত্রিবেনীতে ১৮১৯ সালে সারদাসুন্দরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিত্রালয় ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার গোরীভা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গৌরহরি দাস। ন'বছর বয়সে রামকমল সেনের মধ্যম পুত্র প্যারীচরণের সঙ্গে

তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর উৎসাহে স্বল্প লেখাপড়া শিখেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ সাতটি সন্তানের জননী তিনি। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। সেইকারণে দীর্ঘ জীবন তাঁকে শোকতাপের মধ্যেই অতিবাহিত করতে হয়। তাঁর রচনা 'আত্মকথা' তিনি স্বয়ং লেখেন নি। তিনি মুখে মুখে বলেছেন, অনুলিখন করেছেন যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর। রচনাটি প্রথমে 'মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালে সারদাসুন্দরী দেবীর মৃত্যু হয়।

কৈলাস বাসিনী দেবী (১৮৩৭-) ঃ

আনুমানিক ১৮৩৭ সালে তাঁর জন্ম হয়। তবে তাঁর সম্বন্ধে স্বল্পই জানা যায়। তাঁর স্বামী ছিলের দুর্গাচরণ গুপ্ত। স্বামীর কাছে লেখাপড়া শিখে তিনি তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনটি হোলো—

(১) হিন্দু ফিমেলস্ বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা।

(২) হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি।

(৩) বিশ্বশোভা।

প্রথম গ্রন্থটিতে তাঁর নিজের সামান্য কিছু কথা আছে। তাঁর স্বামী গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন, কৈলাসবাসিনী গৃহকর্ম ও পুত্রকন্যাদের লালন-পালন নিজেই করতেন।

নিস্তারিণী দেবী (১৮৩৩-১৯১৬) ঃ

আনুমানিক ১৮৩৩ সালে বর্ধমানের খন্যান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঠগী দমনকারী শ্রীম্যান সাহেবের অন্যতম সহকারী কর্মচারী ছিলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেবীর ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। নিস্তারিণীর বিবাহ হয়েছিল কৃষ্ণনগরের খানাকুল নিবাসী বহুপত্নীক কুলীন ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর সমস্ত জীবন চরম দারিদ্রের মধ্যে পিত্রালয়েই অতিবাহিত হয়। শেষ জীবনে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্র মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আশ্রয় পান। নিস্তারিণী দেবী লেখাপড়া জানতেন না। তিনি মুখে মুখে তাঁর জীবনকথা বলে যান। অনুলিখনের কাজ করেন মন্মথধন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'সেকালের কথা' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ সালে নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়।

কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮২৯—১৮৯৫) :

আনুমানিক ১৮২৯ সালের জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোরাচাঁদ ঘোষ। তাঁর পিত্রালয় ছিল রাজপুর। সম্ভবত এগারো বছর বয়সে উনবিংশ শতাব্দীর দেশনায়ক, বাগ্মী লেখক ও সমাজ সংস্কার কিশোরীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে কৈলাস বাসিনী দেবীর বিবাহ হয়। 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। বিবাহের পর কিশোরীচাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁর স্ত্রীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। কৈলাসবাসিনী দেবী স্বল্প শিক্ষিতা নারী হলেও বিদ্বান স্বামীর সাহচর্যে উন্নত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারিণী ছিলেন।

একমাত্র কন্যা কুমুদিনীকে নিয়ে কৈলাসবাসিনী দেবী স্বামীর সঙ্গে বহুস্থান ভ্রমণ করেন। তিনি ডাইরী লিখতেন। তাঁর রচিত 'আত্মকথা' পুস্তকটি ডাইরীর মতো লেখা। এটি তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'জনৈক গৃহবধূর ডায়েরী' শিরোনামে। এছাড়া আর বিশেষ কোনো লেখার প্রকাশ হবার কথা জানা যায় না। ১৮৯৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২৩) :

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৪৭ সালে সৌদামিনী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। শৈশবেই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌদামিনী দেবীর বিবাহ হয়। পিত্রালয়েই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন।

হিন্দু ফিমেল স্কুলে (পরবর্তী নাম বেথুন স্কুল) তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। তদানীন্তন সময়ে মেয়েদের অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল, স্কুলে যাবার সামাজিক অধিকার তাদের ছিল না। কারণ নারীশিক্ষার কথাটির প্রচলন ছিল খুবই কম মাত্রায়। তাই যখন প্রথম ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, মেয়েদের পর্দা থেকে বাইরে আনবার প্রচেষ্টা এই ঠাকুরবাড়ী থেকেই শুরু হয়। অবশ্য ব্রহ্মসমাজের অন্যান্য কয়েকটি পরিবারের মেয়েরা বাইরে বেড়িয়ে আসে মূলতঃ তাদের পরিবারের কর্তার ইচ্ছানুসারেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা হিসাবেও তাই শুধুমাত্র নজীর সৃষ্টি করবার জন্যই সৌদামিনী দেবীকে ফিমেল স্কুলে ভর্তি করা হয়। তবে গৃহশিক্ষার মাধ্যমেই তাঁর অক্ষরজ্ঞান।

তিনটি পুত্রকন্যার জননী সৌদামিনী দেবী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির প্রকৃত গৃহিণী। তাঁর পুত্র সত্যপ্রসাদ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন। সৌদামিনী দেবী আত্মকথা লেখেননি। কিন্তু তার লেখা 'পিতৃস্মৃতি-তে তাঁর ও সেকালের বহুসংবাদ পাওয়া যায়। রচনাটি সর্বপ্রথমে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে সৌদামিনী দেবী পরলোকগমন করেন।

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯৩১) ঃ

কলকাতার খিদিরপুরে ১৮৪৮ সালে মোক্ষদায়িনী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বৌবাজারের ধনকুবের বিশ্বনাথ মতিলালের দৌহিত্র শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠ কন্যা বিনোদিনী মাত্র ন' বছর বয়সে শশুর বাড়ি যাবার আগেই বিধবা হলে তিনি ও তাঁর স্বামী স্থির করেন বিনোদিনীর পুনর্বিবাহ দেবেন। তাই কলকাতায় বাধা পাবার আশঙ্কায় তাঁরা পুত্রকন্যাদের নিয়ে ভাগলপুরে চলে যান। সেখানেই তাঁরা একজন বিপত্নীক ব্রাহ্মযুবকের সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ দেন।

মোক্ষদায়িনী দেবী সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তিনি সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে বেশীর ভাগ সময়ই অতিবাহিত করতেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বনপ্রসূন' উচ্চপ্রশংসা লাভে সক্ষম হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা 'বাঙালীর মেয়ে'র উত্তরে তিনি প্যারাডি রচনা করেন 'বাঙ্গালীবাবু'। কবিতাটি সেকালের পাঠকের প্রশংসা লাভ করেছিল। এছাড়া তিনি একটি ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস ও দৌহিত্র কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনী 'কল্যাণপ্রদীপ' লেখেন।

'কল্যাণপ্রদীপ' গ্রন্থটি মোক্ষদায়িনী দেবীর শেষ বয়সের রচনা। কল্যাণ মোক্ষদায়িনীর জ্যেষ্ঠাকন্যা বিনোদিনীর পুত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অকালে প্রাণ হারান। বৃদ্ধা মাতামহী মোক্ষদায়িনী দেবী এই পুস্তকে কল্যাণের জীবন কথার মধ্যদিয়ে নিজের জীবনের কথাও লিখেছেন।

১৯৩০ সালে মোক্ষদায়িনী দেবী পরলোক গমন করেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১) ঃ

যশোহর জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে ১৮৫০ সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন অভয়াচরণ রায়।

মাত্র আট বছর বয়সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণে বাংলার অন্যতম নেত্রী হিসাবে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নাম উল্লেখ্যের দাবী রাখে। মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদে আধুনিকতা প্রবেশের প্রচেষ্টা তিনিই করেন এবং এ কার্য সম্পন্নও করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর এ ধরনের সমাজ সংস্কারক কার্যের মূলে ছিল তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতা এবং উৎসাহ।

প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান অফিসারের স্ত্রী হিসাবে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, তাঁর স্বামীর সঙ্গে বহুস্থান ভ্রমণ করেন। এমনকি ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত গিয়েছিলেন। অভিনয়, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি চর্চার ক্ষেত্রে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সর্বদাই স্বামীর উৎসাহ পান। তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এবং কন্যা ইন্দিরাদেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।

ছোটদের জন্য 'বালক' পত্রিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রকাশ করেন। তিনি নিজে সুসাহিত্যিক ছিলেন। ছোটদের জন্য দুটি নাটিকা 'সাত ভাই চম্পা' এবং 'টাক ডুমাডুম' তাঁর রচিত। এছাড়া রূপ পলাতকের কাহিনী 'আশ্চর্য-পলায়ন' 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এগুলি হোলো 'ইংরাজ নিন্দা ও দেশানুরাগ', 'স্ত্রী শিক্ষা', 'কিণ্ডারগার্ডেন' ও দীর্ঘ মারাঠী রচনায় অনুবাদ 'ভাউ সাহেবের বখর'।

জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর স্মৃতিকথা 'পুরাতনী' বৃদ্ধ বয়সে মুখে মুখে বলা। কন্যা ইন্দিরাদেবী অনুলিখনের কাজ করেন। পরে ইন্দিরাদেবীই জননীর স্মৃতিকথা এবং জননীকে লেখা পিতার পত্রগুলি একত্রে গ্রন্থকারে প্রকাশ করেন। ১৯৪১ সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মৃত্যু হয়।

প্রফুল্লময়ী দেবী (১৮৫২-১৯৪০) ঃ

১৮৫২ সালে হাওড়া জেলায় প্রফুল্লময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হরদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু

ছিলেন। এই কারণেই মহর্ষি পরিবারে প্রফুল্লময়ী দেবীর বিবাহ হয় মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে।

প্রফুল্লময়ী দেবীর জীবন ছিল খুবই দুঃখময়। স্বামী বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবাহের কয়েক বছর পরে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন। এছাড়া একমাত্র পুত্র সুলেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও অকাল মৃত্যু ঘটে। শোকে-তাপে জর্জরিতা প্রফুল্লময়ীদেবীর মৃত্যু হয় ১৯৪০ সালে।

প্রফুল্লময়ী দেবী তাঁর ক্ষুদ্র আত্মজীবনী 'আমাদের কথা' মুখে মুখে বলেন। অনুলেখনের কাজ করেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা রমা দেবী। রচনাটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ঃ

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৫৫ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা। বারো বছর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

পারিবারিক পরিবেশ ও স্বামীর উৎসাহে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যচর্চা চলতে থাকে। তাঁকে প্রথম সার্থক মহিলা ঔপন্যাসিক বলা চলে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপ নির্বাণ' (১৮৭৬)। অন্যান্য উপন্যাস যথাক্রমে 'স্নেহলতা' 'কাহাকে', 'মিবাররাজ', 'বিদ্রোহ', 'হুগলীর ইমামবাড়া', 'ফুলেরমালা', 'ছিন্নমুকুল', 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী' এবং 'মিলনরাত্রি'। উপন্যাস ছাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবী বহু ছোটগল্প, কবিতা, গাথা, গান প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, নাটক প্রহসন এবং স্মৃতিকথা রচনা করেন। 'সেকালের কথা' প্রবন্ধ গ্রন্থ।

তাঁর গ্রন্থের অনুবাদও হয়েছে। তিনি স্বয়ং 'কাহাকে' উপন্যাসটির অনুবাদ করেন 'এ্যান আনফিনিষ্টসঙ' নামে। এছাড়া তাঁর ছোটগল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেন 'শট ষ্টোরিজ' নামে।

স্বর্ণকুমারী দেবী দীর্ঘদিন 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার তাঁর উপর ছিল। পত্রিকার চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক বিষয়ক প্রবন্ধ 'পৃথিবী' যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে। ছোটদের জন্য তিনি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

দুঃস্থ আশ্রয়হীন মেয়েরা লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখিসমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে যোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম মহিলা হিসাবে তিনি 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' পান। ১৯৩২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৪) :

পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে ১৮৫৭ সালে প্রসন্নময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন হরিপুরের ভূস্বামী দুর্গাদাস চৌধুরী। বংশগত প্রথানুসারে মাত্র দশ বছর বয়সে প্রসন্নময়ীর পাবনার গুনাইগাছা গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণকুমার বাগচীর সঙ্গে বিবাহ হয়। কিন্তু বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্বামী উন্মাদ রোগগ্রস্থ হন। অল্পবয়সেই বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার জন্য প্রসন্নময়ীদেবী একমাত্র কন্যা প্রিয়ম্বদাকে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে আসেন এবং এখানেই লেখাপড়ায় শিখবার কাজে মগ্ন হয়ে যান।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আধ আধ ভাষিণী' ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর যথাক্রমে 'আর্যাবর্ত', 'অশোকা', 'বনলতা', 'নীহারিকা', 'তারাচরিত', যুবরাজ প্রিন্স ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন', প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর আত্মজীবনী 'পূর্বকথা' 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে প্রসন্নময়ী দেবী পরলোকগমন করেন।

সুদক্ষিণা দেবী (১৮৫৯-১৯৩৪) :

১৮৫৯ সালে ২৫ ডিসেম্বর (৯-ই পৌষ) ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের সোহাগদল নামক গ্রামে সুদক্ষিণা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাতা নিত্যকালী গঙ্গোপাধ্যায়।

সুদক্ষিণা দেবী তাঁর জীবনীস্মৃতিতে লিখেছেন, "সোহাগদল গ্রামে সেইসময় ছেলেদের অথবা মেয়েদের শিক্ষাপ্রদানের কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। আমার মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, তদ্বন্ধু হরিমোহন দত্ত মহাশয় এবং আরও দুই-একজন গ্রামের ভদ্রলোক দু-চারিটি বালিকা সংগ্রহ করিয়া একটি পাঠশালা খুলিলেন। সর্বপ্রথমে আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণে দরমাপাতিয়া আমরা কয়েকটি মেয়ে বসিয়া প্রভাতে কলাপাতায় অ, আ, ক, খ, লিখিতাম। তৎপরে

আমাদের বহির্বাটীতে একটি আটচালা গৃহ প্রস্তুত হইল। এই স্কুলে প্রভাতে মেয়েদের ক্লাস হইত এবং দশটার পরে বালকদিগের স্কুল হইত। কিন্তু দেশের কুসংস্কার যে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা দেশকে উচ্ছন্নে যাইতে দিতে পারে না। কাজেই মেয়েদের স্কুলে পড়া লইয়া গ্রামের হুলস্থুল বাঁধিয়া গেল। কেহ বলিতে লাগিলেন, "মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবে। কেহ বা বলিতে লাগিলেন, "মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া কি চাকরী করিবে?" গোলযোগ গুরুতর হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ছোট স্কুল ঘরে তাহার কোন সাড়া আসিয়া পৌছিল না। (পৃঃ ১০—১১, 'জীবনীস্মৃতি')

সুদক্ষিণা দেবীর অল্পবয়সেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। কৌলীণ্য প্রথার অত্যাচারে তাঁর মা পুত্রকন্যা সকলকে নিয়ে সোহাগদল ত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজে অংশ গ্রহণ করলেন এবং এখানেই দুই কন্যার বিবাহ দেন। ১৮৭৬ সালে ১-জুন সুদক্ষিণা দেবীর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেনের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৮৭৮ সালে সরযুবালার জন্ম হয়। ১৮৮৩ সালে আগষ্ট মাসে স্বামী বিলেত থেকে স্বদেশে ফিরলে তিনি স্বামীর কর্মস্থল কটক যাত্রা করেন। স্কুলের পাঠ বেশী দিন নেওয়া সম্ভব না হলেও সুদক্ষিণা দেবী গৃহ কাজের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যান। কিছু কবিতা, গান, রচনা করেছেন তিনি। কটকে থাকাকালীন নারী উৎসবের তিনিই উদ্যোক্তা ছিলেন। এ উৎসবে তিনি স্বরচিত গান পরিবেশন করতেন। ১৯১১ সালে ৫-নভেম্বর স্বামীর মৃত্যু হয়।

তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনীস্মৃতি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে সুদক্ষিণা দেবী পরলোকগমন করেন।

শরৎকুমারী দেবী (১৮৬২-১৯৪১):

কলকাতার বাগবাজারে ১৮৬২ সালে শরৎকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কালীনাথ বসু। শিবচন্দ্রদেবের পুত্র সত্যপ্রিয়র সঙ্গে পনেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পদিন পরেই ব্রহ্মানন্দ-কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতিদেবীর বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে মত বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং দুটি' সমাজে পরিণত হয়।

শরৎকুমারী দেবীর পিতা কেশবচন্দ্র সেনের সমাজভুক্ত হন, আর স্বামী ও শশুর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। পিতার ও স্বামীর মতপার্থক্য হওয়ায়

শরৎকুমারী দেবী মর্মাহত হন। তাঁর তিন পুত্রকন্যা শেষ জীবনে সকলের অনুরোধে স্মৃতিকথামূলক আত্মকাহিনী 'আমার সংসার' রচনা করেন। গ্রন্থটি খুববেশী প্রচারিত হয়নি। ১৯৪১ সালে শরৎকুমারী দেবী পরলোকগমন করেন।

ইন্দিরাদেবী (১৮৬৩-১৯৩৯) :

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬৩ সালে ইন্দিরাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ ঠাকুরের পৌত্র শ্রীনাথ ঠাকুরের কন্যা। ছয়-সাত বৎসর বয়সে বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগ শেষ করে বাড়ীতেই ইন্দিরাদেবী গৃহশিক্ষক-এর কাছে পড়তেন। ইন্দিরাদেবীর শৈশব কাটে আড়িয়াদহ কামারহাটিতে। পৈত্রিক সম্পত্তির গোলযোগের জন্যই তাঁর পিতা আহিরিটোলায় একটি বাড়ী ভাড়া করেন।

গৃহশিক্ষক পণ্ডিত মহাশয়ের কাছেই তিনি লেখাপড়া শেখেন এবং এঁর সাহায্যেই তাঁর কবিতা লেখা হাতেখড়ি হয়। এব্যাপারে তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে উৎসাহও পান। অবশ্য কবিতা লিখবার ব্যাপারে পিতার কাছেও প্রভূত সাহায্য ও উদ্দিপনা পান। এ প্রসঙ্গে তিনি আমার খাতা পুস্তকে লিখেছেন—

ঐ সময়ে আমি আমার পিতার কাছে কাব্য সম্বন্ধে আমার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতাম। এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাবা মহাশয় কাব্য আলোচনা করিতেন, ·· (পৃঃ ৩৭—৩৮)

তেরো বৎসর বয়সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরম সুহৃদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে একটি কন্যা সন্তান হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতৃবিয়োগের পঞ্চমদিনে তিনি একটি কবিতা লেখেন—

পাঁচটি দিবস গত হইল জানি

... ... (আমার খাতা, পৃঃ ৭৫)

১৩১৯ বঙ্গাব্দে তিনি আত্মজীবনী 'আমার খাতা' প্রকাশ করেন। পুস্তকটি প্রকৃতপক্ষে শৈশবস্মৃতি। তাঁর জীবনীমূলক গ্রন্থ 'প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত ও প্রবন্ধ কুসুম'। আমার খাতা পুস্তকটিতে কয়েকটি বিষয়ের উপর রচনা স্থান

পেয়েছে—আমার বাল্যজীবন, আমার স্বপ্নকাহিনী, দয়া, ঈশ্বরের স্বত্বা, জ্ঞান ও প্রেমের মিলন, ধর্ম, স্বার্থপরতা, ভ্রমণ-কাহিনী, গৃহিণীপনা, ফুল, পূর্ণিমার ইন্দ্র ধ্রুবতারা। এছাড়া আছে বিভিন্ন রাগের উপর ভিত্তি করে ষোলোটি গীত। ঈশ্বরের স্বত্বা প্রবন্ধটি তিনি জোড়াসাঁকোস্থ মহিলা সভায় পাঠ করেন। ১৯৩১ সালে ইন্দিরা দেবী পরলোক গমন করেন।

নটী বিনোদিনী (১৮৬৩-১৯৪১) ঃ

১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিনোদিনী ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে অভিনয় শুরু করেন। অভিনেত্রী জীবনে পঞ্চাশটিরও বেশী নাটকে ষাটটিরও বেশী চরিত্রে অভিনয় করেছেন। গ্রেট্ ন্যাশানাল, বেঙ্গল, ন্যাশান্যাল, ষ্টার প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে এক যুগেরও বেশী সময়কাল অভিনয় করেন। বেশ কিছু নাটক যেমন—শত্রুসংহার, নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, হেমলতা, সধবার একাদশী, মুস্তকী সাহেবের পাকা তামাশা, প্রকৃতবন্ধু, সরোজিনী, আদর্শসতী, চোরের উপর বাটপাড়ি, মেঘনাদবধ, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, পলাশীর যুদ্ধ, দোললীলা, বিষবৃক্ষ, কামিনীকুঞ্জ ও হাম্বির, মায়াতরু, মাধবীকঙ্কন, মোহিনীপ্রতিমা, আলাদীন, আনন্দরহো, রাবণবধ, সীতার বনবাস, আগমনী, রামের বনবাস, সীতাহরণ, পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, চৈতন্যলীলা, শ্রীবৎস চিন্তা, প্রহ্লাদচরিত্র, নিমাই সন্ন্যাস, প্রভাসযজ্ঞ, বুদ্ধদেব চরিত্র, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতিতে তিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। নাট্যকার গিরিশঘোষের কাছেই বিনোদিনী অভিনয় শিক্ষা করেন।

বিনোদিনী সুলেখিকা ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা ও গান উল্লেখযোগ্য। কাব্যগ্রন্থ 'বাসনা' এবং কাব্য কাহিনী 'কনক ও নলিনী' ছাড়াও বিনোদিনী লিখেছিলেন আত্মজীবনী 'আমার জীবন'। এছাড়াও লিখতে শুরু করেছিলেন 'আমার অভিনেত্রী জীবন ও অভিনেত্রীর আত্মকথা,' কিন্তু শেষ হয়নি। তিনি তার একমাত্র কন্যা শকুন্তলাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯৪১ সালে বিনোদিনী পরলোকগমন করেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীষ লাভ করে বাকী দিনগুলি অধ্যাত্মসাধনায় কাটান।

মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) ঃ

১২৭১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৬৩ সালে মানকুমারী বসু যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী 'প্রিয়প্রসঙ্গ' (গদ্য-পদ্য, ১৮৮৪), 'বনবাসিনী' (১৮৮৮), 'বাঙ্গালী রমণীগণের গৃহকর্ম' (সন্দর্ভ, ১৮৯০), 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি' (কাব্য-১৮৯৬), 'কনকাঞ্জলি' (কাব্য, ১৮৯৬), 'বীরকুমার বধ' (কাব্য, ১৯০৪), 'শুভসাধনা' (গদ্য-পদ্য, ১৯১১), 'বিভূতি' (কাব্য, ১৯২৭), 'পুরাতন ছবি' (আখ্যায়িকা, ১৯৩৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯ সালে তাঁকেই সর্বপ্রথম 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' এবং ১৯৪১ সালে জগৎতারিণী স্বর্ণপদক দেয়। ১৯৪৩ সালে পরলোকগমন করেন।

কৃষ্ণভাবিনী দাসী (১৮৬৪-১৯৩৯) ঃ

মুর্শিদাবাদের চোয়াগ্রামে ১৮৬৪ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাসী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী। মাত্র ন'বছর বয়সে বৌবাজারের প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি স্বামীর সঙ্গে ইংলণ্ডে যান এবং সেখানেই স্বামীর সহযোগিতায় লেখাপড়া শেখেন।

কৃষ্ণভাবিনী বঙ্গমহিলা ছদ্মনামে ইংলণ্ডে 'বঙ্গমহিলা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৮৮৫ সালে। বিদেশে আট বছর কাটাবার পর তিনি স্বামীর সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হলে তিনি অবরোধবাসিনী নারীদের শিক্ষাদেবার কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর চেষ্টাতেই ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের তিনটি শাখা খোলা সম্ভব হয়। কলকাতা মণ্ডলের পরিচালিকা তিনিই ছিলেন।

কৃষ্ণভাবিনী দাসীকে সেই সময় একটি বিধবা আশ্রম পরিচালনার ভার নিতে হয়। স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ না করলেও এই বিদুষী মহিলা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হন। বহু পত্র পত্রিকায় নারীশিক্ষা সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। শেষ জীবনে তিনি কবিতায় আত্মজীবনী 'জীবনের দৃশ্যমালা' গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪-১৯২৪) ঃ

১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন লীলাবতী দেবী। পিতা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। চব্বিশ পরগণা জেলার বোড়ালে তাঁদের আদিনিবাস ছিল। রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন। লীলাবতী দেবী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য কৃষ্ণকুমার মিত্রকে বিবাহ করেন সতেরো বছর বয়সে। এই বিবাহে রাজনারায়ণ বসু প্রথমে সম্মত হন নি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি মেনে নেন। লীলাবতী দেবীর তিন পুত্র-কন্যা। তিনি ছিলেন সমাজ-সংস্কারের কাজে সদা নিযুক্ত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্য বিধবাদের লীলাবতীর কাছে প্রেরণ করলে তিনি তাঁদের সুপাত্রস্থ করবার কার্য সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন। বহু অসহায় নারীকে তিনি আশ্রয় দান করেন।

ব্রাহ্মধর্মে ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারাভিযানে তিনি পদব্রজে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আশৈশব শিক্ষানুরাগিণী। লীলাবতী দেবী প্রতিদিন দিনপঞ্জী লিখতেন। 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় তাঁর দিনপঞ্জী প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর 'জীবনকথা' গ্রন্থটি এই দিনপঞ্জীর সাহায্যে সম্পূর্ণ করে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশ করা হয়। ১৯২৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) ঃ

১৮৬৪ সালের ১২-অক্টোবর জন্ম। আটবছর বয়সে তিনি প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৮৮৯ সালে তাঁর প্রণীত 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থতালিকা 'নির্মাল্য' (কাব্য, ১৮৯১), পৌরাণিকী (কাব্য, ১৮৯৭), 'গুঞ্জন' (শিশুরাজ্যের কবিতা, ১৯০৫), 'ধর্মপুত্র' (গল্প, ১৯০৭) 'অশোকস্মৃতি' (জীবনী, ১৯১৩), 'শ্রাদ্ধিকী' (শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত কবিতায় সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, ১৯১৩), 'মাল্য ও নির্মাল্য' (কাব্য, ১৯১৩), 'অশোক-সঙ্গীত' (সনেট গুচ্ছ, ১৯১৩), 'অম্বা' (নাট্যকাব্য, ১৯১৫), 'সিতিমা' (গদ্য নাটিকা, ১৯১৬). সাম থট্‌স অন দি এ্যডুকেশন অব্ আওয়ার ওম্যান (১৯১৮), 'বালিকা শিক্ষার আদর্শ—অতীত ও বর্তমান' (নিবন্ধ, ১৯১৮), 'ঠাকুরমার চিঠি' (কবিতা, ১৯২৪), 'দীপ ও ধূপ' (কাব্য, ১৯২৯), 'জীবনপথে' (সনেট গুচ্ছ, ১৯৩১)।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা—'নব্যভারত' পত্রিকায় সুপ্তশক্তির জাগরণ (প্রবন্ধ, ১৩৩২), 'প্রবাসী' পত্রিকায় (কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির, অভিভাষণ, ১৩৩৭), 'বিদায়ের অর্ঘ্য' (১৩৩৭), 'শ্রীহট্টে প্রদত্ত ভাষণ' (১৩৩৮), 'সাহিত্য ও সুনীতি' (প্রবন্ধ, ১৩৩৯), 'স্বরাষ্ট্র স্বাধীন' (১৩৪০), 'স্থবিরা, নবীনকর্মী' (১৩৪০), 'রবীন্দ্র পরিচয়' (১৩৪০), 'বুলবুলের প্রতি' (১৩৪১)।

'বিচিত্রা' পত্রিকায় স্বর্গীয়া রাসসুন্দরী দেবী (জীবনী, ১৩৩৭), 'আত্মধারা' (১৩৩৭), 'আজিকার মত' (১৩৩৭), 'অনির্বাচন', 'আমার ভাষণ' (১৩৩৭)। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় 'ডাঃ কুমারী যামিনী সেন' (জীবনী, ১৩৩৯), 'সেবিকা' (১৩৪০), 'বৌ কথা কও' (১৩৩৭)।

১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী' সুবর্ণপদক পান। ১৯৩০ সালে ১৯-শ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৩২-৩৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ তাঁকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। ১৯৩৩ সালে পরলোকগমন করেন।

কমলা বসু (১৮৬৬-১৯৩৯) ঃ

কলকাতায় ১৮৬৬ সালে কমলা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন সুলেখক রমেশচন্দ্র দত্ত। ষোলবছর বয়সে প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক গুরুমহিষাণী লৌহ খনির আবিষ্কারক প্রমথনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কমলাদেবী ন'টি পুত্র কন্যার জননী। জ্যেষ্ঠকন্যা সুষমা সেন সমাজসেবিকা। কনিষ্ঠ পুত্র মধু বসু চিত্র-পরিচালক। কমলাদেবীর আত্মকথা তাঁর মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

হেমলতা সরকার (১৮৬৮-১৯৪৩) ঃ

চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রামে ১৮৬৮ সালে হেমলতা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, জননী প্রসন্নময়ী দেবী।

হেমলতা দেবী বেথুন কলেজে পাঠ শেষ করেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি চিকিৎসক বিপিনবিহারী সরকারকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে তাঁর পিতার সম্মতি ছিল। আশৈশব শিক্ষানুরাগিণী হেমলতা স্বামীর সঙ্গে নেপালে গমন

করেন, সেখান থেকে দার্জিলিং-এ মেয়েদের জন্ম মহারাণী গার্লস স্কুল স্থাপন করেন।

বৈজ্ঞানিক বিজলী বিহারী সরকার তাঁর পুত্র। কলকাতা পৌরসভার প্রথম মহিলা সদস্যা হন হেমলতা দেবী। তিনি দার্জিলিং-এর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম মহিলা কমিশনার হন। তিনি ছিলেন সুলেখিকা। পিতার জীবন চরিত 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত' রচনা করেন। এই গ্রন্থেই তাঁর শৈশবের কথা জানা যায়। এছাড়াও তিনি 'নেপালে বঙ্গনারী', 'তিব্বতে তিন বৎসর', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', গ্রন্থরচনা করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

মৃণালিনী দেবী (১৮৭১-) ঃ

আনুমানিক ১৮৭১ সালে কলকাতায় মৃণালিনী দেবীর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পিতার কর্মসূত্রে তাঁদের মথুরায় বাস করতে হোতো বলে মৃণালিনী দেবীর শৈশব মথুরাতেই অতিবাহিত হয়।

বারো বছর বয়সে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মৃণালিনী দেবীর কথা বিশেষ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তাঁর আত্মজীবনী 'পৌরানিকী' ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দুই কিস্তিতে বঙ্গাব্দ ১৩৩৪-এর চৈত্র এবং ১৩৩৫-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। ধারাবাহিক ভাবে রচনাটি আর কেন প্রকাশিত হয়নি তার কারণ জানা যায় নি।

সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) ঃ

বাঙলা সাহিত্যে বঙ্গমহিলাদের দান অপরিসীম। সাহিত্যসেবীরূপে সরলাদেবী চৌধুরাণীর নাম হয়তো অনেকেরই তেমন জানা নেই, এর একটি প্রধান কারণ, বিবিধ ও বিচিত্র বিষয়ের উপর তদ্‌রচিত লেখাগুলি পুস্তকাকারে খুবই কম প্রকাশিত হয়েছে।

কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ১৮৭২ সালে ৯ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল ; মা স্বর্ণকুমারী দেবী। সরলাদেবী বেথুন স্কুল থেকে তেরো বছর বয়সে এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বেথুন কলেজ থেকে ১৮৮৮ সালে এফ. এ. এবং ১৮৯০ সালে ইংরাজীতে অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'পদ্মাবতী সুবর্ণপদক'

পান। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। ১৮৯৫ সালে মহীশূরে মহারাণী গার্লস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই চাকরী ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন সুলেখিকা। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার ভারও তিনি কিছুদিন নেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। ১৯০৫, ৫-ই অক্‌টোবর আইন ব্যবসায়ী পণ্ডিত রামভজের সঙ্গে সরলাদেবীর বিবাহ হয়।

১৯২৭-সালে পুনরায় নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। ১৯২৮ সালে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের স্থানীয় শাখার কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি মহামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করে 'ভারত-স্ত্রী-শিক্ষা সদন' স্থাপন করেন। তাঁর রচিত পুস্তকগুলি—'শতগান' (স্বরলিপি সহ) (বৈশাখ ১৩০৭); ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল (৭।৩।১৯১১); 'নববর্ষের স্বপ্ন' শ্রাবণ ১৩২৫ (১৫।৭।১৯১৮) পাঁচটি গল্পের সমষ্টি; শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মানুষ্ঠিত শিবরাত্রি পূজা (১৯৪১); বেদবাণী (আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার উপদেশবাণী ১ম—১১শ খণ্ড, ১৯৪৭-৫০); 'জীবনের ঝরাপাতা' (১৯৫৮) [১৯০৫ সালে বিবাহ এবং পঞ্জাবগমন পর্যন্ত বর্ণিত আছে]। ১৯৪৫ সালে ৮ আগস্ট তিনি পরলোকগমন করেন।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০):

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র কন্যা ইন্দিরা দেবীর জন্ম হয় ১৮৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুরের অন্তর্গত কালাদধিতে। মা ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ১৮৮৭ সালে এনট্রান্স এবং ১৮৯২ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি ইংরাজী পত্রে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত পদ্মাবতী পদকলাভ করেন।

ইন্দিরাদেবী তাঁর খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর স্নেহের পাত্রী ছিলেন। তাঁর সাহিত্য চর্চার মূলেও প্রধানতঃ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইন্দিরা দেবীর প্রথম গ্রন্থ 'নারীর উক্তি' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। এটি রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ইন্দিরাদেবীর আত্ম স্মৃতিমূলক রচনা—সংগীত স্মৃতি, নাটক স্মৃতি, সাহিত্য স্মৃতি, ভ্রমণ স্মৃতি, পারিবারিক স্মৃতি—ছয়টি অধ্যায়ে এই স্মৃতিকথা গ্রথিত।

প্রমথ চৌধুরীর সহযোগিতায় ১৩৫২ (বৈশাখ) বঙ্গাব্দে 'হিন্দু সংগীত' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র সংগীতের 'ত্রিবেণী সঙ্গম' প্রকাশিত হয় ; ১৫-ই পৌষ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। সম্পাদিত গ্রন্থ কয়েকখানি, যথাক্রমে—'বাংলার স্ত্রী-আচার' (আশ্বিন ১৩৬৩), পুরাতনী 'গীতাপঞ্চশতী'।

ইন্দিরা দেবী বেশ কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এগুলি হোলো- 'আনন্দ-সংগীত পত্রিকা', উত্তরস্থবি, 'ঘরোয়া', 'সুরঙ্গমা', 'প্রবাসী', 'বামাবোধিনী', 'বালক', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'ভারতী', 'শারদীয়া আনন্দবাজার', 'সবুজপত্র', প্রভৃতি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্দিরা দেবীকে 'ভুবন মোহিনী' স্বর্ণপদক প্রদান করে। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। রবীন্দ্রভারতী সমিতি তাঁকে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে। ইন্দিরাদেবী স্মৃতিকথা লিখেছেন—আত্মজীবনী 'শ্রুতি ও স্মৃতি' পাণ্ডুলিপি আকারে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। গ্রন্থটিতে ঠাকুরবাড়ি ও চৌধুরী বাড়ির বহু সংবাদ আছে। ১৯৬০ সালে ইন্দিরাদেবী পরলোক গমন করেন।

॥ সূত্রনির্দেশ ॥

১। ১২৯৫, আষাঢ়, বামাবোধিনী পত্রিকা—পৃঃ ৬৭—৭০।

২। ১২৯৫ শ্রাবণ, বামাবোধিনী পত্রিকা পৃঃ ১০৩।

৩। ১২৯৫, শ্রাবণ, বামাবোধিনী পৃঃ ১০৪।

৪। কৈলাসবাসিনী দেবী—'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' পৃঃ ১।

৫। ১২৭২, জ্যৈষ্ঠ, বামাবোধিনী পত্রিকা পৃঃ ৪০—সৌদামিনীদেবী।

৬। কৈলাসবাসিনী দেবী—'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' পৃঃ ১১—১২।

৭। শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী—'একাল ও এ-কালের মেয়ে' পৃঃ ১৩১।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধ-নিবন্ধের ধারা ঃ

উনবিংশ শতাব্দী নবজাগরণের শতাব্দী। এ শতাব্দীর নবজাগরণের কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল মূলতঃ শতাব্দীর গোড়া থেকেই। ১২০০ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ সময়কালে নারীজাতির উপর চরম শোষণ হয় অর্থাৎ—বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, শিক্ষার অন্ধকারে নারীদের নিমজ্জিত রাখা, এ সমস্তই চলেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল নারীজাতির প্রতি এই সামাজিক অত্যাচার। উনবিংশ শতাব্দীতে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তদানীন্তন বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় অবশেষে ১৮২৯-এর ৪-ডিসেম্বর সতীদাহপ্রথা আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল, এ খবর আমাদের কমবেশী সকলেরই জানা আছে। একই সঙ্গে বলতে গেলে, স্ত্রী শিক্ষার অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয় এবং ১৮১৯ সালের মে-জুন মাসে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রথম বালিকা বিদ্যালয় জুভেনাইল স্কুল স্থাপিত হয় কলকাতার গৌরীবাড়ীতে।

এরপর কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনের মধ্যে যাঁকে দেখা যায় তিনি হলেন বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের অন্যতম পুরোধা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। কিছুদিন বলতেও দু-একটি দশক অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। এ সময়টা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে মধ্য দশক অর্থাৎ ১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দ সুতরাং ১৮৫০-এর আগে স্ত্রী শিক্ষা তথা নারী রচিত কোনো রচনা বিশেষ একটা চোখে পড়ে না। যাও পড়ে তা সবই প্রায় পুরুষদের মহিলা ছদ্ম নামে। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই মহিলাদের লেখা প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহী কয়েকটি পত্রিকা, যারা নিয়মিতভাবে মহিলাদের লেখা প্রকাশ করতে থাকে. এগুলি হোলো—'অবলাবান্ধব' (১৮৫৯ খৃঃ), 'বামাবোধিনী (১৮৬৩ খৃঃ), 'বঙ্গমহিলা' (১৮৭০ খৃঃ), 'ভারতী' (১৮৭৭ খৃঃ)। মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র 'বঙ্গমহিলা'-১৮৭০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, ১লা বৈশাখ, সম্পাদিকা ছিলেন মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়।

'ভারতী' পত্রিকা ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (১৮৭৭ খৃঃ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় যদিও প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১২৯১ বঙ্গাব্দ থেকেই পত্রিকাটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ১২৮৪—১২৯০ বঙ্গাব্দ সময়ের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হলেও সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন, যথাক্রমে—স্বর্ণকুমারী দেবী এবং শরৎকুমারী চৌধুরানী। স্বর্ণকুমারী দেবী ছাড়াও পরবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্য পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বভার ছিল তার দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী এবং সরলা দেবীর উপর।

বঙ্গমহিলা কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বঙ্গবাসিনী', প্রকাশ কাল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন ঠাকুর পরিবারের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। তাঁর সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বালক', প্রকাশকাল এপ্রিল ১৮৮৫ (১২৯২ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ)। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (ষষ্ঠ বর্ষ) 'মুকুল' নামক বালক বালিকাদের উপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকাটির দায়িত্বভার কিছুদিনের জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা দেবী গ্রহণ করেন।

উল্লিখিত পত্র পত্রিকার মাধ্যমেই নারী রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ পেতে শুরু করে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর নারীরচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ বলতে তিন-চার দশকের রচনাগুলিই এখানকার আলোচ্য বিষয় হবে। এ সময়ের মধ্যে মোটামুটি ভাবে যে সমস্ত রচনাকারের রচনাগুলি আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন—কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবী, মানকুমারী বসু, রাজলক্ষ্মী দেবী, হেমলতা সরকার এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত।

এঁদের মধ্যে শরৎকুমারী চৌধুরানী, রাজলক্ষ্মী দেবী এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত ছাড়া বাকী সকলের বিষয়ে প্রাথমিক পরিচয় পর্ব প্রথম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির শুধুমাত্র উল্লেখ আছে, কিন্তু বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান অধ্যায়ে এঁদের কয়েকটি রচনার মোটামুটিভাবে বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে এঁদের বক্তব্য বিষয়কে বোঝবার চেষ্টা করা হবে, যার মধ্য দিয়ে তদানীন্তন নারী রচনায় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কতটা প্রকাশ পেয়েছে তা জানা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

কৈলাসবাসিনী দেবী :

লেখিকার দু'টি প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বর্তমান আলোচ্যবিষয়। গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে—

(১) হিন্দু ফিমেলস্ বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা। (১৭৮৫শকঃ বা ১৮৬৩ খৃঃ)

(২) হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি। (১৭৮৭ শকঃ বা ১৮৬৫ খৃঃ)

প্রথম গ্রন্থটিতে বাইশটি ছোট-মাঝারি মাপের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এগুলি হোলো যথাক্রমে—বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের জন্ম, মহিলাগণের বাল্যাবস্থায় ক্রিয়া এবং তাহাদিগের প্রতি পিতামাতার ব্যবহার, কৌলিন্য মর্যাদা, ব্রাহ্মণদিগের বিষয়, রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ কুলীনদিগের বিষয়, কুলীন মহাশয়দিগের পুত্র কন্যাগণের প্রতি ব্যবহার ও তাহাদিগের বিবাহাদির নিয়ম, ত্রিকুলীন দুহিতাদিগের বিবরণ, বঙ্গদেশীয় ভঙ্গকুলীনদিগের বিষয়, বংশজদিগের বিষয়, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বিবাহের পর কামিনীগণের শ্বশুরালয়ে গমন ও তৎকালীন তাহাদিগের মনোগত ভাব ও কার্য্যের বিষয়, নববধূ দিগের প্রতি শ্বশ্রূগণের আচরণ ও বধূগণের মনোগতভাব, মহিলাগণের মধ্যমাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক কার্য্যাদির বিবরণ, ভ্রাতৃজায়ার প্রতি শ্বশ্রূজাগণের ব্যবহার, ভাশুর পত্নী ও দেবর পত্নীগণের পরস্পর ব্যবহার, ধনাঢ্যবংশীয় মহিলাগণের বিবরণ, বঙ্গদেশীয় স্ব স্ব পত্নীগণের প্রতি ব্যবহার, প্রণয়, বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের বিদ্যাভাস, বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের স্বাধীনতা, বৈধব্যযন্ত্রণা।

দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধটি রচনা করবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখিকা মুখবন্ধে বলেছেন—

"অধুনা হিন্দুশাস্ত্রানুভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যূহের মধ্যে প্রায় অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, হিন্দু অবলাকুলের মধ্যে কস্মিনকালেও বিদ্যাচর্চা প্রচলিত ছিল না এবং অধুনা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশে ইংরাজ রাজপুরুষগণই তাহার নূতন সূত্রপাত করিলেন। কিন্তু আমরা তাহা কথনই বিশ্বাস করিতে পারি না যেহেতু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সকলই লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের গর্ব এক্ষণে কোন প্রকারেই শোভা পায় না। কারণ আমাদিগের সেই সৌভাগ্য চিহ্ন বহুকালই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। এবং ইংরাজ

রাজপুরুষেরাই আবার অতি যত্নের সহিত তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারাই যথার্থ ভারতবন্ধুরূপে শুভক্ষণে ভারতে আগমনকরত ভারতীয়গণের সুখ সমৃদ্ধির কারণ স্ত্রী বিদ্যারূপ অমৃতবৃক্ষের সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্টবশত সেই অমৃতময় তরুবরে সুচারুরূপ ফল পুষ্প উৎপন্ন হইতেছে না। অতএব এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া আমি ক্ষীণ বুদ্ধি দ্বারা তাহার নিগূঢ় কারণ সকল কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সামান্য পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম…।"[১]

সুতরাং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লেখিকার মুখবন্ধের বক্তব্যই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করছে। লেখিকা অনুভব করেছেন হিন্দু অবলাকুল অর্থাৎ হিন্দুনারীর তৎকালীন অবস্থা এবং তাঁর অনুভবের প্রকাশই ঘটেছে এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি তাই বলেছেন—

"বিদ্যার বিমল জ্যোতির অভাবে হিন্দু অবলাগণ যে একপ্রকার দ্বিপদ পশু হইয়া আছে, তাহা কোন সহৃদয় ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন, এবং এই কামিনী-কুলের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কত দুর্ঘটনা উপস্থিত হইতেছে, ইহা।। লোচন স্বত্ত্বেও অন্ধের ন্যায় দর্শন শক্তি বিহীন হইয়া কালাতিপাত করিতেছে এবং অন্ধগণ যাদৃশ গম্যমার্গের যথার্থ দিকে পদার্পণ করিতে অশক্ত হইয়া, বিকৃত কণ্টকাবৃত কুমার্গে পতিত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হয়, ইহারাও তাদৃশ বিদ্যান্ধতা প্রযুক্ত সংসার বৃক্ষের যথার্থভাগে গমন করিতে অসমর্থা হইয়া বিষম কণ্টকে বিদ্ধ হয়।"[২]

নারীদের পক্ষে এই অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকাটা যে কতটা কষ্টের তা বোধকরি লেখিকার অন্তরের অন্তঃস্থলকে স্পর্শ করেছে আর সেই কারণেই তদানীন্তন যে সমস্ত সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিত্ব নারীগণের সামাজিক অত্যাচারের প্রতিবাদে কণ্ঠসোচ্চার করেছিলেন, সমাজের কুসংস্কারের বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলবার সংকল্প নিয়েছিলেন, তাঁদের মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

"অতএব হে সুধীবর বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ। আপনারা সচেষ্ট হইয়া তাহাদিগের সেই বিষম কষ্ট নিবারণ করুন।"[৩]

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে হিন্দু রাজাদের সময়কালে এদেশের নারীরা ছিলেন সর্বগুণসম্পন্না, কারণ তদানীন্তন সময়ে উচ্চশিক্ষিতা মহিলার উল্লেখ

পাওয়া যায় যাঁরা অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তৎকালীন ভারত দুহিতাগণ বিদ্যাহীন ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী সময়ের অর্থাৎ অহিন্দু বা ম্লেচ্ছ রাজাদের রাহুদৃষ্টি এই ভারতমাতার সমস্ত সৌন্দর্য্যকে গ্রাস করেছে। তারা বিজাতীয় বিদ্বেষবশতঃ হিন্দুদের সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্মশাস্ত্র, নষ্ট করে দিয়ে নিজেদের শাস্ত্র প্রচলনের নিমিত্ত যতরকমের অত্যাচার এবং অন্যায় পথ গ্রহণ করবার প্রয়োজন তা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। ভারতের মানুষজন ক্রমাগত বহিঃশক্তির আক্রমণের ফলে ক্রমশঃ নির্ধন হয়ে পড়েছিলেন। প্রসঙ্গত লেখিকা উল্লেখ করেছেন—

"এই দেশ পুনঃ পুনঃ বিজাতীয় রাজকরে পতিত ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দুর্দান্তজাতি কর্তৃক হৃত সর্বস্ব হওয়াতে একেবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। আর রাজার প্রযত্ন ব্যতিরেকে প্রজার কি ধন, কি মান, কি বিদ্যা কিছুই পরিবর্দ্ধিত হয় না, সুতরাং তৎকালে এই ভারতবর্ষীয়দিগের কি ধন গৌরব, কি মানগৌরব, কি বিদ্যাগৌরব সকলই একেবারে নষ্টপ্রাপ্ত হইয়াছিল।"[৪]

মানুষজনের কাছে সম্বল ছিল সামান্য মাত্র ভূমি। সেই কারণে আর্থিক অভাববশতঃ পুত্রসন্তানকেই বিদ্যাশিক্ষা করাবার ক্ষেত্রে ব্যয় বহন করাই তাঁদের পক্ষে ছিল কষ্টকর। এমতাবস্থায় কন্যাসন্তানের বিদ্যাশিক্ষা করাবার বিষয়ে ভাবাই অসম্ভব। পুত্রসন্তান যেহেতু কিছুটা লেখাপড়া না শিখলে জীবিকা-পোর্জনের পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি হয়, সেজন্য পুত্রদের কিছুটা লেখাপড়া শেখাবার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য অর্থব্যয় করতেন এবং কন্যা সন্তানকে সংসারের কাজকর্ম শিখবার কাজটাই যথেষ্ট মনে করতেন। এই অবস্থা চলতে থাকায় ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি থেকে নারীশিক্ষা কথাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সে সময়ে সুসাধু বাঙলা ভাষার প্রচলন ছিল না। উপরন্তু প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃত ভাষাও ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের ন্যায় ছিল; তাই হিন্দু পণ্ডিতগণেরও ছাত্রাভাব দেখা দিয়েছিল। কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিতকে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট কষ্টভোগ করতে হোতো। সামান্য কয়েকজন ছাত্র নিয়ে চালাতেন তাঁদের শিক্ষানিকেতন, যেখানে নিজেদের অনশনে রেখে স্বঅন্ন শিষ্য অর্থাৎ ছাত্রদের প্রদান করে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন। এভাবে, বহু কষ্ট সহ্য করে তাঁরা হিন্দুশাস্ত্রকে কোনোরকমে রক্ষা করতে সমর্থ হন। এইসব পণ্ডিতেরা তাঁদের শিক্ষাদানের

বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না, তবে নিম্নবর্ণের অথবা স্ত্রীলোক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার পেত না। একমাত্র জাতিতে বৈদ্য ছাত্ররাই বিদ্যা শিক্ষার অধিকারী ছিল। বৈদ্য ছাত্ররা যে সমস্ত সংস্কৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কৃতবিদ্য হতেন তা নয়, তাঁরা শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের জন্যই সামান্য অধ্যয়ন করেই নিজেদের ব্যবসা কাজে নিযুক্ত হতেন। কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রজাতিগণ শুদ্ধ লিপিকার বৃত্তি অর্থাৎ নকল নবিশ অর্থাৎ কেরানীর কাজ করবার জন্য যতটুকু শিক্ষা প্রয়োজন ততটুকু অধ্যয়ন করতেন।

বাঙলা ভাষায় তখন কোনো উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ হয়নি, প্রচলিত মিশ্র ভাষাতেই কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং সেই ভাষাতেই লোকে চিঠিপত্র লেখার কাজ করতেন। ভাষার বিবর্তনের পরও পল্লীগ্রামের মানুষজন তাদের দৈনন্দিন কাজে উক্ত ভাষাই ব্যবহার করতেন। যেক্ষেত্রে মাতৃভাষার এই দুরবস্থা এবং সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নে কঠোর নিয়ম সেক্ষেত্রে মেয়েদের বিদ্যাভাস করাবার বিষয়ে অভিভাবকগণ মোটেই উৎসাহ প্রকাশ করতেন না। বরং নানান কায়দায় বাধাদান করতেন। লেখিকা বিষয়টির উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন—

"তৎকালিক পণ্ডিতগণ কহিতেন যে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবলাজাতির অধিকার নাই, আর স্ত্রীগণ গৃহমধ্যে কালীর অঙ্কপাত করিলে লক্ষ্মীত্যাগ হয় এবং উহারা যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন না কেন তাহাতেই উহাদিগের বিষমানিষ্টের সম্ভাবনা। আরও কহিতেন যে স্ত্রীগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিলে অকালে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়।"[৫]

ফলে নারীগণের বিদ্যাভ্যাস একেবারেই নিষিদ্ধ। সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠের কঠোরতার কারণে নারীগণ দূরে থাকুক পুরুষগণের পক্ষেও এ শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার প্রবণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ফলে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রচুর দৈনতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। লেখিকা এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"...এইরূপ হিন্দুগণের সুখসূর্য্য অস্তমিত হইলে তৎকালে ইউরোপীয়গণ এই রাজ্য অধিকার করেন, তৎসময়ে দুই একজন মাত্র রস প্রিয় কবি দ্বারা দুই চারিখানি পদ্যগ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশত তাহা কেবল আদ্যরসেই পরিপূর্ণ।"[৬]

হিন্দুরাজাদের পরিবর্তে অহিন্দু রাজাগণের শাসন দেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির

ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছিল। সেইকারণে হিন্দু রাজাগণ যে সমস্ত শাস্ত্র বহু-যত্নে প্রকটিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন মুসলমান শাসনে তার বিলোপ ঘটে, সঙ্গে নারীগণের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়েও সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানো হয়। নারীগণের এ অবস্থার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—

"পূর্বে যে দেশে লীলাবতী প্রভৃতি গুণবতী অঙ্গনাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, দুরাত্মা যবনরাজাদিগের অধিকারাবধি সেইদেশ একেবারে স্ত্রীবিদ্যা শূন্য এবং সেই দেশের মহিলাগণ পশুশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছে।"[৭]

এভাবেই এদেশে নারীদের বিদ্যাভ্যাসের পরিবর্তে নানান কুসংস্কারের প্রচলন হোলো যা নারীজাতিকে অন্তঃপুরে বদ্ধ করে ক্রমশঃ অন্ধকারের জীব হিসাবে পরিচিত করতে থাকে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পুরুষকেই দায়ী করেছেন লেখিকা। কারণ শাস্ত্রানুযায়ী পত্নী পতির অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ, কথাটিকে মর্যাদা প্রদানে অপারগ হয়েছেন পুরুষরাই। এ বিষয়ে তিনি পুরুষগণকে কটাক্ষ করে লিখেছেন—

"...কিন্তু সুখের অংশটি দিতে অতিশয় কাতর হইতেন, নচেৎ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিবেন কেন? তাঁহারা বণিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না অথবা পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিংবা গৃহকার্য্যে উপেক্ষা করতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে ও অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইতে ইচ্ছা করে অথবা পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করতঃ অন্য পুরুষকে বরণ করতে অভিলাষিণী হয়, এই প্রকার বিবিধ আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহারা স্ত্রীগণকে নিতান্তই নির্বোধ ও বিদ্যাভ্যাসে অশক্তা বলিয়া নির্দেশ দিতেন বা করিতেন।"[৮]

সমাজের ধারক পুরুষগণের কাছ থেকে এভাবে বঞ্চনা পেয়ে নারীগণও বিদ্যাভ্যাসের চিন্তা মন থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে থাকেন। দু-একজন যাঁরা নিতান্তই সহায়শূন্য এবং পতিপুত্রহীনা তাঁরা দুই একটি কম মূল্যের ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা অন্নদামঙ্গল পড়তেন এবং এরফলেই নিজেকে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন মনে করতেন। এমনকি অন্য নারীকে গ্রন্থগুলি পড়বার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া তো দূরে থাকুক বরং নিরুৎসাহী করতেন। এই সমস্ত মহিলাগণের বহি-আচরণে তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হবার জন্য সাধারণ

মহিলাগণ তাঁদের অর্দ্ধপুরুষ জ্ঞান করেই তাঁদের থেকে দূরে থাকাটাই শ্রেয় মনে করতেন। লেখিকার লেখনীতে তা প্রকাশ পেয়েছেন—

"...তাহাকে দেখিলে কুলকামিনীগণ আপনাদিগের তনয়া ও...সাবধানপূর্বক রক্ষা করিতেন। যেমন প্রসূতিগণ স্বীয় সন্তানগণকে ডাইনযোগিনী প্রভৃতির নিকট যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন, তেমনি ইঁহারাও উহাদিগকে দর্শন করিলে আস্তে ব্যস্তে আত্মরক্ষা করতে যত্নবতী হইতেন।"[৯]

ভারতবর্ষের দুর্দিনের বলতে গেলে সবেমাত্র শুরু, তাই ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃত-ভাষার স্বল্পব্যবহারের ফলে এ ভাষা ছাড়া আর কোন উৎকৃষ্ট ভাষার প্রকাশ ঘটেনি, তাই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশের আশা শুধু আশাই থেকে গিয়েছে। এরপর ইংরাজ শাসন নেমে এলো ভারতের বুকে। ইংরাজ শাসনে অবশ্য শিল্পক্ষেত্রে কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তদানীন্তন কয়েকজন শাসকের প্রচেষ্টায় কিছু অতুৎকৃষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশের মানুষজনকে শিক্ষা দেবার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ পায়।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মানুষজন বর্ণ অর্থাৎ যার যার কর্মানুযায়ী পরিচয়ে পরিচিত হোতো, যেমন, ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান কার্য, বৈদ্যগণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকার্য, কায়স্থগণ লিপিকর বৃত্তি, কর্মকার লোহার কাজ, মালাকার মালা তৈরী, কুম্ভকার মাটির পাত্র তৈরী, মাদকগণ মিষ্টান্ন তৈরী প্রভৃতি স্ব স্ব জাতীয় কাজ করতেন। কেহ স্ব স্ব কার্যছাড়া অন্য কাজে প্রবৃত্ত হতেন না। কিন্তু বর্তমানে পূর্বের ন্যায় কঠিন নিয়ম প্রচলিত নাই। বিদ্যাগ্রহণ এবং কর্মনির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমান অধিকারী। ফলে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। মাতৃভাষার অনুশীলনের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। এমনকি স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বালিকাদের বিদ্যালয়ে আনবার জন্য নানারূপ প্রচেষ্টাও করা হয়। ফলে বিদ্যাপ্রদান এবং গ্রহণে ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

"বিদ্যাপ্রভাবে অতিনীচ জাতিও উচ্চাসনে উপবেশনের যোগ্য হইতেছে। এই বিদ্যাজ্যোতি এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, সাঁওতাল আদি যে অতি অসভ্য দেশ, তাহাতেও বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া তদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যূহের জ্ঞানতিমির ধ্বংস হইতেছে। যেখানে অস্মদেশীয় ভদ্রাঙ্গনাগণের এতাদৃশ বিদ্যাহীনতা কখনই ন্যায়ানুগত নহে এইরূপ বিবেচনা করিয়া মৃত মহাত্মা বেথুন সাহেব এই

দেশে শুভাগমনকরত স্ত্রীগণের বিদ্যাধ্যায়নের প্রথম সূত্রপাত করেন, ইহার পূর্বে কোন কোন কৃতবিদ্যা যুবক আপনালয়ে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে সাধারণ মহিলাগণের কোন উপকারদর্শে নাই।"[১০]

ইতিপূর্বে নারী শিক্ষার পরিধি ছিল শুধুমাত্র নয়-দশ বয়সকাল পর্যন্ত। শুভঙ্করী ধারানুসারে কড়া, গণ্ডা, পুর্ণকিয়া, চৌকিয়া পর্যন্ত, খুববেশী হলে দু-একখানি পুরাণগ্রন্থ পাঠ পর্যন্তই শিক্ষা। আর ছিল নানান কুসংস্কার, যা তাদের মজ্জাগত বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিশেষত নারীশিক্ষার কিছুটা উৎকর্ষসাধনের জন্য মেয়েরা বাঙলা ভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করে জ্ঞানোপার্জ্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু এরফলে সাংসারিক ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে, তা হোলো কামিনী-গণ বিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়ে সাংসারিক গৃহকর্মের দিকে যত্নবান হয় না, বরং বিরক্ত বোধ করেন, লেখিকার লেখনীতে তার প্রকাশ—

"...বিরক্ত হইয়া কহেন, 'সকলেইত সমান মনুষ্য', ঈশ্বর সকলকেইত সমানভাবে সৃষ্টি কারয়াছেন...।"[১১]

নারীদের গৃহবন্দী অবস্থায় থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাবার আশঙ্কাতেই বোধ হয় প্রাচীন মতাবলম্বী মহোদয়গণ স্ত্রী বিদ্যার প্রবেশ ঘটাতে এতো আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষাজ্ঞ নব্য সম্প্রদায়ী মহোদয়গণ এর পক্ষে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তাঁদেরকেও প্রাচীনপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এর কারণও কিন্তু নারীগণ। সামান্য বিদ্যাশিক্ষা করেই তাদের মধ্যে আত্মগরিমার সঞ্চার হয়। ফলে পুস্তক পাঠ ছাড়া অন্য গৃহকর্ম করবার ক্ষেত্রে ও সন্তান পালনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অনিহা, সাংসারিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। আর এর ফলে হিন্দু নারীদের বিদ্যাপ্রভা দিবা প্রদীপের ন্যায় প্রভাশূন্য হয়ে পড়ে।

নারী শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখিকা ঠাকুর পরিবারের মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রথমা কন্যা সুরসুন্দরী দেবীর উল্লেখ করেন যিনি হিন্দু মহিলাকুলের মধ্যে প্রথমই গুণবতীরূপে বিখ্যাত হন, তাঁর অকালমৃত্যু হয় এবং এরপর ঠাকুর বংশের কোন মহিলা তাঁর মতো গুণবতীরূপে বিখ্যাত হতে পারেন নি।

যদিও দেশীয় কয়েকজন ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টা নারী শিক্ষা প্রসারে সহমত হয়ে এগিয়েছে কিন্তু মূলতঃ রাজানুগ্রহ ব্যতিরেকে তা কখনই সম্ভবপর হয় নি। এক্ষেত্রে মহাত্মা বেথুনের নাম উল্লেখ্য যাঁর প্রচেষ্টা স্ত্রী-বিদ্যা চর্চ্চার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। এই রাজানুগ্রহও নারীশিক্ষাকে আশানুরূপ সাফল্যের দরজায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি, এর কারণ বাল্যবিবাহ প্রথা। সাত-আট বছরে বালিকারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং দু-তিন বছরের মধ্যেই তাদের সর্ব্ববিদ্যার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সংসারব্রতে ব্রতী হতে হয়। এই স্বল্প সময়ে তাদের বিদ্যাপ্রভাত উদ্দীপিত হতে পারে না।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখতে বসে লেখিকা মূলতঃ যে বিষয়ের প্রতি সর্বদা সজাগ চোখে চেয়ে থেকেছেন তা হল নারী শিক্ষার প্রসারকালে যদিচ বেশ কয়েকজন সমাজ সচেতক ইংরাজ শাসন কালেই শাসনকর্তার সহায়তায় অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা রেখেছেন, কিন্তু তার আশানুরূপ ফল মেলেনি। এর কারণ হিসাবে লেখিকার মনে হয়েছে শুধু সমাজের প্রাচীনপন্থী পুরুষগণই দায়ী নন, নারীরাও দায়ী। প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি নানান প্রসঙ্গে এ বক্তব্যটিকে তুলে ধরবার চেষ্টা রেখেছেন। দীর্ঘ সময়ের প্রবঞ্চনার শিকার এই নারী, তাই শিক্ষালাভের স্বাধীনতাকে সাদরে গ্রহণ করতে বোধ হয় সক্ষম হতে পারেনি। আর সেই কারণেই নানান দোষ তাকে ঘিরে ধরেছে, অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, আত্মগরিমা, সাংসারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবার ক্ষেত্রে অক্ষমতা। নারী শিক্ষা প্রসারে প্রতিবন্ধকতা এসেছে নানান দিক থেকে। একেবারে বিলুপ্ত করে নয়, কিছু সংশোধন ও সমতা রেখে নারীশিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত। এভাবেই নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাবে বলে লেখিকার বিশ্বাস।

শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবীর অন্য গ্রন্থটি অর্থাৎ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের সমন্বয়ে "হিন্দু ফিমেলস্ বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা"-র প্রকাশ কাল ১৭৮৫ শক অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ। গ্রন্থ প্রারম্ভে অর্থাৎ ভূমিকায় লেখিকার নিবেদনটি উপস্থাপিত করা হোলো—

"আমি যে মহাত্মার এতাদৃশ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছিলাম, প্রথমত তাঁহার নিকট আমার সমধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্যবোধে আমি সর্বসাধারণ সন্নিধানে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। আমি বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে একটি বর্ণও শিক্ষা করি নাই এবং শিক্ষা বিষয়ে আমার

অভিলাষও ছিল না। অধিক কি কহিব কেহ নারীগণের বিদ্যা বিষয়ক কোন কথা উত্থাপন করিলে আমি বিরক্ত হইতাম এবং করিলে যে অচিরাৎ বিধবা হয়, প্রাচীন পরম্পরাগত এই পুরাতন বাক্যটি অতি যত্ন সহকারে হৃদয় ভাণ্ডারে ধারণ করিতাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর আমার স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় আমাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু আমি একপ্রকার বিদ্যা বিরোধিনী ছিলাম, সুতরাং তাঁহার সেই যত্ন আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইল। আমি কোনোমতেই তাঁহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতাম না। কিন্তু তিনি তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া বরং আরও অধিক পরিমাণে চেষ্টিত হইলেন। পরে আমি অগত্যা তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম। তিনি বচনাতীত সন্তোষ সহকারে আমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

১৭৭১ সালের শ্রাবণ মাসে আমাকে বর্ণমালার প্রথম ভাগের উপদেশ দেন, আমি সেই অবধি গোপন ভাবে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিতাম এবং গুরুজন ভয়ে ভীত হইয়া বিদ্যাকে অতি দুষ্কর্ম বোধে লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা করিতাম এবং বিদ্যা বিষয়ে কোনপ্রকার কথা লইয়া আমার গুরুজনেরা যদি আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তবে সেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পাইয়া পাঠ্য পুস্তকাদি সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া শিক্ষকের প্রতি কতই বিরক্ত হইতাম, কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই আমাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইতে দিতেন না। সুতরাং আমি উভয় অনুরোধ রক্ষা করিবার মানসে, দিবাভাগে সাংসারিক কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া সায়ংকালীন অবকাশ পাইয়া যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিতাম। কিন্তু আমার অদৃষ্টবশতঃ তাঁহার আশা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কারণ আমি অবকাশাভাবে কিছুই শিখিতে পারি নাই এবং সেইজন্য এ পর্যন্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। একবার প্রভাকরে কোন একটি প্রবন্ধ লিখিতে আমাকে আমার বন্ধুজনেরা অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তৎকালে এতাদৃশ দুঃসাহসিক বিষয়ে সাহস করিতে পারি নাই, কি জানি মহৎপদ আশ্রয় করিতে গিয়া পাছে শিখিপুচ্ছধারী বায়সের ন্যায় হাস্যাস্পদ হই। কিন্তু এক্ষণে অনেকের নিকট নিতান্ত অনুরুদ্ধা হইয়া, অগত্যা এই বাতুলতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। অতএব হে গুণিবর মহোদয় পাঠকগণ, আপনারা মহত্বগুণে আমার এই "হীনাবস্থার" প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতে চরিতার্থ হই।"[১১]

উল্লিখিত ভূমিকাতেই স্পষ্টত যে লেখিকার প্রবন্ধ রচনার এই গ্রন্থটিই প্রথম নিবেদন। তাঁর শিক্ষার হাতেখড়িও হয় পরিণত বয়সে। কিন্তু উপলব্ধির জগৎ শুরু হয় শৈশব থেকেই নানান সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। সংস্কার-কুসংস্কারের উপলব্ধি তাঁর মনকে আশ্রয় করে দানা বেঁধেছিল—তাই তিনি লেখনীর প্রারম্ভেই সমাজের নারীর অবস্থানের কথা বলেছেন। তাঁর রচিত এই গ্রন্থে তিনি ছোট বড় নানান পরিসরের বাইশটি প্রবন্ধকে সাজিয়েছেন পর্যায়ক্রমে।

প্রবন্ধ রচনার সূচনাতেই তিনি সমস্ত সভ্যদেশের নারীগণের সঙ্গে এদেশের নারীদের তুলনা করতে গিয়ে তাঁদের হীনাবস্থার কথাই বলেছেন যার কারণ এদেশের দোষযুক্ত দেশাচার। এই দেশাচারের বশীভূত হয়েই এদেশের হিন্দু ধর্মাভিমানী মানুষজন নানান অপ্রিয় কার্য যথা, কৌলীন্যপ্রথা রক্ষার্থে শৈশবেই বালিকাদের বৃদ্ধদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাদের বলির পাঁঠা তৈরী করেছে। এই নারী অত্যাচারের বিরুদ্ধেই লেখিকার লেখনী সোচ্চার হয়েছে।

এদেশে মেয়ে সন্তান হয়ে জন্মান যে কত অসম্মানের এবং কন্যা সন্তানকে যে কত অবহেলা ভোগ করতে হয়, তাঁর স্বল্প পরিসরের প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের জন্ম'-এ বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি এর পরিসমাপ্তি চাইছেন মনেপ্রাণে—

"...হা বিধাত। আমরা কি এতই নিকৃষ্ট যে আমাদিগের জন্ম-মৃত্যু উভয়কালই সমান হইবে? হা দেশাচার! তোমার কি মোহিনী শক্তি। তোমার মোহে মুগ্ধ হইয়া লোকসকল মোহান্ধকার ভোগ করিতেছে। হায়! কতদিনে আমাদিগের এই বাংলাদেশ সুখের আলয় হইবে, কতদিনে এই ঘৃণিত দেশাচার একেবারে দূরীভূত হইবে। হে সর্বজন হিতৈষী মহোদয়গণ! তোমরা সকলে যত্নবান হইয়া এই দুঃসহ অত্যাচারকে সমূলে নির্মূল কর।"[১৩]

ছেলেবেলা থেকেই কন্যাসন্তান এবং পুত্রসন্তান-এর প্রতি পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের ব্যবহারের যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, লেখিকা তাঁর 'মহিলাগণের বাল্যাবস্থায় ক্রিয়া এবং তাহাদিগের প্রতি পিতামাতার ব্যবহার' শিরোনামের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। বালককে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বালিকার ক্ষেত্রে তার বিপরীত, কন্যা সন্তানদের স্থান বিদ্যালয়ে নয়, গৃহকোণে। একেবারে অবাঞ্ছিতভাবে বেড়ে ওঠে সংসারের

বালিকা। তাকে শিক্ষাদানের পরিবর্তে অশিক্ষিত মাতা নানাপ্রকার ব্রত করানো, যেমন—চৈত্রমাসে নখছুট ব্রত, বৈশাখমাসে পুণ্যপুষ্করিণী, শীলশীলেটম, দশপুত্তলিকা প্রভৃতি ব্রত, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে যমপুকুর ব্রত, অগ্রহায়ণ মাসে সাঁজুতি, মৌনীধারণ ব্রত, ইত্যাদি। এ সমস্ত ব্রত পার্বনের মধ্য দিয়ে কন্যা সন্তানের মনের মধ্যে বাল্যাবস্থাতেই নানান কুসংস্কার প্রবেশ করানো হয়। এরফলে তাঁদের শিক্ষাগ্রহণের আলো দেখা একেবারে দূরে চলে যায়। লেখিকা তাঁর লেখনীতে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে এ অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন—

"হা ভ্রম। কতদিনে তুমি এই বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিবে···হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! কতদিনে তুমি আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া এই বিষম বিষতুল্য ভ্রমজাল হইতে আমাদিগের মনকে সত্যধর্মের আশ্রয় প্রদান করিবে।"[১৪]

কুলীন ঘরের কন্যাসন্তানের বয়স দশ বা এগারো বছর হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিতামাতা ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং হিতাহিত বিবেচনা না করেই যাকে তাকে, অর্থাৎ প্রয়োজনে অশীতিপর বৃদ্ধকেও কন্যা দান করে, এমনকি গাছের সঙ্গে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে পিতৃমাতৃ উভয় কুলস্থ পিতৃপুরুষগণ নরকস্থ হবার হাত থেকে পরিত্রাণ পান, এই হোলো 'কৌলীন্য মর্যাদা' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। একই কুলীন পুরুষকে কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য বহুবিবাহ করতে হয়, যার ফলে ঐ বালিকাগণ স্বামীর ঘর কাকে বলে জানে না। শুধুমাত্র কুমারী নাম খণ্ডন করাই এ বিবাহের উদ্দেশ্য। অনেক সময় দেখা যায় প্রধান বংশীয় কায়স্থ মহাশয়েরা স্ব স্ব কুলগৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য কুলীনদের বিপুল পরিমাণে অর্থদান করে তাঁদের কন্যাদের সঙ্গে নিজেদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেয় এবং কুলীন মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সাধন করবার পর ঐ পুত্রকেই পুনর্বার অন্য প্রধান বংশীয় কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে অর্থ ও ধন লাভ করেন। এভাবেই কুলীন কন্যাদের সমাজের কাছে বলি হতে হয় বাল্যাবস্থাতেই। লেখিকার ব্যথা ফুটে উঠেছে তাঁর লেখনীতে—

"হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! কতদিনে আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া এই ভ্রমমূলক কার্য্যসমূহকে নষ্ট করিবে, ও কতদিনে আমাদিগের বন্ধুগণের এই বৃদ্ধাদিতে কন্যা দানাদি অতি গর্হিত আচরণ হইতে নিরস্ত হইবেন।"[১৫]

'ব্রাহ্মণদিগের বিষয়', 'রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ কুলীন দিগের বিষয়, 'কুলীন মহাশয়-দিগের পুত্রকন্যাগণের প্রতি ব্যবহার ও তাহাদিগের বিবাহাদির নিয়ম', প্রবন্ধ-গুলিতে লেখিকা ব্রাহ্মণত্বের নামে নারীদের কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ করে অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন। এর ফলে বহু নারীকে অনেক সময় অসৎকার্য করে সমাজচ্যুতও হতে হয়। এর বিরুদ্ধেই লেখিকার জেহাদ।

'ত্রিকুলীন দুহিতাদিগের বিবরণ' প্রবন্ধে ত্রিকুলাত্মজার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। যারা খাটি কুলীন কন্যা অর্থাৎ খাটি কুলীন বাবা ও মায়ের সন্তান তাদের ত্রিকুলাত্মজা বলে, এদের জন্য যদি সমবংশীয় কুলীন পাত্র যোগাড় না হয় তবে তারা মহাভারতের চরিত্রগুলির মধ্যে বৃদ্ধা কন্যাদের মত চিরকালই কন্যাবস্থায় থাকে। এইসব নারীদের বিবাহক্ষেত্রে নানান অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়, উদাহরণ হিসাবে লেখিকা দ্বাদশবর্ষীয় পাত্রের সঙ্গে ত্রিংশৎবর্ষীয়া নারীর বিবাহের উল্লেখ করেছেন। অনেকক্ষেত্রে এসব নারীদের চিরকাল অবিবাহিতা-বস্থায় জীবন কাটাতে হয় এবং তাদের আর দুঃখের সীমা থাকে না। তারা প্রায় অনেকেই কুলকলঙ্কিনী হয়ে কুলে কালি দিয়ে বিপথগামিনী হয়। এরজন্য লেখিকা সামাজিক রীতিকে দায়ী করেছেন যা তাদের অবিবাহিত থাকতে বাধ্য করে।

'বঙ্গদেশীয় কুলীনদিগের বিষয়' প্রবন্ধে লেখিকা কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ করতে গিয়ে বহু বালিকার যে ক্ষতি হয়, তার উল্লেখ করেছেন। এইসব বিবাহিতা রমণীরা স্বামী সহবাসের ভাগ্য থেকে প্রায়ই বঞ্চিত হয়। কারণ, বহুবিবাহ করবার জন্য কুলীন ব্রাহ্মণ পতি কালে ভদ্রে শ্বশুরালয়ে শুধুমাত্র অর্থ সংগ্রহের জন্যই স্ত্রীদের কাছে আসত এবং সহবাস করত। এরফলে সেই বিবাহিতা রমণীরা যে বিপথগামিনী হতে পারে সেদিকে তাদের কোনো লক্ষ্য বা উৎসাহ ছিল না, তারা শুধু ধন চাইত। লেখিকা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন, কৃষ্ণনগর জিলার একগ্রামের এক কুলীন ব্রাহ্মণের বিংশতি বছর বয়সের স্ত্রীর স্বামীকে অর্থের বিনিময়ে পাবার জন্য এবং পিতামাতার অর্থ না থাকবার জন্য নিজেই কলকাতার নগরে এসে বেশ্যাবৃত্তি করে ধন উপার্জন করতে প্রয়াসী হবার ঘটনা। এই তো আমাদের দেশের কুলীন কন্যাদের কথা, স্বামীর ঘর করবার মত সুযোগও তারা পায় না।

'জাতিভেদ' প্রবন্ধে বঙ্গদেশের বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য মর্যাদা, বহুবিবাহ,

সহমরণ নিবারণের জন্য যে সমাজ সংস্কারকগণের প্রচেষ্টা ছিল এবং তা কার্যকরী করতে তাঁদের যে অপমান সহ্য করতে হয় তার উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের সহমরণ প্রথা বন্ধ করবার বিপক্ষতাচারণের উল্লেখ করা হয়। বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ এমনকি শিকদের বালিকাহনন, পূর্বদেশীয়দের সাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি গর্হিত কার্যের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এ সমস্ত ঘৃণ্যপ্রথার বিলোপসাধনের জন্য যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে সাফল্যলাভ করেছেন তাঁদেরকে লেখিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে সমর্থন জানিয়েছেন। আর এইসব ঘৃণ্যপ্রথার সমর্থনে যাঁরা উক্ত অত্যাচার অবসানের বিপক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁদের তিনি অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। উনবিংশ শতাব্দীর এই লেখিকার লেখনীতে তাই ছিল—

"বহু দিবস অতীত হইল, আমি এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু বামাজাতি সহসা কোন বিষয়ে সাহস করিতে সমর্থ হই নাই, কারণ বুদ্ধি বামাবশতঃ পাছে বিজ্ঞসমাজে উপহাসের পাত্রী হয়, এই আশঙ্কায় নিরস্ত ছিলাম, এক্ষণে আমার এই হীনাবস্থায় তাহার উল্লেখ করিলাম।"[১৬]

'বাল্যবিবাহ' শিরোনাম প্রবন্ধে লেখিকা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে গিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে এদেশের আবহাওয়ার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অন্যান্য দেশের তুলনায় উষ্ণপ্রধান এদেশবাসীরা অল্প বয়সেই যৌবন প্রাপ্ত হয়, তাই এদের বিবাহও অল্প বয়সেই দিতে হয়। সেইজন্য পুত্রগণের বিংশতি বৎসর এবং কন্যাগণের ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ বৎসর বয়সে বিবাহ দেওয়াই বিধেয়। এর ফলে বাল্যাবস্থায় বিবাহে বালিকা বধূকে শ্বশুরালয়ে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর 'হিন্দু মহিলাদের হীনাবস্থা' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিবাহের পর কামিনীগণের শ্বশুরালয়ে গমন ও কার্য্যের বিষয়, নববধূদের প্রতি শ্বশ্রূগণের আচরণ ও বধূগণের মনোগতভাব, মহিলাগণের মধ্যাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক কার্য্যাদির বিবরণ, ভাতৃ-জায়ার প্রতি শ্বশ্রূজার ব্যবহার, ভাশুর ও দেবর পত্নীগণের পরস্পর ব্যবহার, ধনাঢ্যবংশীয় মহিলাগণের বিবরণ, বঙ্গদেশীয় স্ব স্ব পত্নীগণের পরস্পর ব্যবহার প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে যে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন তা হোলো একটি বাল্যবিবাহিতা বধূকে শ্বশুরালয়ে গমন করবার

পর অপটু গৃহকর্ম, বিদ্যাহীনতা, প্রভৃতি কারণে শ্বশুরালয়ে নির্যাতনের শিকার হতে হয় নানাভাবে। তাদের অবস্থান সেখানে পাচিকা, পরিচারিকা, ধাত্রী ছাড়া আর কিছুই নয় এমনকি স্বামীর কাছে নানান কটুবাক্য শুনতে হয়। তারা শ্বশুরালয়ে অবলা, নির্বোধ, মূর্খ বলে ব্যঙ্গের পাত্র হয়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে নারীকে সমাজ পশুর সমস্থানে বসাতেও দ্বিধাবোধ করে না। অতি প্রাচীন কালের তৎকালীন গ্রন্থ কর্তারাও নারীদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ মন্তব্য করতেও পিছপা হয়নি বলে লেখিকা উল্লেখ করেছেন।

'বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের বিদ্যাভ্যাস' বিষয়ক পূর্বোলোচিত দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখিকা এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেন। কিন্তু এরই পূর্বে তার এই প্রথম গ্রন্থটিতেই এ বিষয়ে একটি স্বল্লায়তনের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই লেখিকার দৃঢ় বক্তব্য—

"এক্ষণে বক্তব্য এই, নারীগণ বিদ্যাভ্যাস করিলে যে দ্বিচারিণী হইবে ও সাংসারিক কার্য্যে উপেক্ষা করিবে তাহার প্রমাণ কি? বিদ্যা কি নিকৃষ্ট পদার্থ যে তৎসংস্পর্শে নারীগণ নিকৃষ্টমার্গে পদার্পণ করিবে? আর গৃহকর্মেই বা তাহারা উপেক্ষা করিবে কেন? বিদ্যা শিখিয়া কি তাহাদিগের স্বামীপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের প্রতি স্নেহভাবের অভাব হইবে? আর তাহাদের স্বাধীনতাই বা কী প্রকারে হইবে? বঙ্গাঙ্গনাগণ ত অঙ্গনাতিক্রম করিলেই কুলভ্রষ্ট হয়, তবে কি প্রকারে তাহারা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে?"[১৭]

নারীদের নানান অত্যাচার, কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখা, শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখা, এসব যন্ত্রণার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার জন্য লেখিকার আবেদনমূলক মত স্থান পেয়েছে তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থটির শেষ পর্যায়ের প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের স্বাধীনতা'য়। তবে প্রাচীনকালের হিন্দু অঙ্গনাদের যে অতি স্বাধীনতা, যথা বংশরক্ষার জন্য অন্য পুরুষের দ্বারা সন্তান উৎপাদন, এক নারী চার পাঁচ জনের ভোগ্যা, প্রভৃতি অসঙ্গত মত গ্রহণেও তিনি রাজী নন।

গ্রন্থটিতে লেখিকার সর্বশেষ প্রবন্ধ 'বৈধব্য যন্ত্রণা', নারীগণের অত্যাচারের চরমসীমার নিদর্শন এই বৈধব্য যন্ত্রণা। বিধবাদিগকে ব্রহ্মচর্যাবলম্বন এবং একাদশী তিথিতে নির্জলা উপবাস, এই কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে নারীদের উপর চরম অত্যাচার করা হয়। তারই বিরুদ্ধে লেখিকার লেখনী সোচ্চার হয়েছে—

"হে স্বদেশ হিতৈষী বন্ধুগণ তোমরা সচেষ্টিত হইয়া, এই অবলাবৃন্দকে পরিত্রাণ কর। হে ভূতভাবন ভগবান! আপনি কৃপাবন হইয়া আতরপ্রদানে কাতরা মহিলাগণকে ভীষণ ভব সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর।"[১৮]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী :

উনবিংশ শতাব্দীর লেখিকাদের মধ্যে ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা জুড়ে আছেন বেশ খানিকটা অংশ। এঁদের মধ্যে বর্তমানালোচ্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কিছু প্রবন্ধে তদানীন্তন সমাজ জীবনের অভিব্যক্তি পরিস্ফুটিত হয়েছে। বর্তমানে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর তিনখানি স্বল্পমাত্রারী দৈর্ঘের প্রবন্ধ এবং একখানি অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়াস রাখা হয়েছে। এগুলি হোলো যথাক্রমে 'স্ত্রী শিক্ষা' (ভারতী, আষাঢ়, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ), 'ইংরাজনিন্দা ও দেশানুরাগ ('ভারতী', শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ), 'কিণ্টারগার্টেন' ('ভারতী', চৈত্র ১২৮৮ বঙ্গাব্দ), এবং ভাউ সাহেবের বখর (অনুবাদ) ('ভারতী', মাঘ ১২৯০ বঙ্গাব্দ)।

উল্লিখিত প্রবন্ধ তিনখানির বিষয়বস্তু শিরোনামানুযায়ী স্পষ্টতঃ, নারী শিক্ষা, স্বদেশ ও রাজনীতি এবং বালক-বালিকার শিক্ষাপদ্ধতি যা তদানীন্তন সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লেখিকার স্বমত ব্যক্ত করবার প্রয়াস।

'স্ত্রীশিক্ষা অর্থাৎ নারী শিক্ষা বিষয়ে আলোড়ন ওঠে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মে-জুন মাসে বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর বেশ কিছু সময় অর্থাৎ অর্ধ শতাব্দী পরে লেখিকার রচিত 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এর পূর্বেও কয়েকজনের এ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায়। লেখিকাদের মধ্যে প্রসঙ্গত স্বর্ণকুমারী দেবীর নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে লেখিকা তাঁর স্বমতকেই প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা যিনি মেয়েদের বেশবাস, আচার-ব্যবহার, রুচি প্রভৃতি বিষয়ে পরিবর্তন আনবার ক্ষেত্রে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধে স্ত্রীলোকদিগের যথাযথ

পুরুষের সঙ্গিনী হবার নিমিত্ত শিক্ষাগ্রহণের বিষয়েই জোর দিয়েছেন। মূল বক্তব্য প্রবন্ধের প্রারম্ভেরই তিনি উল্লেখ করেছেন—

'…স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা দেওয়া উচিত কেননা তাহা না হইলে তাহারা পুরুষদের উপযুক্ত সঙ্গিনী হইতে পারে না।'[১৯]

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাপ্রদান যখন বিধেয় সাব্যস্ত হয়েছে তখন কিভাবে শিক্ষা দিলে তা সমাজের পক্ষে হিতকারী হবে এ বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব বিবেচনা-পূর্বক বিষয় নির্বাচন এবং এর কারণ স্বরূপ তিনি দু'টি বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

প্রথম : প্রস্তুত জমিতে যেমন সুস্বাদু ফল শস্যের বীজ বপন করা উচিত, তেমনি নারীদের শিক্ষাদানের সূচনাপর্ব থেকেই অতিরিক্ত যত্নশীল হওয়া উচিত এবং

দ্বিতীয় : এ বিষয়ে যত বিলম্ব হবে কুৎসিত পীড়াদায়ক ফুলের ন্যায় নানান কুশিক্ষা, কুসংস্কার নারীদের অন্তরে বাসা করে নেবে।

স্ত্রীলোকদিগের স্ব স্ব অবস্থায় কর্তব্য সাধনে সমর্থ হবার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করা প্রয়োজন। এই কারণেই তাদের গৃহের পরিপাঠ্য, পরিচ্ছাদাদির ব্যবস্থা, সাধ্যানুসারে গৃহস্থিত সকলের সুখবর্ধন, পীড়িতদের সেবা, আহারীয় দ্রব্য নির্ণয় ও প্রস্তুত এবং সন্তান পালন প্রভৃতি বিষয়গুলিকেই আলোচনা করে লেখিকা তাঁর প্রবন্ধকে সমৃদ্ধ করেছেন।

গৃহ পরিপাট্য সম্বন্ধে কলকাতাবাসিনী গৃহিণীদের অবশ্যই যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র তাঁদের কিছুটা শ্রমের দ্বারাই গৃহের সামগ্রী, উঠান, ফুল-ফল বাগান পরিষ্কার রাখা সম্ভব যা গৃহের শোভা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে। শুধু তাই নয়, তাঁদের স্বামী ও সন্তানদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষেও সাহায্যকারী। সারাদিন কারখানার রুদ্ধবায়ু, কোলাহল বা অফিসের নীরস, শিরঃপীড়াকর দলিল দস্তাবেজের মধ্য থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত বিরক্ত ব্যক্তি যদি গৃহে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে তামাক টানতে টানতে তার পরিচ্ছন্ন গৃহউঠান, সুন্দর ফুলের বাগানের দিকে তাকান তবে তাঁর ক্লান্তি নিমেষেই দূর হওয়া সম্ভব। এই কারণেই গৃহিণীদের এ বিষয়ের প্রতি যত্ন রাখা উচিত।

পরিচ্ছদের সুব্যবস্থা সূচিকর্মে পটুতা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এ কার্য বিষয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন।

গৃহস্থ কিছু সূচের কাজ গৃহিণীরাই করে নিতে পারে। ফলে কিছু আর্থিক সুরাহাও হয় এবং গৃহ শৃঙ্খলাও বজায় থাকে। যদিও ধনীদের দর্জি, চাকর রাখা সম্ভব হয়, কিন্তু এক্ষেত্রেও কিছু সূচি-বিদ্যা জানা আবশ্যক, তাহলে গৃহিণী পরিচ্ছদের বিষয় দর্জিকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষাদ্বারা নারীদের আচার-ব্যবহারকে মার্জিত করা সম্ভব। নারীগণের শিক্ষাকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত করতে হলে এর প্রতি যথেষ্ট যত্ন নিতে হবে। যেমন সাধ্যমত মিষ্টবাক্য, মিষ্টি ব্যবহার, গান-বাজনা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ।

লেখিকার ভাষায়,

"এ সকলেতেই কিছু কিছু শিক্ষা আবশ্যক বিশেষত পীড়িতদের সেবা, আহারীয় দ্রব্য নির্ণয় ও প্রস্তুত এবং সন্তান পালন এই তিনটি কাজ আমাদের আধুনিক সামাজিক অবস্থায় উত্তমরূপ শিক্ষা ভিন্ন কোন মতেই সুসম্পন্ন হইতে পারে না।"[২০]

ডাক্তার এসে রোগীর ঔষধ, পথ্য ও সেবা সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ দিয়ে যান তার কোন্‌টির কি উদ্দেশ্য তা না বুঝতে পারলে রোগীর পক্ষে বিপদ আনে, এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন একান্তই প্রয়োজন। গৃহিণীর দায়িত্ব এ বিষয়ে অধিক, তাই এ বিষয়ে তার শিক্ষাগ্রহণ একান্তই আবশ্যক।

বাঙ্গালী ভোজনপ্রিয়, তাই তার শরীর কখনও সুস্থ দেখা যায় না। এই কারণে স্ত্রীলোকদের রসায়ন বিদ্যা কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন বলে লেখিকা মনে করেন অর্থাৎ স্বাস্থের পক্ষে উপযোগী খাবার নির্ণয় ও প্রস্তুত করবার বিষয় জ্ঞান থাকলে গৃহিণী তাঁর স্বামী ও সন্তানকে ঐরূপ খাদ্য প্রদান করলে শরীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকা সম্ভব হবে।

সন্তান পালন স্ত্রীলোকদের জীবনের একটি বিশেষ এবং কঠিন কাজ। এর সুসিদ্ধি বা অসিদ্ধির উপর মায়ের নিজের, সন্তানের, দেশের ভাবী সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ নির্ভর করে। এই কারণে এ বিষয়ে মায়ের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। বিষয়টিকে আলোচনা করতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন, নানান কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বস্ত না হয়ে, ঈশ্বরের দোহাই না দিয়ে মাতা যদি তার শিশুর সুস্থ রাখবার জন্য আহার, পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবতী হন তবে অনেক মা তাঁর শিশুকে অকালে শুকিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। শিশুদের সুন্দর করে গড়তে গেলে পিতামাতা উভয়েই সহমত হওয়া প্রয়োজন।

"সন্তানের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে পিতামাতা একমত না হইলে এবং একনিয়মে কার্য্য না করিলে ইহা সুসিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। প্রতি মাতা সুশিক্ষিতা হইলেই তাঁর সন্তানেরা সুস্থ ও সুশিক্ষিত হইবে আর তাহা হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হইবে।"[২১]

লেখিকার দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকার, শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, সংখ্যায় প্রকাশিত একটু ভিন্ন স্বাদের প্রবন্ধ, 'ইংরাজ নিন্দা ও দেশানুরাগ'। এ প্রবন্ধে লেখিকা স্বদেশ সচেতনাকে জাগাবার জন্য মানুষজনকে আহ্বান করেছেন। প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন যে, আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য চিন্তা না করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুখভোগে বঞ্চিত হচ্ছি বলে ইংরাজদের নিন্দা করে থাকি। কিন্তু ইংরাজ জাতি যে মানসিক, শারীরিক কর্মদক্ষতার বলে বলীয়ান এবং যার ফলে এ জাতি আজ আমাদের দেশশাসন করছে, আমাদের দেশের রত্নভাণ্ডার ভোগ করছে, সে কর্মদক্ষতা বিষয়ে নিজেদের অবগত করে যদি আমরা তাদের সমকক্ষ হ'তে পারি তবেই আমাদের দেশ আমরাই শাসন করে সর্বসুখ ভোগের অধিকারী হতে পারব। অথচ সে বিষয়ে যত্নবান না হয়ে আমরা শুধু তাদের দোষ দিচ্ছি যে, ইংরাজরা দেশ পালন, শাসন, রক্ষণ, প্রভৃতি কার্য্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে। লেখিকার ভাষায়—

"···কোন রোগী, অপর কাহাকে আপন রোগের মূল স্থির করিয়া, তাহার স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া আপনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে ক্রমে তাহার যেরূপ সর্বনাশ উপস্থিত হয় আমাদেরও কি ঠিক তাহাই হইতেছে না? আমরা কি বিলক্ষণ মনোনিবেশপূর্বক ভাবিয়া পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ইংরাজেরাই আমাদের সকল অনর্থের মূল? তাহা হইলেও নিজ কষ্ট নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কি আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ নহে?"[২২]

ইংরাজগণের মধ্যে যে স্বজাতি পক্ষপাত এবং দেশীয়গণের প্রতি মমতা-শূন্যতাহেতু আমাদের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তার ক্ষতিপূরণ করা দেশীয়দের অর্থাৎ আমাদের পক্ষেই সম্ভব বলে লেখিকার মত। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি কয়েকটি মতামতের মধ্য দিয়ে তাঁর মতকে মজবুত করেছেন।

প্রথমত: ধনাভাব যা কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারাই নিবারণ করা সম্ভব: এর জন্য উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে সর্ব-প্রথমেই প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেককে একত্রিত হয়ে য'র যা

কিঞ্চিৎ অর্থ আছে সব একত্রিত করে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন এই দৃঢ় পণ করে কাজে নেমে পড়া।

তাহলেই সুফল পাওয়া সম্ভব হবে। কারণ,

"বাণিজ্য কি কৃষিকার্য্য এর কোনটিতে আজও কোন ইংরাজ আইনদ্বারা নিষিদ্ধ হয় নাই,......।"[২৩]

দ্বিতীয়ত : অবিচারের অত্যাচারের অর্থাৎ দেশের স্থানে স্থানে উপযুক্ত দেশীয় লোকদ্বারা পঞ্চায়েত সভা স্থাপন করে বিচার কার্য্য কিছুটা পরিমাণে নিজেদের হস্তগত করা। যে যে ক্ষেত্রে ইংরাজ কর্মচারীদের স্বজাতি পক্ষপাত বা দেশীয় রীতিনীতি বিষয়ে অজ্ঞতাহেতু দেশীয় লোক অন্যায়রূপে দণ্ডিত হলে তাকে এবং তার পরিবারকে প্রয়োজন যথাসাধ্য সাহায্য করা।

তৃতীয়ত : যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা। এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন লেখিকা। তাঁর মতে আমাদের ঐক্যবন্ধন প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধ হয়ে কলকাতা-বাসীদের মনোনীত সভ্যদ্বারা একটি সভা সংস্থাপিত করতে হবে। সভ্যরা কলকাতাকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি বিভাগের সর্বপ্রকার দায়িত্ব তাঁদেরই নির্বাচিত একজন অধ্যক্ষর উপর দেবেন। সভ্যদের উপর ভিন্ন ভিন্ন নামে স্বদায়িত্ব থাকবে—যেমন, স্বাস্থ্যরক্ষক সভ্য, জ্ঞানোন্নতি সাধক সভ্য, বাণিজ্য বিস্তারক সভ্য, কৃষি উৎকর্ষক সভ্য ইত্যাদি। সভায় অধ্যক্ষ প্রয়োজন মত সভ্যদের নানান সমস্যার বিষয়ে অবহিত করবেন এবং আলোচনার মধ্যদিয়ে তা সমাধানের প্রচেষ্টা হবে। এইরকম এক একটি সভা বাঙ্গলাদেশের প্রতি জেলার প্রধান শহরে স্থাপিত ও উক্ত-প্রকারে তার সভ্য মনোনীত হবে এবং মনোনীত সভ্যরা জেলার প্রতি গ্রামে একজন করে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করবেন।

গ্রামের অধ্যক্ষেরা তাঁদের নিজেদের গ্রামের বিভিন্ন বিষয় শহরের বিশেষ বিশেষ সভ্যকে জানাবেন। জেলার সভায় কোনো সভ্যের কোনো বিশেষ পরামর্শ বা সাহায্যের দরকার হলে কলকাতা মহাসভার যে সভ্যের উপর ঐ কার্য্যের ভার অর্পিত তাঁর কাছে নিবেদন করবেন। কলকাতা সভাস্থ সভ্যেরা নিবেদনটির প্রয়োজনীয়তা বিচার বিবেচনাপূর্বক সুবিধান করবেন। এভাবে

মতামত আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হবে। ক্রমশঃ এর বিস্তৃতি ঘটবে। বাঙ্গলাদেশে এরকম সভা সংস্থাপন হলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এর বিস্তৃতি ঘটবে। যদিও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভাষা-ভাষী, ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের বাস। কিন্তু ভারতের হিতের জন্য তাঁরা যখন এক হৃদয় হবে তখন তা কার্যকরী রূপ নেবেই। লেখিকার কলম তাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে—

"যেমন পিতামাতা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও সন্তানের কল্যাণার্থে এক সংকল্প হন, ভারতের ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন জাতিরা ভারতের হিতের জন্য তখন এক হৃদয় হইবে। যেমন হৃদয় হইতে শিরা সংযোগে সর্বশরীরে প্রাণ পোষক শোষিত সঞ্চালিত হয় তেমনি কলিকাতা মহাসভা হইতে স্বাধীন, উন্নত ভাব সকল সভ্য ও অধ্যক্ষগণ দ্বারা বাঙ্গলার সর্বত্র সঞ্চালিত হইয়া জাতীয় জীবন সঞ্চার, পোষণ ও বর্ধন করিবে। ভাব সকল যেমন যেমন বর্ধিত ও বিশুদ্ধ হইতে থাকিবে, জাতীয় দেহে তেমনি নূতন শ্রীর বিকাশ হইবে, ক্রমে দীর্ঘ পরাধীনতারূপ পক্ষাঘাতের অসাড়তা একেবারে দূর হইয়া সর্বাঙ্গ স্বাভাবিক স্ফূর্তিময় হইবে।"[২৪]

ধীরে ধীরে শোষণ মুক্ত হবার বাসনা এবং পরাধীনতার অত্যাচার প্রতিরোধ করবার মত দৃঢ়তা আমাদের মধ্যেই সঞ্চারিত হবে। তখন বিদেশী সরকার ভারতবাসীর প্রাপ্য অংশ অবশ্যই দেবে, না দিলেও ভারতবাসী অন্য উপায়ে অভিষ্ট সিদ্ধি করতে সক্ষম হবে। ফলে ভারতবাসী বিশ্বের দরবারে তাঁর স্থান করে নেবে। আত্মশিক্ষা ভারতবাসীকে কর্মক্ষম ও স্বনির্ভর করে তুলবে বলে লেখিকার মত,

"শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক, সামাজিক, সকল বিষয়েই উন্নতির পর উন্নতি সাধিত হইবে, ভারতবাসীরা স্বাধীন হইয়া উদ্যম ও উৎসাহে পূর্ণ হইবে।"[২৫]

যখন ভারতবাসী দেশীয় সভ্যদের শ্রম, যত্ন, আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করবে তখন তাঁদের প্রতি আপনা থেকেই শ্রদ্ধা জন্মিবে যার ফলস্বরূপ ঐক্যবন্ধন সিদ্ধ হবে, তারা এক স্বাধীন জাতি হবে। দেশীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা জন্মাইবার এই একমাত্র চাবিকাঠি। এরফলে দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের কাজে সকলে এগিয়ে আসবে।

সুতরাং আমাদের উৎকর্ষসাধন, অভাবমোচনের দায়িত্ব আমাদের হাতেই।

আমরা শুধুমাত্র সব বিষয়ে ইংরাজদের উপর দোষারোপ করি, কিন্তু একবার কি ভেবে দেখি যে, স্বজাতিপ্রীতি, ঐক্য, কঠোরশ্রম প্রভৃতির জোরেই ইংরাজ এই ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করেছে। ইংরেজরা দুর্গম পথ অতিক্রম করেই সুখভোগ করছে। তাই আমাদের ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অভিষ্ট সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আলস্য ত্যাগ করে নিজেদের কর্মমুখর করে তুলতে হবে।

"তথাপি আমরা যদি আমাদের নিজের জন্য দেশের লোকেদের জন্য আলস্যের মায়া কাটাইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইতে না পারি তবে ইংরাজদের নিন্দা করি কি বলিয়া ?"[২৬]

ইংরাজদের স্বজাতি প্রীতি, দেশীয়দের উপর অত্যাচারকে লেখিকা সমর্থন করেন। তাঁর মতে অভাবের তীব্রতা চেতনা সঞ্চার করে, ইংরাজরা আমাদের হয়ে যত কাজ করে দেবে ততই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমরা যেন ইংরাজ শাসন থেকে পাওয়া কিছু সুখ-সুবিধায় সন্তুষ্ট হয়ে তাদের হাতের পুতুল হয়ে না নাচি, তাদের অনুগ্রহ প্রার্থনায় সময়ের অপব্যয় না করে, নিজেদেরকে আরও হীন না করে, কায়মনবাক্যে কার্য্যারম্ভ করে আমাদের সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হই। লেখিকার মতে আমাদের জাতির উন্নতি আমাদের দ্বারাই সম্ভব,

"আমাদের জাতীয় যথার্থ স্থায়ী উন্নতি আমরা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।"[২৭]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরবর্তী যে প্রবন্ধটি আলোচিত হবে সেটি শিশু শিক্ষা বিষয়ক, শিরোনাম 'কিন্‌টারগার্টেন', প্রকাশিত হয়েছিল "ভারতী", চৈত্র ১২৮৮-বঙ্গাব্দ সংখ্যায়।

কিন্টারগার্টেন অর্থাৎ শৈশবকালে শিক্ষাগ্রহণের বিদ্যায়তন। একটি শিশু আট বৎসর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় শুধুমাত্র খেলা করে কাটিয়ে না দিয়ে কিছুটা সময় কিন্টারগার্টেন শিক্ষায়তনের মাধ্যমে লেখার ছলে প্রাথমিক শিক্ষার জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। প্রসঙ্গক্রমে লেখিকা ক্যামডেন হিল এ একটি কিন্টারগার্টেন এর উল্লেখ করেছেন। কিন্টারগার্টেন অর্থাৎ এ শিক্ষা প্রণালীর সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠা স্থান জার্মানি। ক্রমশঃ এর প্রচার লণ্ডনে এবং অন্যান্য স্থানে প্রসার লাভ করে।

উল্লিখিত স্থানের কিন্টারগার্টেনের বর্ণনা রেখেছেন লেখিকা—

"...তখন স্কুল চলিতেছে, আমরা গিয়ে ঘরের একপাশে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘরটি লণ্ডনের পক্ষে বেশ বড়, অনেকগুলি জানালা আছে। গ্রীষ্মকাল, তাই সকল জানালাই অৰ্দ্ধ উন্মুক্ত, জানালা দিয়ে নানাবর্ণের পাতা, ফুল, ফল, সবুজ ঘাসে ঢাকা উদ্যানভূমি দেখা যাইতেছে, ঘরের দেওয়ালে নানা জন্তু ও পাখীর রঞ্জিত চিত্র লাগান, একপাশে একটি পিয়ানো, একপাশে ছোট ছোট দু-তিনটি কাঁচের আলমারী আলমারীর ভিতরে শিশুদের হাতের কাজ, খেলনার সামগ্রী সকল অতি যত্নে রক্ষিত, সকলই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আলমারীর কাছাকাছি একটি জানালার সামনে একটি টেবিল, টেবিলের তিনদিকে ছোট ছোট বেঞ্চি পাতা, আর একদিকে শিক্ষয়িত্রীর চৌকি, ইহাতে সকল শিশুগুলিই শিক্ষয়িত্রীর চক্ষের সম্মুখে থাকে। ঘরের অধিকাংশ স্থান খালি পাড়িয়া আছে, বৃষ্টি বা ঐরূপ কোন কারণে বাগানে যাইবার প্রতিবন্ধক ঘটিলে দৌড়াদৌড়ি, ঘোরাফেরা, খেলাধূলা, সকল ঘরের ভিতরেই হয়। সবশুদ্ধ আটটি শিশু, ইহারা ১২টির অধিক লইতে চাহেন না।"[২৮]

শিক্ষয়িত্রীকে প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ভাষী হতে হবে। তাঁকে সর্বদা প্রসন্ন মুখে শিশুদের সঙ্গে মিশতে হবে এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিক্ষিকার স্নেহ শিশুদের সহজ হবার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে, ফলে শিশুরা আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে কাজ করবে।

শিশুর প্রতিটি কর্মক্ষম বৃত্তিকে তার আয়ত্তাধীন করে দেওয়া কিণ্টার-গার্টেনের উদ্দেশ্য, তাকে তার স্বল্প শক্তি অনুসারে খেলার মাধ্যমে এমন শিক্ষা প্রদান করা যা সে কখনও ভুলবে না, বরং তার মনে জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে তাকে আত্মশিক্ষায় সমর্থ করবে। কিণ্টারগার্টেনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ফ্রবেলের প্রণালীর সাহায্য নেবার কথা উল্লেখ করেছেন লেখিকা তাঁর এই প্রবন্ধে। ফ্রবেলের প্রণালীর অঙ্গস্বরূপ কয়েকটি খেলনার সাহায্যে কার্য্য ও ক্রীড়া একত্রীভূত করা অর্থাৎ ক্রীড়ার সামগ্রীর মধ্যে মন ও শরীর সঞ্চালনার উপযোগী গুণের প্রকল্প সম্ভব। এই খেলনাগুলি শৃঙ্খলের ন্যায় একটির সঙ্গে আর একটি সংযুক্ত, এক একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করলে ফল নষ্ট হয়, এই খেলনাগুলিকে ফ্রবেলের দান বলে।

প্রথম দান: গোলা, প্রত্যেক শিশুকে সম-আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গোলা দেওয়া হয়। গোলার একস্থানে গোলাটি ঝুলানোর জন্য

একগাছি সুতা বাঁধা। গোলাগুলি দিয়ে শিশুরা খেলার মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তারই উল্লেখ করেছেন লেখিকা।

দ্বিতীয় দান : একটি গোলক, ঘনাকৃতি ও নল। গোলার মাধ্যমে রং এবং স্থানের পরিবর্তনে শিশুদের মধ্যে যে প্রাথমিক ধারণা হয়, দ্বিতীয় দানের মাধ্যমে তার কিছুটা বিস্তৃতি ঘটে, এগুলির সাহায্যে শিশুরা খেলার মাধ্যমে জ্যামিতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

তৃতীয় দান : ছোট আটটি ঘনাকৃতির সাহায্যে শিশুর অঙ্ক ও গঠনের সুষমা বিষয়ে স্থায়ী শিক্ষালাভ হয়। ঘনাকৃতিগুলির সাহায্যে শিশুরা তাদের পরিচিত দ্রব্য—টেবিল, বেঞ্চ, দরজা, জানালা, সিঁড়ি প্রভৃতি নির্মাণ করতে শেখে।

চতুর্থদান : একটি ঘনাকৃতি, পূর্বের ঘনাকৃতির ন্যায় সম আয়তনের কিন্তু আটটি ছোট ছোট দীর্ঘ চতুরস্র (oblong) আকৃতির টুকরায় বিভক্ত। প্রতিটির দৈর্ঘ্য প্রসারের দ্বিগুণ এবং প্রসার গভীরতার দ্বিগুণ। এর সাহায্যে শিশুর রেখা ও পৃষ্ঠা সম্বন্ধে কতকগুলি নতুন জ্ঞান জন্মে।

এছাড়া আছে দু'টি দান—প্রথম, ছোট ছোট প্রায় ৩½ ইঞ্চি গোল কাঠি এবং দ্বিতীয়, ১০ ইঞ্চির কিছু অধিক লম্বা চ্যাপ্টা কাঠি। এই দানের কাজ অঙ্ক শিক্ষা, জ্যামিতির রেখাচিত্র প্রস্তুত এবং সেগুলি সম্বন্ধে শিশুর নতুন সত্য আবিষ্কার, নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কাঠিগুলিদিয়ে রেখার বোধ জন্মায় যার দ্বারা শিশুরা সীমান্তরেখা প্রস্তুত করতে এবং একাধিক কাঠির সাহায্যে ত্রিকোণ প্রভৃতি গঠন করা শিখবে।

গোলা, নল, কাঠির পর যে খেলনা আসবে তা হোলো বক্ররেখার। চক্রের আয়তন, তার কি ধাতুতে নির্মিত ও তার গুণাগুণ কি এ সমস্ত আলোচনা দিয়ে খেলা শুরু হয়। শিশুরা শেখে নলের তলভাগের আকৃতির নাম চক্র। চক্র, চক্রার্দ্ধ, চক্রখণ্ড দিয়ে তিনটি খেলা শেখানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ধরনের শিক্ষা যেহেতু হাতেকলমে, তাই এরফলে শিশুর মনোবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তাকে নিজের পর্য্যবেক্ষণ, তুলনা এবং ফল নির্দ্ধারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত হবার পক্ষে আত্মনির্ভরতার পথ দেখায়।

উল্লেখিত খেলনাগুলি কিণ্টারগার্টেনের এক অংশ যা শিশুর শিক্ষার সহায়ক যা শিশুদের হস্তের নৈপুণ্য শেখায়, কাজে আসক্তি জন্মাতে সাহায্য করে। বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তা সুনিয়মে নিয়মিত করে। ফ্রবেলের মতে,

"জানার সঙ্গে উদ্ভাবন, চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য অতীব আবশ্যক।"[২৯]

কিণ্টারগার্টেনের মাধ্যমে যে শিক্ষা পদ্ধতি তা শিশুর মনোবৃত্তি সর্বদাই সজাগ রাখতে সাহায্য করে বলে লেখিকার বিশ্বাস।

ফ্রবেলের প্রণালী বিষয়ে প্রধান লেখক B. Von Marenholtz Bulow বলেন,

"শৈশবের স্বাভাবিক চঞ্চল বৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া রাখা বা যথোপযুক্ত উত্তেজনা না করাতেই মানুষের মনে নবোদ্ভাবনী শক্তির অভাব ঘটে, স্বাধীন কার্য্যই স্বাধীন চিন্তা সৃষ্টি করে। কিণ্টারগার্টেনে, বুদ্ধির অরুণাভাস হইতেই এই প্রকার শিক্ষার সূত্রপাত হয়...।"[৩০]

এছাড়া বিনান অর্থাৎ কাগজের সরু লম্বা টুকরা দিয়ে বিনানি শেখানো হয় যার ফলে পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলার অভ্যাস হয়। বুনানি অর্থাৎ কতকগুলি কাগজের টুকরা একটি ফ্রেমের উপর আবদ্ধ থাকে, অন্য কতকগুলি টুকরা মিলিয়ে বোনা হয়। এরফলে শিশুরা চিত্রবিদ্যার একটু আভাস পায়। কাগজ ভাঁজ করা ও কাগজ কাটা এখানে শেখানো হয়। এ'টি জ্যামিতি শিক্ষায় সাহায্য করে।

উক্ত আলোচিত বিষয়গুলির মোটামুটি বিষদভাবে আলোচনান্তে লেখিকা কিণ্টারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। যেহেতু এ শিক্ষা গ্রহণের সময়সীমা আট বৎসর, সেই কারণে এ শিক্ষার সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তিনি মোটেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন নি। যদিও কিণ্টারগার্টেনের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান প্রণালী যথেষ্ট আনন্দদায়ক এবং বিজ্ঞানসম্মত, তাহলেও সময়সীমার স্বল্পতার কারণে শিশুর শিক্ষার আশানুরূপ অগ্রগতি হয় না বলেই লেখিকার বিশ্বাস।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচিত প্রবন্ধ ত্রয়ের আলোচনান্তে যে বিষয়টি স্পষ্টতঃ তা হোলো প্রবন্ধ তিনখানিই ভিন্ন স্বাদের, বিষয়বস্তুর ভিন্নতা থাকলেও রচনা-শৈলীর দৃঢ়তা লেখিকার প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় বলতে দ্বিধা নেই।

এরপর যে বিষয়ে আলোচ্য, তা হোলো লেখিকার রচনা অনুবাদ সাহিত্য, একটি মারাঠী ঐতিহাসিক গ্রন্থ,—"ভাউ সাহেবের বখর"। ১৭৮১ সালে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। লেখক, কৃষ্ণাজী শ্যামরাও। গ্রন্থটি পত্রাকারে লিখিত— সোরাপুরের জায়গিরদার বাঁকাপা নাইক দিলমুরকরের উদ্দেশ্যে লিখিত। লেখিকা গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। ভূমিকাতে লেখিকা-এর উল্লেখ করেন—

"আমি মূল মহারাষ্ট্রী গ্রন্থ হইতে যথাসাধ্য অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার রীতি সর্বত্র বিশুদ্ধ থাকে নাই। এই নিমিত্ত অনেক স্থলে কানে অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন। এই নিমিত্ত অনেক স্থলে অর্থবোধ হয় না।"

শ্রীমতি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।
অনুবাদিকা,
কারোয়ার।[৩১]

অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখিকার নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে এখানে। 'ভাউ সাহেবের বখর' ভারতী পত্রিকার, মাঘ, ১২৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মূল রচনাকার যেহেতু কৃষ্ণাজী শ্যামরাও, সেইকারণে বিষয়বস্তুর গভীরে যাবার প্রয়োজন ততটা নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার তো দূরের কথা, বলতে গেলে সূচনা হয়, এমতাবস্থায় লেখিকার সাহিত্যসৃষ্টির ধারা নানান দিকে প্রসারিত হওয়ার পরিচয় তাঁর এই অনুবাদ সাহিত্য। জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী ঠাকুর পরিবারের বধূ, তাঁর সাহিত্য কর্মের প্রসারতা এমনকি 'বালক' পত্রিকা সম্পাদনাকার্য ঠাকুর পরিবারের মর্যাদাই বাড়ায়। একশত বৎসর পূর্বে একজন গৃহবধূর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তাঁর লেখনীতে যা বাঙলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল দিক চিহ্নিত করে।

স্বর্ণকুমারী দেবী ঃ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী বিগত শতাব্দীর একজন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, যিনি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এ সম্মানের অধিকারিণী। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে তিনিই বোধ হয় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। তবে তাঁর রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের পুস্তক 'পৃথিবী' গুণগত দিক দিয়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং প্রশংসার দাবী রাখে। পুস্তকটির প্রকাশকাল ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন (২৭—সেপ্টেম্বর, ১৮৮২)।

'পৃথিবী' পুস্তকখানি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পুস্তক। পুস্তকখানিতে পৃথিবীর উৎপত্তি এবং কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত অবস্থা বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখিকা এই দীর্ঘ প্রবন্ধের যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। সৌর পরিবারবর্ত্তী পৃথিবী, পৃথিবীর গতি প্রণালী, পৃথিবীর উৎপত্তি, ভূ-পঞ্জরের কয়েকটি অবস্থা, ভূ-গর্ভ, পৃথিবীর পরিমাণ তৎসহ চারটি প্রস্তাবের বিশদ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে লেখিকা তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

যে চারটি প্রস্তাব লেখিকা তাঁর প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলি এক একটি যুগের বিস্তারিত বিবরণ—প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম প্রস্তাব অর্থাৎ প্রথম যুগে প্রারম্ভ বা ইনফ্রাসাইলুবিয়ান কাল, ক্যামব্রিয়ান কাল, সাইলুবিয়ান অস্তর যুগ, ডিবোরিয়ান বা লোহিত প্রস্তর যুগ, কারবনিফ রস বা অঙ্গারজনক অস্তর যুগ, পারমিয়ান অস্তর যুগ ইত্যাদির পর্যায়ক্রমে বিশদ আলোচনা রেখেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

দ্বিতীয় প্রস্তাব অর্থাৎ দ্বিতীয় যুগের উল্লেখে একে তিনভাগে যথাক্রমে ত্রিস্তর বা নূতন লোহিত প্রস্তর অস্তর যুগ (Trissic or new red period), জুরাসিক অস্তর যুগ (Jurassic), চাখড়ি বা ক্রিটেসস্ অস্তর যুগ (Cretaceous) এর বিষয় আলোচনা করেন।

তৃতীয় প্রস্তাব অর্থাৎ তৃতীয় যুগ পর্যায়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লয়েল-এর মতানুসারে তিনভাগে যথাক্রমে—ইয়োসিন অর্থাৎ বর্তমান সময়ে প্রারম্ভে অস্তর যুগ, মায়োসিন অর্থাৎ অল্পাধুনিক অস্তর যুগ এবং প্লায়োসিন অর্থাৎ অধিকাধুনিক অস্তর যুগ—এরূপভাবে ভাগ করে বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা রেখেছেন, যেখানে জীবজন্তুর পরিবর্তনের বিশদ তথ্যমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ প্রস্তাব অর্থাৎ চতুর্থ যুগের কাল তৃতীয় যুগের শেষ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত। এ যুগের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা বিস্তারিতভাবে যে বিষয়ের আলোচনা করেছেন তা হোলো, দু-একটি বিশেষ স্থানীয় ঘটনা ছাড়া পৃথিবীর সার্বভৌমিক বিশেষ কোন পরিবর্তন এ যুগে দৃষ্ট হয় না। বন্যা এবং হিমশৈলের কার্য্যই এ যুগের বিশেষ লক্ষণ এবং ইহা অপেক্ষাও এ-যুগের আর একটি বিশেষ লক্ষণ মনুষ্যের উৎপত্তি।

স্বর্ণকুমারী দেবী ১২৯১ থেকে ১৩০১—বঙ্গাব্দ এবং ১৩১৫ থেকে ১৩২১

বঙ্গাব্দ সময়ের জন্য 'ভারতী' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। 'ভারতী'-র বিভিন্ন সংখ্যায় তাঁর বেশ কিছু রচনা অর্থাৎ প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। যদিও 'ভারতী' পত্রিকার প্রারম্ভ থেকেই তাঁর বিভিন্ন লেখা পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে এবং 'পৃথিবী' দীর্ঘ প্রবন্ধটির বেশ কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'ভারতী' পত্রিকাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকল্পানুযায়ী ১২৮৪ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ মাসে (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদকীয় চক্রমধ্যে ছিলেন। এই কারণে, প্রথম থেকেই স্বর্ণকুমারী দেবী এই পত্রিকায় লিখতেন। 'পৃথিবী' প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় কোন কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার সঠিক তারিখ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকাশিত পুস্তকটিই আমার হাতে এসেছে। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখিকা যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে

প্রবন্ধের ভূমিকাতেই লেখিকা তাঁর বক্তব্য বলে দিয়েছেন। 'গণিত শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত বিজ্ঞানের অন্তরে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন ; নানা কারণবশতঃ অঙ্কশিক্ষাও সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, —বিজ্ঞান এইরূপ কষ্টসাধ্য বলিয়া ইহা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একরূপ আবদ্ধ। বিজ্ঞানের এইরূপ দুরূহ পথ সুগম করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা দেশে গণিতের সাহায্য ব্যতীত যেরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচার হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই প্রকার গ্রন্থের আদর্শানুসারে রচিত। পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের মনে প্রধানতঃ যে সকল প্রশ্ন উদিত হইতে পারে, তাহারি মীমাংসা-স্বরূপ, প্রচলিত বিজ্ঞানের উপদেশ অনুযায়ী সাধারণের পাঠোপযোগী কতকগুলি প্রবন্ধ, গত দুই বৎসরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও ভারতীতে প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। প্রধানতঃ নর্মান লকিয়ার, গডক্রে নিউকাম ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট ও ফিগুয়ের প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত, অপরাপর যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহা যথাস্থানে স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক সম্বন্ধে প্রধান অসুবিধা পারিভাষিক শব্দের অভাব। এ পুস্তকে, পূর্ববর্তী মহাশয়দিগের ব্যবহৃত শব্দ প্রায়ই গ্রহণ করা হইয়াছে—তবে দু-একটি প্রচলিত শব্দের স্থানে অন্য শব্দও

ব্যবহৃত হইয়াছে। সচরাচর অগ্ন্যুৎগারী পর্বত সকলকে আগ্নেয়গিরি বলিয়া উল্লিখিত হয়, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের জ্বালামুখী শব্দে যখন এ-অর্থটি আরো সুস্পষ্ট হয় তখন সে কথাটিও বা বঙ্গ ভাষায় চলিবে না কেন? ঐ উৎকৃষ্ট কথাটি বঙ্গভাষায় প্রবেশার্থী করিয়া এ পুস্তকে ব্যবহার করিতে সাহসী হইয়াছি। যে যে স্থানে পারিভাষিক শব্দের অপ্রতুল হইয়াছে সেই সেই স্থানে নতুন শব্দ রচনা করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। সকল নূতন রচিত কথাগুলি যে গৃহীত হইবে তাহা প্রত্যাশা করি না। জীব জগতেও যেমন শব্দ জগতেও তেমনি—যাহা যোগ্য তাহাই জীবিত থাকিবে। যদি বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলি, সকল ভাষায় একই রাখা যায়—তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং ভাষায় উন্নতি হয় দেখিয়া যে স্থানে মনোমত প্রতি শব্দ না পাওয়া গিয়াছে সে স্থানে ইংরাজি মূল শব্দই রাখা হইয়াছে। সচরাচর ইংরাজি জ্যোতিষিক পাঠ্যপুস্তকে বাস্তবিক পৃথিবী সচল এবং সূর্য্য স্থির বলিয়া দিয়া তাহার পর পৃথিবীকে স্থির অনুমান করিয়া, সূর্য্যের দৃশ্যতঃ গতি আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর গতিবিধি যথার্থরূপে বুঝিবার পক্ষে ধাঁধা লাগিতে পারে, সেজন্য এখানে পৃথিবীর বাস্তব গতি অবলম্বন করিয়াই অপর সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অঙ্ক বিদ্যার সাহায্য ছাড়িয়া কোন ইংরাজি গ্রন্থে ক্রান্তিপাতের গতি বুঝানো হইয়াছে এরূপ দেখিতে পাই নাই, এ পুস্তকে সে বিষয়ে যত্ন করা হইয়াছে, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।…।'

উপক্রমণিকাতে আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষিক উন্নতি সম্বন্ধে যে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশ শ্লোকই আমাদের অনুরোধে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সেই পরিশ্রমের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপকৃত রহিলাম।

১৮৮২, ২৭, সেপ্টেম্বর। স্বর্ণকুমারী দেবী।[৩২]

স্বর্ণকুমারী দেবীর এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'পৃথিবী' গ্রন্থটির বিষয়বস্তু এবং লেখিকার অভিমত থেকে স্পষ্টতঃ যে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের দরবারে লেখিকার এই প্রবন্ধ গ্রন্থ বিশেষ জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে অভিমত তদানীন্তন সময়ে প্রকাশিত হয় তার কিছু অংশ সংগ্রহ করা হয়েছে,।

The writer brings a great research and vast information to bear upon her book……The work does great credit to the writer. We have no hesitation in saying that this is the best book in popular Astronomy and Geology in Bengali Language.

(Thursday, May, 24, 1883, Statesman & Friend of India)[৩৩]

The book is written in a very clear and simple style…… It is perhaps the best book in Bengali on the subjects of which it treats. We have been simply charmed with the book, and with the research and careful study of the subjects which it displays.

(June, 28, 1883, Brahms Public Opinion)[৩৪]

পুস্তকখানি বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে একটি মহামূল্য রত্ন বলিয়া গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

(মে, ১৮৮৩, বামাবোধিনী পত্রিকা)[৩৫]

বঙ্গভাষায় সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, এই প্রথম রচিত হইল।… আমরা শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়দের এই পুস্তকখানি মাইনর ও নর্মাল পরীক্ষার একখানি পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট করিতে অনুরোধ করি।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)[৩৬]

উল্লিখিত মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট, স্বর্ণকুমারী দেবীর এই পুস্তকটির বিষয়বস্তু তদানীন্তন সময়ে আলোড়ন তুলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সাহিত্যের দরবারে এ সমস্ত উৎকৃষ্ট রচনা উপহার দিয়েই লেখিকা নিজের জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রসন্নময়ী দেবী :

কবি ও কথাশিল্পী প্রসন্নময়ী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। তাঁর গদ্য রচনার ভঙ্গি যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের জগতে একটি বিশেষ ধারায় প্রতিনিধিত্ব করেছে তা নিসংকোচে বলা

যেতে পারে। তাঁর রচিত গদ্যসাহিত্য 'তারাচরিত' প্রকাশিত হয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯১৭ সালে। 'তারাচরিত' মূলতঃ জীবনী-চরিত। প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর এই গ্রন্থে সুলেখিকা প্রিয়ম্বদা দেবীর স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে জীবনযুদ্ধে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ, তৎসঙ্গে তারাদাসের পুত্র তারাকুমারের জীবনপঞ্জী বলেছেন। গ্রন্থের শুরুতেই লেখিকা তারাদাসের পূর্বপুরুষের কথাও উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের স্থান কলকাতা ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড।

গ্রন্থটিতে লেখিকা পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট ঘটনা এবং নানান বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে লেখনীর দৃঢ়তা ও সম্পূর্ণতা এনেছেন। জীবনী গ্রন্থটির বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেখিকা প্রয়োজনমত কয়েকটি শিরোনাম দিয়েছেন, পিতৃ পরিচয়ের সঙ্গে তারাদাসের পাঠ জীবনের দরিদ্র অবস্থার কথা বর্ণনার পর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং সেই সূত্রেই মধ্যপ্রদেশের রায়পুর গমন। এখান থেকে শিরোনামের শুরু, যথাক্রমে—রায়পুর মধ্যপ্রদেশ, পাগড়ি ভাই, পিতৃবিয়োগ, মহারানীর জুবিলী, অষ্ট্রেলিয়ায় গমন, বিবাহ, বিচিত্র মকদ্দমা ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ, পীড়া, লোকান্তর, শিশু তারাকুমার। শিশু তারাকুমার শিরোনামে কয়েকটি উপ-শিরোনাম যথাক্রমে-রায়পুর ত্যাগ, দেবগৃহ, দার্জিলিং, মধুপুর, বালক তারাকুমার, গৃহে অধ্যয়ন, সেন্ট জেভিয়ার কলেজ, তারাবাস, সেন্ট জেভিয়ার ত্যাগ, তারাকুমার এবং শেষকথা সর্বশেষ উপ-শিরোনাম যেখানে তারাকুমারের পাঁচ বৎসর বয়সের কয়েকটি রচনা স্থান পেয়েছে।

নদীয়া জেলার অধীন দেবগ্রামের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়। গিরিশচন্দ্র আশৈশব দানে মুক্তহস্ত, দয়া ও চরিত্রগুণে নদীয়া জেলায় খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর দুই বিবাহ, প্রথমার একপুত্র ও এককন্যা। প্রথম স্ত্রী অতি অল্প বয়সেই পরলোকগমন করেন। তারপর তিনি শিরোমণি আনন্দচন্দ্রের অতিশয় নিষ্ঠাবতী কন্যাকে বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয়ার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন, মন ও গৃহশূন্য করে অনাথ পুত্রদের এবং একমাত্র কন্যাকে স্বামী হস্তে সমর্পণ করে দ্বিতীয় স্ত্রী স্বর্গে গেলেন। গিরিশচন্দ্র আবার পরিবার শূন্য সন্তানদের লালন-পালন করতে লাগলেন। তাঁর পঞ্চম পুত্র তারাদাস ছেলেবেলা থেকেই খুব দুরন্ত।

"পুরুষোচিত খেলায় তিনি গ্রামের মধ্যে অদ্বিতীয় ও দলপতি ছিলেন।"[৩৭]

তারাদাসের অসাধারণ মেধাশক্তি ও প্রখর বুদ্ধির জন্য তিনি বৎসরান্তে পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অনেক পুস্তক পুরস্কার নিয়ে আসতেন। দেবগ্রাম স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস করে জলপানী নিয়ে কৃষ্ণনগরে কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে লাগলেন। কিন্তু পিতা গিরিশ-চন্দ্রের ভাগ্য ভাঙ্গিল। কারণ, তাঁর অপরিমেয় দয়া। আর এই কারণেই তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। দারিদ্র্যের তাড়না, পিতার মানসিক ও দৈহিক সাংসারিক কষ্ট, তারাদাস বি. এ. পাস করে বি. এল. পড়তে পড়তে কৃষ্ণনগরের ব্রজবাবুর স্কুলে অতি সামান্য বেতনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। বি. এল. পাস হলে আদালতে যাওয়া আসা শুরু করলেন। কিন্তু উপার্জন ঠিকমত না হওয়ায় তিনি আন্দামান দ্বীপে চাকুরী গ্রহণের জন্য গোপনে আবেদন করলেন। বয়স কম ও কাজের অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য সে আবেদন অগ্রাহ্য হোলো। সৈনিক বিভাগে আবেদনও অগ্রাহ্য হোলো। সংসারের অচলাবস্থার জন্য পিতা বাধ্য হয়েই তারাদাসকে জব্বলপুরে চাকুরী গ্রহণের জন্য যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু এলাহাবাদ পর্য্যন্ত পৌছলে পিতার এক পত্র পেয়ে তিনি জব্বলপুর যাওয়া বন্ধ করে নাগপুর হয়ে রায়পুর যেতে মনস্থ করলেন এবং রায়পুরে খুবই কষ্টে পৌছলেন।

"দীর্ঘ পথ একপক্ষকালে অতিক্রম করিয়া বিবিধ বিচিত্র ঘটনা ও মনোরম দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া তিনি গম্যস্থান রায়পুরে আসিয়া পৌছিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার সেই আত্মীয় ডাক্তার অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজালয়ে লইয়া গেলেন।"[৩৮]

ধীরে ধীরে নিজের কর্মের গুণে তারাদাস মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সেক্রেটারী পদমর্যাদা পেলেন। এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মাতৃভাষা বাঙ্গলা ছাড়া সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী, উর্দ্দু, পার্শী, মারহাটি, মারোয়ারী, ছাত্রিশগড়ি, উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা শিখতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গীত চর্চা করতেন। খয়রাগড়ের রাজাবাহাদুরের সঙ্গে পাগড়ী বদল করে রাজা তাঁর সঙ্গে 'পাগড়ীভাই' সম্পর্ক পাতলেন এবং রাজার উপহারস্বরূপ একটি তেজী সুন্দর অশ্ব নিয়ে রায়পুরে ফিরলেন। তারাদাস জীবজন্তু খুব ভাল-বাসতেন। তিনি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর উপার্জনের অর্থ

পরিবারবর্গকে অকাতরে দিতেন। নিজের ব্যয়ের জন্য সামান্য কিছু অর্থ রেখে বাকি দীনদরিদ্র প্রবাসী বাঙ্গালীদের দান করতেন। নাগপুরের কমিশনার তাঁকে— '…সেক্রেটারি পদে বরণ করিলেন।'[৩৯]

এ সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হোলে, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমাদাসকে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিলেত পাঠালেন। মহারানী ভারতেশ্বরীর রাজত্বের পঞ্চাশবর্ষ পূর্ণ হলে ভারতব্যাপী যে উৎসব হয় রায়পুরে সেই সমারোহের পুরো দায়িত্ব তারাদাসের উপর দেওয়া হলে তিনি তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। দীর্ঘ সাত বৎসর ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে পাঠ শেষ করে তাঁর ভ্রাতা রায়পুরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরে কলকাতায় এসে ব্যবসা শুরু করেন। উমাদাসের কন্যা তারামণি।

এরপর কিছুদিনের মধ্যেই তারাদাস অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভ্রাতার চেষ্টাতেই নাসিকে কিছুদিন থাকবার পর তারাদাসের শরীরের উন্নতি হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় উমাদাস তাঁকে অস্ট্রেলিয়া পাঠালেন। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে তিনি রায়পুর ফিরলেন। এবার সংসারী হবার দিকে মন হলে, পাবনা গুনাইগাছা গ্রাম নিবাসী কুলীন শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকুমার বাগচী মহাশয়ের কন্যা 'বারেন্দ্রকুলতিলক কাপ কুলীনের চূড়ামণি' হরিপুরের চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিত্রী ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর (বি. এ. পাশ) সঙ্গে ৩৮।৩৯ বৎসর বয়সে রেজেষ্ট্রী করে বিবাহ করেন। বিবাহের দ্বিতীয় বর্ষে ১৮৯৪ সালের ১২ অক্টোবর, শুক্রবার সন্ধ্যা বিজয়া দশমীর পরের দিন তারাদাসের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল। পুত্রের নাম রাখলেন তারাকুমার।

তারাদাসের পরিবারের অনেক পোষ্য ছিল। অর্থ উপার্জনের পরিমাণও তাই বৃদ্ধি পেতে থাকল। মকদ্দমার বিবিধ চাপ, শরীরের ক্রমাগত অযত্নের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভ্রাতা উমাদাসের চেষ্টায় যদিও কিছুটা সুস্থ হলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই রায়পুরের বড় বড় ইংরাজগণের নিমন্ত্রণে শিকার করতে গিয়ে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুরারোগ্য ব্যাধি এবার তাঁকে ঘিরে ধরল, স্ত্রী সারাদিন রাত্রি শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কিন্তু,

'এত সেবা যত্ন ও চিকিৎসায় দুরারোগ্য ক্ষয়রোগের আর কোন উপশম দেখা গেল না। ক্রমশঃ অন্তিম সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৮৯৫

সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আট ঘটিকার সময় আত্মত্যাগী, উদারহৃদয়, স্বজন প্রতিপালক, সর্বজন প্রিয় বীর তারাদাস ৪২ বৎসর বয়স পূর্ণ হইতে না হইতেই অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।'[৪০]

তারাদাসের জীবনী চরিত এখানেই শেষ, এ জীবনী চরিত লিখতে গিয়ে লেখিকা তারাদাসের সমস্ত জীবনের সংগ্রামের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন,

'যে অজাতশত্রু যুবক ২১।২২ বৎসর বয়সে নিঃস্ব অবস্থায় একক বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রায়পুর আসিয়াছিলেন এবং পরে নিজ ক্ষমতাবলে ছত্রিশগড়ের সম্রাটবৎ ধন মান সুখ সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়াও যিনি সে সকল অতি তুচ্ছ জ্ঞানে সমগ্র জীবনে পরার্থে উৎসর্গ করিয়া জনসাধারণের হিতসাধনে আত্ম বিস্মৃত ছিলেন,...সেই অসমাপ্ত মহৎ জীবনের শেষ নিদর্শন ভস্মসাৎ হইয়া গেল।'[৪১]

তারাদাসের জীবন চরিত্রের সমাপ্তির পর লেখিকা তারাদাসের একমাত্র পুত্র তারাকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনের বর্ণনা করেন। পতিবিয়োগ বিধুরা প্রিয়ম্বদাদেবী শিশু তারাকুমারকে নিয়ে রায়পুর ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। এখানে তার শৈশবের শিক্ষা শুরু হয়। কিন্তু কলকাতার জলবায়ু শিশুর স্বাস্থ্যের উপযোগী না হওয়ায় তারাকুমারকে নিয়ে তিনি দেওঘরে চলে গেলেন। সেখান থেকে কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে ফিরলেও কলকাতার জলবায়ু তারাকুমারের শরীরের অবনতি ঘটাতে থাকায় আবার সুস্থ হবার জন্য তাকে নিয়ে প্রিয়ম্বদাদেবী দার্জিলিং চলে গেলেন। এখান থেকেও কিছুটা সুস্থ হয়ে ফিরলেও পুত্রের পুনরায় অসুস্থতার কারণে তাঁকে মধুপুর যেতে হোলো। কিন্তু এখানে থাকা সম্ভব হোলো না, একজন পাগলী মহিলার নজর পড়ল তারাকুমারের প্রতি, সে তাকে নিজের ছেলে মনে করে বারবার চুরি করে নিয়ে যাবার চেষ্টা কবতে লাগল। এই ভয়েই ভীত হয়ে প্রিয়ম্বদাদেবী মধুপুর পরিত্যাগ করলেন।

বালক তারাকুমারের তিন বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই মিশনারী মহিলাদের আগ্রহে তাকে প্রিয়ম্বদাদেবী 'কিন্টারগার্টেন' স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু এক বৎসর পরে তারাকুমারকে 'কিন্টারগার্টেন' স্কুল ছাড়িয়ে গৃহেই পড়াবার ব্যবস্থা হয়। সাত বছর বয়সে তাকে সেন্টজেভিয়ার কলেজের দ্বিতীয় ষ্টাণ্ডারে ভর্তি করা হয়। এখানে কিছুদিন পড়াশুনা করবার পর তাকে

বেনারসে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। কিন্তু এখানে আর তারাকুমারের বেশীদিন পড়া হলো না, বেনারসে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে মাত্র বাইশদিন অবস্থানের পর দুরন্ত বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র সাত-আট ঘণ্টার মধ্যে তার মৃত্যু হয়।

"মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র এগার বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে সে বাঙ্গলা, ইংরাজী, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং সংস্কৃত ভাষা অনায়াসে পাঠ করিত।"[৪২]

শেষকথা অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায়ে লেখিকা শিশু তারাকুমারের পাঁচ বছরের কয়েকটি রচনা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হোলো, 'বুড়াবুড়ি', 'আমার বন্ধু' (ইংরাজী কবিতার অনুবাদ), তারামণি, ফরাসী অনুবাদ।

'আমার বন্ধু' এই ইংরাজী কবিতার অনুবাদ তারাকুমারের সাড়ে দশ বছরের লেখা। 'তারামণি'—রচনায় তারাকুমার তার কাকা উমাদাসের কন্যা সম্পর্কে তার দিদি তারামণির জীবনকথা বর্ণনা করেছে। তারামণির মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের দু'মাস পরে দারুণ রোগে তারামণি মারা যায়। দিদির এই অকাল মৃত্যুর বিচ্ছেদবেদনা তারাকুমারের মনে যে আঘাত হানে তারই অভিব্যক্তি 'তারামণি'—।

তারাকুমারের দশ বৎসর বয়সের ফরাসী অনুবাদের অংশ তুলে ধরা হোলো।

"অরুণোদয়ে ও বিহঙ্গসঙ্গীতে নিদ্রিত পৃথিবী যখন জাগ্রত হইয়া উঠে তখন তাহার সেই প্রাতঃশোভায় নয়নমন মুগ্ধ হইয়া যায় ও বালকের মনে ঈশ্বর প্রেমের সঞ্চার করে। সেই সময় শয্যায় শয়ন করিয়া না থাকিয়া, হে বালকগণ, আপন পাঠে মনোনিবেশ করিবে। এক মুহূর্তও হেলায় হারাইবে না। ভগবানের দয়ায় আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা উপভোগ করিয়া নিজ নিজ জীবন সার্থক করিলেই সব সার্থক হইয়া যাইবে। শৈশবে সময় থাকিতে আমরা যাহা শিখিয়া লইব, যাহা অর্জন করিব, যৌবনে তাহার পূর্ণতালাভ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবন আনন্দ প্রাপ্ত হইব।"

(বয়স ১০ বৎসর, তারাবাস-বালিগঞ্জ)। তারা চরিত পৃঃ ১১২-১১৩

প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর এই জীবনচরিত : গ্রন্থটিতে তিন তারা, যথাক্রমে—তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারামণির জীবনের

কথা লিখেছেন। এই তিন তারার জীবনেই কিছুটা উল্লেখ্য দিক আছে। যেমন, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৈশোর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দারিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠালাভ সঙ্গে পরার্থে সেবার কথা। তারাকুমার শিশু, তার আয়ুষ্কাল মাত্র সাড়ে এগার বৎসর, কিন্তু এই স্বল্প সময়েই তার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তার লেখনীর মধ্যে। তারামণির মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে জীবন সংসারে প্রবেশ করতে না করতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। এই তিন তারা অর্থাৎ তারাদাস, তারাকুমার, তারামণি সবাই একই পরিবারভুক্ত কিন্তু তিনটি জীবনেরই পরিসমাপ্তি অকালে। লেখিকা পর্যায়ক্রমে যেভাবে এই জীবনী চরিত্রের বিন্যাস করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে এবং গ্রন্থটির নামকরণ 'তারাচরিত' সার্থকতালাভ করেছে।

শরৎকুমারী চৌধুরানী :

শরৎকুমারী চৌধুরানীর বহু রচনা উনবিংশ শতাব্দীর কিছু সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করে আছে। এগুলি হোলো 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকা। এইসব পত্রিকায় শরৎকুমারী দেবীর সাহিত্যের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর রচিত গদ্য-সাহিত্যের বিষয়বস্তু বিস্তারের পরিধি বহুমুখী যেখানে নারীর নানান সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য রম্যরচনাগুলি, 'সোনার-ঝিনুক', 'যৌতুক', 'কলিকাতার স্ত্রী সমাজ', 'শাশুড়ি ও বৌ', 'একাল ও একালের মেয়ে', 'কন্যাদায়', 'আদরের না অনাদরের' এবং 'মেয়ে যজ্ঞি'।

উল্লিখিত আটটি গদ্যসাহিত্যের শিরোনামগুলি থেকে বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা প্রকাশ পায়। এছাড়া একটি বিষয় সুস্পষ্ট তা হোলো, শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু নারী সমাজ। নারীসমাজের নানান সমস্যা, বঞ্চনা, প্রতিবাদী ভাষা নানান ভাবেই ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর লেখনীতে। এই সমস্ত গদ্যসাহিত্যের মধ্য দিয়েই তিনি বলতে চেয়েছেন সমাজের নারীর কথা যেখানে যৌতুকের ত্রুটির ফলে যাতনা ভোগ করতে হয় বধূকে, কন্যাদায় গ্রস্ত পিতার অক্ষমতায় কন্যাকে সহ্য করতে হয় নানান ধরনের মানসিক নির্যাতন। সমাজে কন্যাসন্তান থাকে অবহেলিত।

'কলিকাতার স্ত্রী সমাজ', ১২৮৮ বঙ্গাব্দ 'ভারতী' পত্রিকার যথাক্রমে ভাদ্র, কার্ত্তিক সংখ্যায় 'শাশুড়ি-বৌ' ১২৯৮ বঙ্গাব্দ 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায়; 'একাল ও একালের-মেয়ে', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার আশ্বিন ও কার্ত্তিক এবং মাঘ সংখ্যায়; 'আদরের না অনাদরের', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ 'সাধনা' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায়; 'মেয়ে যজ্ঞি', ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, 'ভারতী' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায়; 'যৌতুক', ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ, পৌষ সংখ্যায়; 'সোনার ঝিনুক', ১৩২৮ বঙ্গাব্দ 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

উল্লিখিত রচনাগুলিতে শরৎকুমারী দেবী কয়েকটি ছোট ছোট এবং খুবই সাধারণ চলতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন ছাত্রীসমাজকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। 'কলিকাতার স্ত্রী সমাজ' রচনাটি একটি পত্রের বয়ানে লেখা। লেখিকা প্রবন্ধের শুরুতেই কলকাতার মহিলাদের মজলিস এই উপস্থাপনা করেছেন,

"আমার ইচ্ছে যে তোমাকে একবার আমাদের মেয়ে মজলিসটা দেখাই।"[৪৩]

মেয়েদের মজলিস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, মেয়ে মজলিস দেখতে হলে মেয়েদের পোষাক-আষাক, আলাপ-আলোচনা, প্রভৃতির ধরন একটা মজলিসের মধ্যেই পাওয়া যাবে না। কারণ যুবতী, মধ্যবয়স্কা রমণীদের প্রত্যেকের মধ্যেই পোষাক, আলাপ আলোচনার রকম ভেদ লক্ষণীয়। কলকাতার যুবতী নারীদের পোষাকের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা নিমন্ত্রণ বাড়ীর নিমন্ত্রিত মেয়েদের পোষাকের উল্লেখ করেছেন,

'...তারা সব এক একটা বিশ্রী ওড়না মাথায় দিয়েছে তার ভিতরে একজন কোমর থেকে বোধ হয় একহাত ওসারের একটা মোটা কাপড় পরেছে—একজন হাঁটু পর্যন্ত আর একজন বেশ পা পর্য্যন্ত পরেছে। যেমন বাঙ্গালির মেয়েরা শাড়ি পরে তেমনি ক'রে আঁচলটা কাঁধে ফেলে একটা ক'রে কোমরবন্ধ পরেছে।...তারপর অন্য বাড়ির নিমন্ত্রিতদের দেখতে লাগলাম—কারো গায়ে জামা আছে—কারো গায়ে নেই—কেহ বা পুরুষদের মত চায়না কোট পরেছে কেহ বা ছেলেদের মত ঢলঢলে জামা পরেছে—কারো বা বেশ ভাল মেয়েলি জামা কিন্তু বেশীর ভাগই চায়না-কোট পরা।'[৪৪]

পোষাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখিকা আরো রসিয়ে বলেছেন,

'একটা ভারী মজার পোষাক দেখলেম। একটি ছোট মেয়ে বোধ হয় বয়স আন্দাজ ৮।৯ বৎসর, একখানি বেশ ঢাকাই সাড়ি পরেছে আর তার উপর একটা শার্টিনের গাউন পরেছে—তাও আবার উল্টো, . ।'[৪৫]

এইসব নানান পোষাকে সজ্জিতা নানান বয়সের রমণীগণ যত্নের বিষয়েও বেশ সচেতন। কারণ যখন খাবারের ডাক পড়ল তখন তারা তাদের বহুমূল্য জরীর, বেনারসী ইত্যাদি পোষাক ছেড়ে সুতোর কাপড় পড়ে খেতে গেল।

লেখিকা এবার মেয়েদের মজলিসে যে গল্পগুজব হচ্ছিল তার প্রতি মনোযোগী হলেন। নানান রকমের ঘর-সংসারের গল্পে বামা-কণ্ঠ মুখরিত করেছে মজলিস। যথা—অৰ্দ্ধ বয়সী মহিলাদের মধ্যে তাদের মেয়ের বিয়ে, ছেলের ব্যারাম, আতিথ্য রক্ষা করবার প্রতি সচেতনতা নিয়ে চলল বাক্যালাপ। যুবতীদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু আরো ভিন্ন স্বাদের যুবতীরা স্বামীর কথা নিয়ে ব্যস্ত, এমনকি স্বামীকে বশ করবার ঔষধের সন্ধান দেওয়া-নেওয়া পর্যন্ত। শাশুড়ী-ননদের কথা ওঠে না সেখানে। অবশ্য পড়াশুনার কথা একটু-আধটু ওঠে না যে তা নয়, যেমন ;

"অমুক বই পড়েছ—অমুক বয়ের অমুক জায়গাটা পড়লে খুব কান্না পায়…।"[৪৬]

বৃদ্ধদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু আবার আলাদা ধরনের, তাদের গল্প শুধু রান্না খাবার আর পাড়ার বৌ ঝিয়ের নিন্দে,

"দেখ দেখ একটা হজের চাপকান পড়া বৌ দেখ-মা! কালে কালে কতই হবে।"[৪৭]

লেখিকা এবার এলেন খাবার দৃশ্য বর্ণনায়। নিমন্ত্রিত বাড়ীতে খাবার সময় লুচি তোলা পদ্ধতি অর্থাৎ নিমন্ত্রণ বাড়ীতে খেতে বসে যথেষ্ট খাবার পরও বাড়ীর জন্য আলাদা করে খাবার নিয়ে যাওয়া, এ খাবার সামগ্রী তারা খাবার ফাঁকেই আলাদা তুলে রাখে। এই লুচি তোলা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"যা হোক্ খেতে গেলুম। দেখলুম লুচি—তোলা পদ্ধতি একটু কমেছে।"[৪৮]

দু-তিন বছর পূর্বেও এ-পদ্ধতি পুরোদমে বহাল ছিল তারও উল্লেখ রেখেছেন তদানীন্তন একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে। খাবার শেষে নিমন্ত্রণ বাড়ীর গিন্নীর দর্শন দেওয়ার রীতি আছে। নিমন্ত্রিতদের আমন্ত্রণ করবার রীতি আছে।

"নিমন্ত্রিতদের ঐ বাঁধা আদর আছে—পাল্কি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া,

খাবার সময় ডেকে নিয়ে যাওয়া—আর খাবার শেষে গিন্নির দর্শন দেওয়া এই চূড়ান্ত আদর…এক এক বাড়িতে বেশ খোজ-খবর নেয়—তারা নিমন্ত্রিতদের দেখে বেশ আমোদ পায় বলে বোঝা যায়, কিন্তু এক এক বাড়ির ভাব দেখে মনে হয় যেন তাঁরা নিমন্ত্রণ করে নিমন্ত্রিতদের চরিতার্থ করেছেন।"[৪৯]

খাবার শেষে পাল্কি করে যাবার ব্যাপারেও গোলোযোগ, কে কার আগে যাবে। এখানেও পক্ষপাতিত্ব।

"আত্মীয় কুটুম্বর মেয়েদের যাবার সময় বাড়ির ভিতর থেকে গিন্নি হুকুম করে পাঠালেন, "বাগবাজারে ক্ষীরোর শশুর বাড়ির জন্য একখানা পাল্কি ক'রে দিতে বল।" কর্তা অমনি একখানা পাল্কি ধরে রেখে চেঁচাতে লাগলেন—"ওরে রামা, বাগবাজারের সোয়ারী ডেকে দে।" ঝম ঝম করে বাগ-বাজারের সোয়ারা এলেন—পিছনে দাসীর মাথায় একটা বড় সড় রকম পুঁটলী-কারণ, অবিশ্যি, ।"[৫০]

যাঁরা মেয়ের বাড়ির কুটুম্ব নয় তাঁরা কেউ বা বাচ্চা ছেলে ঘরে রয়েছে, ছেলের অসুখ, নূতন জামাই আসবে, ইত্যাদি নানান বাহানা দিয়ে য· তাড়াতাড়ি সম্ভব পাল্কি দখল নিচ্ছেন। লেখিকা এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

"পাল্কি নিয়ে টানাটানি যে কি বিষম ব্যাপার তা আর তোমায় কি বোলবো। বাড়িতে শাশুড়ি যদি বৌয়ের গলার স্বরটি শুনতে পান তো রেগে বাড়ি মাথায় করেন—কিন্তু পাল্কিতে উঠবার সময় যদি সেই বৌয়ের গলা শোনেন—তা বৌয়ের কিছুমাত্র লজ্জার ত্রুটি দেখেন না,…বরং বৌকে পাল্কি [illegible]বার জন্য চেঁচামেচি করতে উত্তেজনা করা হয়।"[৫১]

পাল্কির বিষয়টা এতই জরুরী যে, আপনপর বিবেচনা বোধও কমে যায়। নিজের পাল্কি থাকা সত্ত্বেও লেখিকাকে দেরী করে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। কারণ, পাল্কি কম থাকায় গিন্নী লেখিকার পাল্কিতেই তাঁর কুটুম্বকে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করেন, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ লেখিকাকে বাড়ি ফিরবার সময় জোর করে সঙ্গে একটি 'সরা' দিয়ে দেন।

অন্য একটি বৌ-ভাত বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরৎকুমারী দেবী তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। এখানে অন্য একদল মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন। নতুন বৌ দেখতে গিয়ে নতুন বৌ-এর প্রতি দিদি শাশুড়ির ঝংকার কানে এলো তাঁর।

'···ওরে বৌ ভাল করে বস্—এখনি বাবুরা যৌতুক করতে আসবেন।' "বৌ যে তার চেয়ে কি ক'রে ভাল হয়ে বসবে তা সে কোন মতেই ভেবে পায়না।"[৫২]

বাবুরা যৌতুক করতে যখন এলেন, তখন কেবল মাত্র গিন্নী বৌ নিয়ে জেঁকে বসলেন, আর সব মেয়েরা সেখান থেকে উঠে গিয়ে আড়াল থেকে বাবুদের যৌতুক পরিদর্শন করতে লাগল, সঙ্গে কে কার জামাই, কর্তা, এ নিয়ে বেশ মুখরোচক আলোচনা চলতে লাগল।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একটি মেয়ের দলকে লেখিকার ভাল লাগল, যাদের পোষাকে বিবিয়ানা ছিল, খাবার পর তারা নিজেদের মধ্যে গানের আসর বসিয়ে দিল। শেষ পর্যায়ে লেখিকা শাশুড়ি দলের প্রসঙ্গে দোষারোপ করেছেন, বৌকে নানান ভাবে বিড়ম্বনা ভোগের পিছনে শাশুড়িই কারণ মনে করেছেন। কিন্তু রচনা শেষ করবার মুখে এসে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে স্পষ্টতঃ পুরুষরাই স্ত্রীলোকদের সুশ্রী-অসুশ্রী ভাবে চলবার ক্ষেত্রে দায়ী।

"···আজও পুরুষদের মধ্যে এমন অসভ্য আছে। পুরুষরা যদি মেয়েদের ভাল কাপড় চোপড় প'রতে বলেন তা হলে তারা নিশ্চয়ই পরে। অনেকের নিজের ইচ্ছা সত্বেও সে খালি হয়ত স্বামীর জন্যে পরে না। ···পুরুষরা সভ্য না হলে আর মেয়েরা কি করবে বল—তাদের আর একলা দোষ কি করে দেব ?"[৫৩]

১২৯৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা, পত্রিকা 'ভারতী ও বালক' শরৎকুমারী চৌধুরানী দেবীর মেয়েদের বিষয় নিয়ে যে বাস্তবধর্মী রচনা প্রকাশিত হয় তার শিরোনাম 'শ্বাশুড়ি-বৌ।' কিছু টুকরো টুকরো পরিস্থিতির উল্লেখের মধ্য দিয়ে, তদানীন্তন সময়ে শ্বাশুড়ী-বৌ এর মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠত, তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াসী হয়েছেন লেখিকা।

শুরুতেই তিনি বলেছেন, একালের শ্বাশুড়িরা বৌ-এর প্রতি বড়ই উষ্মা। তাদের ধারণা বৌ ঘরে এলেই ছেলে পর হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেনা-পাওনার বিষয়ে ঘাটতি হলে বৌ-এর উপর শ্বাশুড়ির অসন্তুষ্টির পরিমাণ যেন বেড়েই যায়। কিন্তু বৌ-এর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলতে গেলে বেশীর ভাগ শ্বাশুড়িকেই দেখা যায় না। এরফলে বৌ-এর শ্বাশুড়ির প্রতি ভয় ছাড়া কিছুই জন্মায় না। কিন্তু শ্বাশুড়ি যদি পুত্রবধূর প্রতি একটু

সহানুভূতিশীল হোতো, তাকে নিজের কন্যার মত মনে করত এবং সেইমত ব্যবহার করত তবে বোধহয় শাশুড়ি-বৌ-এর বিরোধ বলে কথাটা থাকত না। প্রসঙ্গক্রমে লেখিকা মহাভারতের কুন্তী চরিত্রের ন্যায় শাশুড়িদের হবার কথা বলেন। "...কেন সকলে, কুন্তীর ন্যায় শাশুড়ি হন না? মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহের পর "মঙ্গলসূত্রধারিণী অবকুণ্ঠনবতী দ্রৌপদী শ্বশ্রূকে অভিবাদন পূর্বক কৃতাঞ্জলীপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলে" কুন্তী আশীর্বাদ করিলেন—'বৎস ইন্দ্রানী ইন্দ্রের প্রতি, স্বাহা বিভাবসুর প্রতি, রোহিনী চন্দ্রের প্রতি, দময়ন্তী নলের প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, অরুন্ধতি বশিষ্টের প্রতি এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমতী প্রণয়বতী হইয়াছেন তুমিও ভর্তৃগণের প্রতি তদনুরূপ হও —হে ভদ্রে, তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামী সহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না। ...অশ্বমেধযজ্ঞে স্বামীদিগের বল বিক্রমার্জিত বসুমতী বিপ্রসাৎ করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শতশত বৎসর পরম সুখে কালযাপন করিবে।'[৩৪]

কিন্তু একালের শাশুড়ি বৌ-কে এভাবে কখনই আশীর্বাদ করেন না। একটি মেয়ে যখন তার বাপের বাড়ির নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করে তখন ক'জন শাশুড়ি বধূকে গৃহলক্ষ্মীভাবে গ্রহণ করেন? বধূকে আপন করে নেবার দায়িত্বতো তারই। সেই মেয়েটি যখন নিজের মায়ের কাছে যাবে বলে কান্নাকাটি করে তখন—'আমি যে তোমার একটি মা', বলে কোনো শাশুড়ি যদি ঐ ছোট পুত্রবধূকে কাছে টেনে নেন তবে কি বৌ তার মমতাবন্ধনে ধরা দেবে না। অনেক শাশুড়ি পুত্র-পুত্রবধূর মিলন পছন্দ করেন না, তার মনে সর্বদাই শঙ্কা ছেলে বুঝি পর হ'য়ে গেল।

আমাদের দেশে সাধারণত আট থেকে বারো বছরের মেয়েদের বিবাহ হয়। ছোট বৌ, তার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও শাশুড়ি উদাসীন। এ ব্যাপার ছোট মেয়ের মনে আঘাত হানে, তার মনে হয় যে তার মা-বাবা তাকে কত আদর করে খাওয়াতেন। শ্বশুর বাড়ির উদাসীনতা তাকে তার মা-বাবার প্রতি আরো অভিমানী করে তোলে, কেবলি তার মনে হয়, কেন তার মা-বাবা তাকে বিয়ে দিয়ে পর করে দিলেন। নববধূ অবস্থায় বর বধূকে একটু যত্ন করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শাশুড়ির বাড়াবাড়ি মনে হয়।

'অনেক মাতা পুত্রকে লাজুক ভাবিয়া এবং পুত্রবধূ হইতে পৃথক শয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেখিয়া আনন্দিত হয়েন।"[৫৫]

এক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে, শাশুড়ি ঠাকুরণ বৌ-এর প্রতি বিশেষভাবে উদাসীন। ছেলেদের শ্বশুড়বাড়িতে জামাই আদর, আর মেয়েদের শ্বশুরালয়ে প্রচণ্ড অনাদর, এ পদ্ধতি চলে আসছে। আর সেই কারণেই মেয়েরা শ্বশুর বাড়ি মোটেই পছন্দ করে না। শাশুড়ি-জামাইয়ের সম্বন্ধ যেমন মধুর, তেমনি শাশুড়ি-বধূর সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও যদি শাশুড়িবধূকে স্নেহ করেন তবে বধূও শ্রদ্ধা করবে। কিন্তু তা বড় একটা হয় না।

নবীন যৌবনে বধূ স্বামীর কাছাকাছি থাকতে চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে শাশুড়ি বাধ সাধেন। স্বামীর সঙ্গে সারাদিন না হোক্ রাত্রে দেখা হবে, কিন্তু সমস্ত দিন পরে পুত্র বাড়িতে পদার্পণ করা মাত্রই, মা-বৌয়ের নানান দোষ কীর্তন করতে আরম্ভ করে, এর ফলে রাত্রের মিলন মধুর হবার ক্ষেত্রে বাধা পায়। এই কারণে মেয়েটি তার বাপের বাড়ী যাবার জন্য ছটফট করে। কিন্তু সেখানেও নিশ্চিন্ত নয়, শাশুড়ি দিন বেঁধে দেবেন,

' দেখো গো বড় মানুষের মেয়ে যেন আটদিন সওয়ার নয়দিন হয় না, তা হোলে এ জন্মে আর হরি ঘোষের বাড়িমুখো হ'তে দেবো না। "বিদায়ের প্রণামের আশির্বাদের পরিবর্তে এই সরোষ আদেশে তাহার বাপের বাড়ি যাবার আনন্দ কমিয়া যায়।"[৫৬]

কিন্তু শাশুড়ি বধূর মধ্যে যদি স্নেহের সম্বন্ধ থাকত তবে বধূরা শ্বশুরালয়ে যাবার সময় চিরপ্রচলিত কান্নার পরিবর্তে হাসতে হাসতে যেতো। লেখিকা মহাভারতের কুন্তী চরিত্রকে আদর্শ শাশুড়িরূপে তুলে ধরেছেন। বালিকা পুত্রবধূর কোন কাজ করবার ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ পেলে শাশুড়ির মুখে শোনা যায়,

"..." তুমি কেমন ঘরের মেয়ে মা, কিছু জান না—আর তোমার মা-ই বা কেমন যে কাজ কর্ম কিছু শেখাননি।" বধূকে শিক্ষা দেওয়া যেন তাঁহার কাজ নহে। বধূ বাপের বাড়ি হইতে সকল শিখিয়া আসিয়া তাঁহার ঘরে দাসীর মত যদি খাটে তবে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন।"[৫৭]

অথচ কুন্তী কিন্তু দু'চার কথায় দ্রৌপদীকে বধূর কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। দ্রৌপদীকে কুন্তী অত্যন্ত স্নেহ করতেন, আর সেই কারণেই দ্রৌপদীও তাঁকে

তেমনি ভক্তি করতেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কীচক বধের জন্ত ভীমকে উত্তেজিত করবার সময় দ্রৌপদী বলেছিলেন,

"আর এই একটী দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে আমি আর্যা কুন্তী ব্যাতিরেকে কদাচ কাহারও গাত্র-বিলেপন পোষণ করি নাই।"[৫৮]

শ্বশ্রূ-বধূতে মাতৃভাব কথাটা খুবই মধুর। তাই লেখিকা দ্রৌপদীর একটি উক্তি ব্যবহার করেছেন, "আমি আর্যা কুন্তী ও তোমাদিগকে কখনো ভয় করি নাই।" শাশুড়িকে ভয় না করা কথাটা বধূর কাছে নতুন হলেও খুবই মধুর আর এক্ষেত্রে কার্যকারীরূপ দেবার ক্ষেত্রে শাশুড়িকেই মাতৃভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। পুত্রবধূকে কন্যার ন্যায় কাছে টেনে নিতে হবে, তার দোষকে বড় করে না দেখে তার সমস্ত কাজে সহমর্মী হলে তবেই শাশুড়ি—বৌয়ের সম্পর্ক মধুর হবে বলে লেখিকার অভিমত। শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত বাস্তব অবস্থাকে মহাকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সুন্দর রূপ দেবার প্রয়াস, লেখিকার লেখনীতে তা অক্ষুন্ন থেকেছে।

শরৎকুমারী চৌধুরানী দেবীর তৃতীয় আলোচ্য রচনার শিরোনাম "আদরের না-অনাদরের।" সমাজে মেয়েদের কি চোখে দেখা হয় এবং ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ব্যবহারগত দিক দিয়ে কি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কন্যা সন্তান জন্মের পরেই সমাজের মানুষজন বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে তার একটি চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন লেখিকা। এর পরিধি, স্থান, কাল, পাত্রের খুব একটা বিস্তার না থাকলেও অনুভূতির ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ, স্বল্প পরিসরের মধ্যেও লেখিকার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ ধরা পড়েছে। দু'টো পরস্পর বিপরীত বয়সের অর্থাৎ প্রবীণা এবং যুবতীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সমগ্র নারী সমাজের কন্যাসন্তানের প্রতি মনোভাব চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন লেখিকা। তিনি শুরুতেই কন্যা সন্তানের প্রতি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে, নিজের কন্যা সুকুমারী বালার উল্লেখ করেন, সে তাঁর একান্ত আপনার আদরের ধন। সমসাময়িককালীন নবীনপন্থী অর্থাৎ যুবতী এবং প্রাচীন পন্থী বয়স্কা নারীদের বাক্যালাপের মধ্য দিয়েই তিনি সমাজের নারীদের মনোভাব প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পুকুরের স্নানের ঘাট মহিলাদের বাক্যালাপের যোগ্য স্থান, এখানেই সকল বয়সের মেয়েরা মনের কথাবার্তা বলবার সুযোগ পায়। লেখিকা

তাই পুকুরের একটি স্নান ঘাটকে বেছে নিয়েছেন। এই স্নান ঘাটে গ্রামের মহিলাদের আনাগোনার ফাঁকে ফাঁকে যে সকল আলাপ-পরিচয়, বাক্ বিতণ্ডা চলে, তা তুলে ধরেছেন। রচনাটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের, মূলতঃ তিনজন প্রাচীন পন্থী বয়স্কা মহিলা, যথাক্রমে-কেষ্টদাসী, গৃহিণী এবং হরকালীর মা, দু'জন নবীনা যুবতী যথাক্রমে হরিদাসী এবং পেরভা। এছাড়া একটি মধ্যপন্থী চরিত্র গয়লা-বৌ, এদের মধ্যকার কিছু কথাবার্তার মাধ্যমে লেখিকা মেয়েদের কথা তুলে ধরেছেন যেখানে দেখিয়েছেন মেয়ে সন্তান কতটা অবহেলিত, অবাঞ্ছিত।

গৃহিণী যখন পুকুর ঘাটে কেষ্টদাসীর মুখে শুনতে পেল যে, মেজদিদির পুত্রবধূ একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছে তখন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো,

'...তিন তিনটে মেয়ে, কায়েতের ঘরে বিয়ে দিতে প্রাণ বেরুবে, অভাগীর যেমন অদৃষ্ট, দশমাস গর্ভে ধোরে কিনা একটা মাটীর ঢেলা হোল"।"[৯]

নিজের নয়, পড়শী বধূর কন্যা সন্তানটিকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারলেন না গৃহিণী। অবশ্য লেখিকা গৃহিণীর কথার প্রতিবাদ করেছেন, যুবতী চতুর্দশ-বর্ষীয়া মেয়ের মুখ দিয়ে,

"একটা চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা আর থাকিতে পারিল না। মাতৃ সম্বোধনে কৃষ্ণদাসীকে কহিল—"তা মাসীর মেয়ে হোয়েছে বলে তোমাদের দুঃখ রাখবার যেন ঠাঁই নেই তাই ঘাটে এসেও সেই কাহিনী হোচ্ছে—তা তুমি যা বল, আমার কিন্তু বাপু ঘোষেদের কালো কালো ছেলের চেয়ে সাতটি সুন্দর মেয়ে ভাল। তোমাদের এত কথা, মেয়ে বুঝি কোনো কাজে লাগে না? তুমি এই যে আষাঢ় মাসে এখানে এসেছ দু'তিন মাস যে কোরে দিদিমার সেবা করছ, মামা তেমন করেন? দিদিমাই তো দুঃখ করেন আমার মেয়ে অসময়ে যত করে ছেলে আমার তেমন করে না। তার বেলা বুঝি মেয়ে দরকার? এদিকে মেয়ে হয়েছে শুনলেই সর্বনাশ বাধে ...।"[৬০]

চতুর্দশবর্ষীয়া প্রভার মুখের কথা কাটবার মত যুক্তি সামনে না থাকায় সকলে যখন চুপ তখন প্রাচীনপন্থী গৃহিণীর পক্ষে চুপ করে সহ্য করা সম্ভব হোলো না। তাই গৃহিণীর মুখ থেকে সমাজের প্রাচীনপন্থীর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন লেখিকা।

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, "ওলো পেরভা থাম্ থাম্ যখন তোর হবে, তখন বুঝবি-এখন ছেলেমানুষ কি বুঝবি—ছেলেমানুষের মুখে অত পাকা পাকা কথা ভাল শোনায় না।"...[৬১]

প্রভাকে সমর্থন জানিয়েছে তারই সমবয়স্কা হরিদাসী, "মেয়ে হয়েছে শুনেই তোমরা লাফিয়ে ওঠ, কিনা বিয়ে দিতে হবে। তা বাপু ছেলের জন্য কি কিছু খরচ নেই?"[৬২]

অর্থাৎ অর্থ নৈতিক অপচয়ের প্রসঙ্গও কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়। তবে নবীনপন্থী যুবতীদের বক্তব্যে এর প্রতিবাদ লেখিকার লেখনীকে দৃঢ় করেছে। স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই সরোষ রচনাটির সময়কাল উনবিংশ অর্থাৎ একশত বৎসরেরও কিছু পূর্বের, তদানীন্তন সময়ে কন্যা সন্তানের প্রতি এই অবহেলা নারী-লাঞ্ছনার সাক্ষ্য বহন করে। অথচ এই সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে একজন নারীর লেখনীতে এ প্রতিবাদ, গুরুত্ব নিয়ে ভাববারই বিষয়।

এখানে লেখিকা তদানীন্তন সমাজের কিছু কুসংস্কারকে জিইয়ে রাখবার জন্য প্রবীণা নারীর জোরালো সমর্থনের প্রকাশ, এরই পাশাপাশি একে কাটবার জন্য নবীণা নারীর জোরালো প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আনুষঙ্গিক ভাবে ডাক্তারের অর্থাৎ পুরুষের প্রবেশ ঘটলেও নারী এখানে প্রধানা।

উনবিংশ শতাব্দীর এই লেখিকার লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে নারী বঞ্চনার-কথা যার সূচনা জন্মকাল থেকেই। কন্যা সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র সন্তানের ঠিক বিপরীত ক্রিয়াকলাপ যা পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রকাশ।

"...যেমন বেটা ছেলেটি হয়েছে আহ্লাদের তেমনি খরচ পত্রও হবে। এই ধাইকে নগদ একটাকা একটা ঘড়া কালই দিতে হোল, আবার আসবে বিদেয় নিতে। মেয়ে হোলে সেই যা নাড়ীকাটা একটা টাকা ধরা আছে-আর কি।"[৬৩]

মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, এমনকি দরিদ্র পরিবারে কন্যা সন্তানকে যতটা মর্যাদার চোখে দেখা হয় বিত্তশীল বনেদী পরিবারে বোধ হয় ততটা নয়, বরং তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হয়। তাই নিম্নবিত্ত ঘরের গয়লাবৌ-এর কন্যাসন্তানের প্রতি মধুরভাব পাঠকের চিত্তকে নাড়া দেয়, ভাবতে শেখায় যে কন্যা সন্তান মোটেই অবজ্ঞার নয়।

"...তা মা দুদিন বাদে শ্বশুর বাড়ি যাবে বলেই তো আমার প্রাণ কেমন করে তাই জন্যেই তো আমি মেয়ে দু'টাকে না দেখে থাকতে পারিনে।"[৬৪]

'আদরের না অনাদরের' শিরোনামের এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের রচনাটি তদানীন্তন সমাজের চিত্রকে তুলে ধরেছে সেখানে গৃহিণী একটি বনেদী পরিবারের প্রতিভূ,

যিনি প্রাচীনপন্থী বহুযুক্তি তর্কের বিনিময়েও মানতে রাজী নন কন্যাসন্তান গ্রহণীয়, অনাদরের নয় আদরের। তাই গয়লাবৌ-এর কন্যা সন্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি তার ভাল লাগে না। এখানেও তিনি অহেতুক যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করেন,

"তা বই কি। তোর ঢের গেছে কিনা তাই তোর বেশী মায়া নইলে জগত জুড়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আদর কম। ছেলেটী হয়েছে বলতে দশ হাত বুক হয়—শুনতে কেমন ঘটাঘটি আমোদ আহ্লাদ হয়। সাত ছেলে হোলেও অরুচি নেই। মেয়ে প্রথম হোলে লোকে বলে তা হোক্-এইবার ছেলে হবে। প্রথমে যা হয়েছে বেঁচে থাক—জেঁয়াচ বজায় থাকলে তবে তো মঙ্গল। তবে তো ছেলের পিত্তেশ।"[৬৫]

শেষ পর্যায়ে লেখিকার মতামত দেবার পালা। কিছু সময়ের আলাপ-আলোচনা, গল্প-গুজবের পর যখন ঘাট শূন্য হয়ে গেল তখন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, মায়ের স্নেহের কাছেও কি কন্যাসন্তানের কোনো বৈষম্য আছে, সেখানেও কি পুত্র সন্তান অধিক স্থান গ্রহণ করে আছে। আত্মজিজ্ঞাসায় তাঁর মন যে উত্তর দিল তা হোলো, মাতৃস্নেহের কাছে কোনো প্রভেদ রাখা চলে না।

'...স্নেহেও পক্ষপাতিতা আছে—শুধু স্নেহে নহে-মাতৃস্নেহেও আছে—মাতাও কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ যত্ন করিয়া থাকেন। ভাবিতে ভাবিতে শয্যার সম্মুখে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার যে ফুলটী এখনো ফুটিয়া উঠে নাই—আমার চুম্বনের সূর্য্যালোক এখনো সে ফুল স্পর্শ করে নাই তাই এখনো সে ফোটে নাই—নিঃশঙ্ক সুষুপ্ত মুখে যেন লেখা রহিয়াছে পড়িলাম—"অনুগ্রহ কোরো এই কোরে, অনুগ্রহ কোর' না এ জনে।"

আমি তাহাকে চুম্বন করিলাম—হাসিয়া আঁখি মেলিয়া সে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বুকে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মা আমার, তুমি আদরের না অনাদরের?

—আমি আদরের।'[৬৬]

এখানেই রচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে অর্থাৎ মাতৃস্নেহের কাছে সন্তানের কোনো পুত্র-কন্যা বিচার নেই।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী দেবীর পরবর্তী রচনা 'কন্যাদায়', ১৩০০ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কন্যাকে বিবাহ দেবার

ক্ষেত্রে কন্যার মাতা ও পিতাকে যে আর্থিক বোঝা গ্রহণ করতে হয় তারই প্রকাশ ঘটেছে এখানে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতাকে কন্যার শ্বশুর বাড়ীকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, তার কিছু নমুনা উপস্থাপিত হয়েছে। কন্যা সন্তান আদরের হলেও কন্যার বিবাহের দায়ে তা পিতামাতার বিশমণী বোঝার স্বরূপ। লেখিকা পত্রাকারে তাঁর এই সাহিত্যটি উপস্থিত করেছেন।

"এদেশে ক্রমশঃ দেখিতেছি যে, পুত্রসন্তানের মূল্য হু হু শব্দে বাড়িতেছে। যেমন ছেলের দাম বাড়িতেছে, তেমনই মেয়ের দাম কমিতেছে···এক একটি কন্যা বিশমণী বোঝার স্বরূপ পিতামাতার জ্ঞান হয়···"[৬৭]

কন্যার বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র অনুযায়ী দাম ঠিক হয়, যেমন—পাস করা বরের দর বেশী, তার মধ্যে ধনবান হলে কিম্বা পিতা উপার্জনশীল হলে দরের পরিমাণ সাত-আট হাজার পর্য্যন্ত। পণ ছাড়াও অলঙ্কারাদি, আসবাব পত্রের চাহিদাও কম নয়। এক্ষেত্রে ঘাটতি হলে সদ্য বিবাহিত কন্যাকে, সঙ্গে তার পিতামাতাকেও মানসিক ভাবে অত্যাচার সহ্য করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অলঙ্কারের ওজনের পরিমাণ কম হওয়ায় বরপক্ষের ব্যবহার মনে করিয়ে দেয় নারী নির্যাতনের কথা।

'দাসী আসিয়া উপস্থিত, কি সমাচার ? না কর্ত্তা এই গহনা ফেরত দিলেন, আর বললেন যে, তাঁর গহনায় কাজ নেই। তাঁর এমন ক্ষমতা আছে যে, তিনি তাঁর বৌকে এমন পাঁচ সুট গহনা দিতে পারবেন। তা আপনারা আর মেয়ে আনতে যাবেন না—তা হ'লে সুবিধা হবে না"। সবে মাত্র বর কন্যা বিদায় করিয়া মাতা কাতর হৃদয়ে ভবিষ্যৎ ভাবিতেছেন, কুটুম্বিনীরা ঘর দুয়ার গুছাইতে ব্যস্ত, কর্ত্তা গৃহসজ্জা ঝাড় লণ্ঠন যথাস্থানে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সন্দেশওয়ালা ফুলশয্যার সন্দেশের ফরমাশ লইতে আসিয়াছে, মালিনী ফুলের গহনার বায়নার টাকা চাহিতেছে, এমন সময় এই অলঙ্কার সমেত প্রেরিত প্রস্তাবে যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে নিস্তব্ধভাবে রহিল। পরে, "কেন, কেন, কি হয়েছে বাছা, আজকের দিনে কি সন্ধ্যাবেলা গহনা খুলিতে আছে।" ইত্যাদি কথা কোন মুখরা প্রতিবেশীনীর মুখ হইতে বাহির হইলে, তবে পিতামাতা অনুনয় বিনয় দ্বারা অবগত হয়েন। কথাটা এই যে, গহনা ওজন করিয়া দেখা হইয়াছে যে, সোনা ভরি হিসাবে কম আছে এবং

গহনার অনেক পান বাদ যাইবে। সুতরাং যদি ভাল চাও, তবে গহনাগুলি ফেরত লইয়া নগদ টাকা ধরিয়া দেওয়া হোক।"[৬৮]

অর্থাৎ গহনার ওজন কমের জন্য কন্যা সমেত পিতামাতার উপর চরম দুর্ব্যবহার, এর জন্য কন্যার বাপের বাড়ি আসা চিরদিনের মত বন্ধ। নারী নির্যাতনের এটা কি একটা চরম নিদর্শন নয়?

এছাড়া ফুলশয্যার তত্ত্বসামগ্রীর ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে কন্যার অযত্ন হবে, এই ভেবেও পিতা মাতাকে সে ব্যাপারে সচেতন হতে হয়। শুধু শ্বশুর বাড়ীর পরিজনদেরই নয় স্বয়ং পাত্রকে খুশী করবার দায়িত্বও কন্যার পিতামাতার।

"পাছে জামাতার মনে অনটনের ভাব আসিয়া মন উচাটন হয়, পাছে তিনি প্রশান্তমনে পত্নীর সহিত প্রথম আলাপ না করিতে পারেন, তাই কন্যার পিতামাতা ফুলশয্যার সমস্ত ভার বহন করেন "[৬৯]

এত কাণ্ডের পরও অর্থাৎ বিবাহের পণ অলঙ্কারাদি, আসবাবপত্রাদি দিয়ে বিবাহ দিবার পরও কন্যাকে সে সমস্ত সামগ্রী ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা হয়। শ্বশুর বাড়ীর পরিজনেরা নববধূর সে সমস্ত অলঙ্কারাদির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বহাল রাখে, তাকে তা ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত করে নিজেদের কাজে লাগায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেখিকা তাঁর ছোটবোনের বিবাহে পিতার দেওয়া সমস্ত অলঙ্কারাদি, আসবাবপত্র, বাসনপত্র, এমনকি ছোট এগারো বছরের মেয়ের সাধের খেলনা পুতুল গুলিকেও তারই সমবয়সী ভাসুরঝির বিবাহে যৌতুক দেবার ঘটানাটি উপস্থাপিত করেছেন।

এই কারণেই লেখিকা পত্র প্রেরকের মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ করে দেবার জন্য যে অনুরোধ পেয়েছেন, সে পত্রের উত্তরে বলেছেন, কন্যা আজকের দিনে একটি পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই কন্যাদায়গ্রস্থ পিতামাতাকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতে হলে সর্বোপরি যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে তা হোলো কন্যা পছন্দ বড় কথা নয়, কন্যার বিবাহ দেবার ক্ষেত্রে দেনাপাওনাটাই আসল। কন্যাদায়গ্রস্থ সকল পিতামাতাকে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে, অর্থব্যয়ের পরিমাণটা যথেষ্ট পরিমাণ হলে এক্ষেত্রে আর কোনো ভাবনা নেই।

১৩০০ বঙ্গাব্দের পর ১৩১৫ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় লেখিকার যে রচনা প্রকাশিত হয়, তার শিরোনাম 'মেয়েবজ্ঞি'। এখানে তিনি প্রথম থেকেই

বেশ সরসগতিতে এক নিমন্ত্রণ বাড়ীতে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সময়ের কার্যকলাপ যেখানে নারী প্রাধান্যই চিত্রিত করেছেন। অর্থাৎ নিমন্ত্রিত বাড়ীতে মেয়েদেরই সোরগোল। "মেয়েষজ্ঞি বলিলেই বুঝিতে হইবে বিশৃঙ্খলার সমষ্টি। প্রাতঃকাল হইতে ভিয়েনের গন্ধে, দাসীর কলরবে, ছেলের কান্নায়, মলের রুনু ঝুনুতে, চুড়ির ঝন্ ঝন্ শব্দে যজ্ঞি বাড়ী সরগরম।"[৭০]

সকাল থেকেই নানান বয়সী মহিলা তরকারী কেটে ঝুড়ি বোঝাই করতে ব্যস্ত। তাদের শুধু হাত চলছে না, নানান ধরনের—যথা, অমসৃণ, অমধুর স্বরে অথবা সুকণ্ঠে উচ্চরবে কথা চলছে তাদের মধ্যে যা নিমন্ত্রণ বাড়ীকে করে তুলেছে সরগরম। বালিকা এবং ছোট ছোট বধূদের দায়িত্ব পান সাজবার। এখানেও চলছে নানান আলাপ-আলোচনা, তবে তাদের কণ্ঠস্বর কিছুটা নীচু।

দুপুর দু'টো বাজতেই ভাত খাবার ডাক পড়ল, এখানেও সরগরম, সবটাই বামাকণ্ঠ।

"কেহ ডাকিতেছে, ও সেজ বৌ আয় না'—কেহ ডাকে, 'ন' দিদি শীগ্‌গির, নে না' ভাই খেয়ে, না হ'লে যে কারও চুল বাঁধা হবে না'। কাহারও বা ডাকাডাকিতে সাড়া নাই, পাতা পড়িয়া আছে। যাহাদের অর্ধেক আহার হইয়াছে তাহারা ডাকিল, 'ও ঠাকুর আর কি আছে নিয়ে এস না'...।"[৭১]

দুপুরের আহার শেষ করতে করতে মহিলারা দুপুর গড়িয়ে বিকেল করে দিল অর্থাৎ নিমন্ত্রিতদের আসবার সময় হয়ে গেছে! ইতিমধ্যে কয়েকজন আসতে শুরু করেছেন। এবার বেশভূষার পালা। এখানেও গোলোযোগ', "বাড়ীর মেয়েদের মধ্যাহ্নের আহার ও বৈকালিক বেশভূষা সমাপ্ত হইতে পাঁচটা বাজিল।"[৭২]

বৌভাতের কনে সুসজ্জিতা হয়ে বসে আছে, এখানে মহিলাদের আসরে নিমন্ত্রিত মহিলাদের আনন্দদানের জন্য তিন-চার জন নাচওয়ালীকে আনা হয়েছে। এরই মধ্যে বাড়ীর মেয়েরা নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত।

এত হট্টগোলের মধ্যে লেখিকা এক পসলা বৃষ্টি এনে দিয়ে হৈ চৈ এর মাত্রা আর একটু বাড়িয়ে দিলেন। বৃষ্টি হবার ফলে মহিলারাই বেশী মাত্রায় চিন্তিত, কেউ বা নিজের বাচ্চা মেয়ে বা রুগ্ন ছেলের জন্য। কেউ বা বহুমূল্য বস্ত্র ভিজবার জন্য। এমনকি নাচওয়ালীরাও এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও তাদের

নাচ-গানের প্রশংসাস্বরূপ কিছু দক্ষিণা পাবার আশায় ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করতে লাগল, সব মেয়েরা যেন তাদের গান শুনবার জন্য দালানে গিয়ে বসে।

বৃষ্টি থামল, এবার খাবার পালা। এখানেও গোলোযোগ, তাই পরিবেশনেও বেশ ত্রুটি হোলো, কিন্তু যেহেতু খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন ছিল নানান ধরনের এবং পরিমাণে প্রচুর, তাই পরিবেশনের ত্রুটি সত্বেও সকলেরই ক্ষুধা নিবৃত্ত হোলো।

খাওয়া শেষ, এবার নিমন্ত্রিতদের ফিরবার পালা, এখানেও গোলোযোগ। অর্থাৎ কার ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। কারও মেয়ের গলার হার নেই, বৌমার হীরের ধুকধুকি, নাকের নোলোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সমবেত বামাকণ্ঠে নিমন্ত্রণবাড়ী সরগরম। এসব গোলোযোগ চলল রাত বারোটা পর্যন্ত। নিমন্ত্রিতরা স্ব স্ব বাড়ী ফিরে গেল। এরপর সব শাস্ত।

"গিন্নির বকুনি, কর্ত্তার ক্রোধ শান্ত হইতে রাত ১২-টা বাজিল।"[৭৩]

বামাকণ্ঠের সোরগোলে নিমন্ত্রণ বাড়ীর বিশৃঙ্খল অবস্থা যা বাড়ীর কর্ত্রীর বকুনি এবং কর্ত্তার ক্রোধের ফলেও শৃঙ্খল অবস্থা আনতে পারেনি, তা রাত বারোটার পর শান্ত হোলো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট প্রতিটি অবস্থার সঙ্গে মেয়েরাই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বামাগণের কর্মমুখতার সোরগোলই নিমন্ত্রণবাড়ীকে জমজমাট করে রেখেছে, আর সেই কারণেই লেখিকা 'মেয়েষষ্ঠি' শিরোনামে নারীদের কথা উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে রচনাটির যথাযথ পূর্ণতা এনে দিয়েছেন।

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর বেশ কয়েকটি রচনা আলোচনান্তে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, লেখিকার সাহিত্য সৃষ্টির ধারা মূলতঃ নারীকেন্দ্রিক। লেখিকা তাঁর চোখ দিয়ে দেখেছেন তদানীন্তন নারীসমাজকে, তাদের বঞ্চনাকে উপলব্ধি করেছেন একান্ত আপন করে। তাই তাঁর লেখনীতে নারী স্থান করে নিয়েছে বিশেষ-ভাবেই। লেখিকার একটি বড় গল্প বা ছোট মাপের উপন্যাস 'যৌতুক'।

'যৌতুক' উপন্যাসটি প্রথম থেকে দশম অর্থাৎ দশটি পরিচ্ছেদ। প্রতিটি পরিচ্ছেদের উপশিরোনাম যা উক্ত পরিচ্ছেদের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চরিত্রগুলি যথাক্রমে—দেবীপুর গ্রামের জমিদার মহেশ গাঙ্গুলী, তাঁর মাতা, তাঁর স্ত্রী, পুত্র নন্দলাল, ভ্রাতষ্পুত্র জয়লাল, উক্ত গ্রামের মোক্তার হরিশ চাটুয্যে, তাঁর স্ত্রী, তাঁর কন্যা মনোরমা ও প্রিয়তমা, প্রিয়তমার শ্বশুর মুখুয্যে মশায়, নাপিত বৌ এবং গ্রামের কয়েকজন গৃহস্থ মহিলা।

উক্ত চরিত্রগুলিকে নানান ঘটনা বিন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখিকা ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক যে প্রথা অর্থাৎ যৌতুক প্রথার প্রভাব এবং এর ফলে মানুষজনকে কি প্রকার অবস্থার সম্মুখীন হোতে হয় তারই কিছু চিত্র তুলে ধরবার প্রচেষ্টা রেখেছেন। ধনী-দরিদ্র—মধ্যবিত্ত অবস্থার মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে গল্পটিতে, সংক্ষেপে গল্পটি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বিষয় স্পষ্ট হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদে-'সমাজচিত্র'-দেবীপুরের জমিদার মহেশ গাঙ্গুলীর জমিদারী প্রতাপের শেষ অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর একমাত্র পুত্র নন্দলালের বিবাহ ঠিক হয় চাটুয্যে বনেদী ঘরের মোক্তার হরিশ চাটুয্যের সুন্দরী কন্যা মনোরমার সঙ্গে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে-'শুভকর্মসম্পন্ন'—বিবাহের আসরে কন্যার পিতা বরপণের দু'হাজার টাকার মধ্যে আটশ 'টাকা দিতে না পারার জন্য বরকর্ত্তা পাত্রকে বিবাহ আসর থেকে তুলে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে কন্যার পিতা যদিও বা কোনো মতে এ-অবস্থার সমাধানপূর্বক বিবাহকার্য সম্পন্ন করবার মত পেলেন কিন্তু বরকর্ত্তা ক্রোধবশতঃ বিনা আহারেই বিবাহ আসর ত্যাগ করে এলেন। তাঁর মাতা বিষয়টি জানবার পর নানান প্রচেষ্টায় ছেলেকে শান্ত করে তাকে খাবার খেতে রাজী করলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তা জয়লালকে শুধুহাতেই বরকনে নিয়ে আসবার হুকুম দিলেন। জয়লালের মনঃপুত না হওয়ায় সে বরকর্ত্তার মাতার স্মরণাপন্ন হলে তাঁরই দেওয়া গ্রামর্ভাটি বারওয়ারী শয্যাতোলানী এবং কাঙ্গালী বিদায় বাবদ দু'শ টাকা নিয়ে, সঙ্গে নতুন বৌয়ের জন্য গহনার বাক্স নিয়ে বর কনে আনতে চলে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—'আলোচনা'-নতুন বরের গাম্ভীর্য্যভাব এবং মনোরমার বড়লোক শ্বশুরের ব্যবহার পুকুর ঘাটের রমণীদের মধ্যে মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—'মেয়ে বাধা'-হরিশবাবুর এক জ্ঞাতি ভাই মহেশ গাঙ্গুলীর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে অঙ্গীকার অনুযায়ী টাকা শোধ দেন নি। দুই বেয়ানের মধ্যে এ বিষয়ে কথা হওয়ায় হরিশবাবু সেই ভায়ের পক্ষে কিছু কথা বললে মহেশ গাঙ্গুলী একটু অসন্তুষ্টই হন এবং ফলস্বরূপ মেয়েকে বাঁধা রেখে হরিশবাবুকে তাঁর ভায়ের দেনা শোধ করবার জন্য বলেন। তাই মনোরমার বাপের বাড়ী যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে চললেও মনোরমা তার পিতাকে

উক্ত ঋণ শোধ করবার জন্ত অনুরোধ করেনি। কিন্তু ছোট বোন প্রিয়তমার বিবাহ ঠিক হবার পর বিয়েতে যেতে পারবে না ভেবে কষ্ট পাচ্ছে। তাই সে তার স্বামী নন্দলালকে অনুরোধ করল যেন সে তার নিজের টাকা থেকে তার বাবাকে দু'হাজার টাকা ধার দিয়ে মনোরমার বাবার বাড়ীতে যাবার রাস্তা পরিষ্কার করে দেয় অর্থাৎ নন্দলালের দেওয়া টাকা নিয়ে মনোরমার পিতা তাঁর বেয়াই মহাশয়ের দেনা শোধ করে মেয়েকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানে বাধ সাধল নন্দলাল, তার ধারণা মনোরমার পিতা টাকা ধার নিয়ে শোধ দেবে না। একথা শুনে মনোরমা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা শুরু হোলো,

"তুমি নিরীহ প্রাণী না তুমি পিশাচ।"

"আমি পিশাচ না তুমি পিশাচী? মায়া নেই দয়া নেই, শুতে এলুম-রাত দুপুরে ঝগড়া কান্নাকাটি—ছোটলোকের ঘরের মেয়ে আর কত ভাল হবে।"[৭৪]

অর্থাৎ স্বামীর সহানুভূতি, ভালবাসা থেকেও মনোরমা বঞ্চিত। তাই সে রাত্রি তার কেঁদে কেঁদে বিনিদ্রনয়নে জানলার পাশে বসেই কাটল। পরদিন প্রাতে ঠাকুর ঘরে কাজ করতে গেলে শাশুড়ী শুকনো মুখ দেখে জিজ্ঞেস করায় সবই জানতে পারলেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়।

তদানীন্তন সমাজে এভাবেই শ্বশুরের খামখেয়ালীপনা, দর কষাকষির শিকার হতে হয়েছে মনোরমার মতো অনেক বধূকেই। এরই পাশাপাশি লেখিকা ঠিক বিপরীত চরিত্রের শ্বশুর চিত্রিত করেছেন প্রিয়তমার ভাবী শ্বশুরকে। এখনো বিবাহ হয়নি। প্রিয়র বিবাহের জোগাড় যন্ত্র চলছে। এমন সময় প্রিয়র ভাবী শ্বশুর বাড়ী থেকে নাপিতবৌ বাড়ীর গিন্নী মায়ের ফরমাশমত এক ফর্দ এনে হাজির। পাত্রের পিতা এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষয়টি অবগত হতে ছুটে এলেন মুখুয্যে মহাশয়, প্রিয়র পিতার কাছে এসে সে ফর্দ বাতিল করে দিয়ে বললেন,

"তোমার গিন্নী আজ নাপিত বৌকে পাঠিয়েছিলেন আমার গিন্নীর কাছে এই বলে যে, তোমাদের কর্তা তো কিছুই নিতে চান না, তা আমার হল এই শেষ কায, আমি কি ডোমের চুপড়ি মেয়ে দেব? সোনাদানা না দিয়ে কন্তা দান করলে কি দানের ফল হয়?—তা ভাই, শাস্ত্র যত তিনি জানেন,

আমরা অত জানিনে, আমার গিন্নীটি সেকেলে মানুষ, অতশত বোঝেন না, ছোট বৌমা একালের মেয়ে, তিনিই ফন্দ´টা দিয়েছেন।

"দেখ বেয়াই, আমার কথা শোন ভাই তুমি, যদি দেওয়া থোওয়ার আরম্বর কর তবে এই আমি চল্লুম, তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করার সুখ আমার অদৃষ্টে নেইরে ভাই। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, বড় মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা আমার পোষাবে না।"[৭৫]

বিয়ে বাড়ীর এত সমারোহ কিন্তু মনোরমা থাকবে না একথা ভেবে ব্যথিত হরিশবাবুর খুড়ীমা ও স্ত্রী যখন প্রিয়তমার বিবাহের কিছু খরচ কমিয়ে দু'হাজার টাকা শোধ দিয়ে মনোরমাকে নিয়ে আসবার জন্য হরিশবাবুকে অনুরোধ করছেন, এই সময়ই মনোরমার চিঠি এলো,

শ্রীচরণেষু,

বাবা—প্রিয়র বিয়েতে আমাকে নিয়ে যাবে না? কোন উপায় হয় না কি বাবা?

তোমার মনু।[৭৬]

মেয়ের এই করুণ আর্তনাদ পিতার হৃদয় স্পর্শ করল। তাই খুড়ীমা ও স্ত্রীর অনুরোধ মেনে নিয়েই তিনি মনোরমাকে নিয়ে আসা স্থির করলেন। দীর্ঘ দু'বছর বাদে মাকে পেয়ে মনোরমার আনন্দাশ্রু আর বাধ মানে না। প্রিয়তমার শুভবিবাহ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হোলো। বিবাহ বাসরের আনন্দ মনোরমার আর ভোগ করা হোলো না। কারণ পিতার আদেশে যদিও মনোরমার স্বামী বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে, কিন্তু সহস্র ডাকাডাকিতেও বেরসিক নন্দলাল বিবাহ বাসরে যোগ দিল না। এ ঘটনায় সাময়িকভাবে বিবাহ বাসরে বিসন্নতা নেমে এলেও, নতুন বরের পিতা তা পূর্ণ করে দিলেন।

"...বরের বাপ কনের বাপের গলা ধরিয়া জোর করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন। নবীনার দল বাসরে প্রবেশ করিয়াই এই যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। একটি ছোট মেয়ে বলিয়া উঠিল, "ওমা, একি!" বলিয়া সে অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। বরের পিতা তাহাকে টানিয়া আনিয়া কোলে বসাইয়া বলিলেন, "কেন গা লক্ষ্মী, নূতন কি দেখ্‌লি গা? ঐ দেখ, আমাদের দু'ভাইয়ের বাবা আর মা দুজনে চকচকে বিছানায় বসে আছে—আমরা হচ্ছি

কোলের ছেলে, আমাদের কি চক্‌চকে বিছানায় বসতে সাধ যায় না? মায়েরা সব হেসে অজ্ঞান হলি যে-আয় মা সব আয়-বস্-সবাই আমার মাকে আর বাবাকে ঘিরে বস্, আমি একবার ভাল করে দেখি। 'এমন দিন আর আমার হবে না। "বলিয়া তিনি গান ধরিলেন..."[৭৭]

এই রঙ্গরসপ্রিয় প্রিয়তমার শ্বশুরের চিত্রের কাছে মনোরমার শ্বশুরের ধন-সম্পদের ভারে ভারাক্রান্ত কঠোর মূর্তি অনেকটাই ম্লান। এখানেই দু'টি শ্বশুরের বিপরীত চিত্র চিত্রিত করে লেখিকার লেখনী হয়েছে সমৃদ্ধ এবং পাঠকের মনোগ্রাহী।

দশম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ গল্পের শেষ পর্যায়ে প্রিয়তমার পিতার গৃহ থেকে বিদায়ের দৃশ্য। বাসর রাত প্রভাত হোলো, বাসি বিয়ের জোগাড় যন্ত্রের পালা, সকলেরই মুখ ম্লান। বিয়ের উৎসাহে এ' কদিন সবাই ব্যস্ত ছিল নানান কাজে, আজ তাই কনেবরকে বিদায় দেবার চিন্তায় মনোবল হারিয়ে সকলেই ক্লান্ত। এরকম অবস্থায় মনোরমা শুনল তার স্বামী নন্দলাল অন্তঃপুরে দেখা করতে এসেছে। স্বামীর সঙ্গে দেখা করে সে জানল তার শ্বশুর কনেকে যৌতুক দেবার জন্য নন্দলালের হাতে চারটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, মনোরমার মনোভাব বুঝতে পেরে সঙ্গে আরো চারটি টাকা যোগ করবার প্রস্তাবও রাখল নন্দলাল। এছাড়া, মনোরমার বাবার দু'হাজার টাকা প্রয়োজন। যদি পাছে মনোরমার গহনাগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, সেই আশঙ্কায় নন্দলাল তার পিতার আদেশ অনুযায়ী গহনার বাক্‌সটা নিতে এসেছে। লেখিকার লেখনীর দৃঢ়তা মনোরমাকে স্তম্ভিত করেছে।

"...'গহনার বাক্‌সটা নিয়ে এসগে যাও, যদি আবার বাঁধা ছাঁদা পড়ে, কে তখন থানা পুলিশ করবে বল।"[৭৮]

স্বামীর মুখে এ ধরনের কথা শোনবার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল না মনোরমা, তাই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার মুখে কোন কথা এল না। টাকাটা সে নিল বটে, কিন্তু শুধুমাত্র এ যৌতুক সে দেবে না এও জানিয়ে দিল।

"আমার একটি বোন, আমি রাজার বৌ, দু-চার টাকা যৌতুক দেওয়া কি আমার ভাল দেখায়? আমি প্রিয়কে এক ছড়া মুক্তোর মালা আর বরকে একটি হীরের আংটি যৌতুক দেব। মালা ছড়াটি আমার, আর আংটি এখানে আসবার সময় ঠাকুরমা যৌতুক দেবার জন্য দিয়েছেন। ঠাকুরমা বলে দিয়েছেন, ভাল রকম যৌতুক না দিলে ঠাকুরের নিন্দে হবে।"[৭৯]

এ-প্রস্তাব নন্দলালের মোটেই পছন্দ মত নয়, তাই সে বাধাও দিল, কিন্তু মনোরমা আপন সিদ্ধান্তে অটল।

"দেখ, আমি জানি যে ঐ মালা আর আংটি দিলে এ-জন্মের মত আমার বাপের বাড়ীতে আসা, আমার অদৃষ্টে আর ঘটবে না, কিন্তু যখন ঠাকুরমার অনুমতি পেয়েছি তখন আমি ঐ যৌতুকই দেব।"[৮০]

গহনার বাক্স সে ফেরত দিল না। স্বামী স্ত্রীর এ বাক্‌বিতণ্ডা বিয়ে বাড়ীর কারো কানেই পৌছিল না। মনোরমার দেওয়া যৌতুক তার শ্বশুরের মান মর্যাদা বাড়িয়ে দিল অনেকটাই, কিন্তু প্রিয়তমার শ্বশুরালয়ে যাওয়া চিরবিদায় না হলেও মনোরমার বাপের বাড়ী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল অর্থাৎ তার চিরবিদায় হোলো।

শরৎকুমারী চৌধুরানী তাঁর প্রতিটি রচনাতেই তদানীন্তন নারী সমাজের নানান চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। এ গল্পে দু'টি চরিত্র উল্লেখের দাবী রাখে যা প্রশংসনীয় মনোরমা এবং নন্দলালের ঠাকুরমা, দু'জনেই শ্বশুরকুলের মান রক্ষার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। ছেলের কৃপণতা, একগুঁয়েমি ঢাকতে এবং শ্বশুরবংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য গল্পের প্রথম থেকেই এই বৃদ্ধা রমণীর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ছেলেমানুষ হলেও মনোরমার চরিত্র কর্তব্যবোধ ও আত্ম-সম্মানবোধে হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ এক মূর্ত্তিময়ী নারী চরিত্র যা অনেক আঘাতেও দলে মুছড়ে যায়নি, পরিবর্তে হয়ে উঠেছে দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ।

শরৎকুমারী দেবী রচিত বড় গল্প বা ছোটমাপের উপন্যাস "সোনার ঝিনুক", 'মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, পরপর কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পুরোপুরি গার্হস্থ্য চিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা তাঁর গল্পের শুরু করে শেষ টেনেছেন নানান ঘরোয়া ঘাত প্রতিঘাতের চিত্রের সাহায্যে। সংক্ষেপে গল্পটি উপস্থাপিত করা যেতে পারে। গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে মূল মহিলা চরিত্র যথাক্রমে—মায়া, মায়ার শাশুড়ী, অনু। এছাড়া আছে ঝি দাই, যে চরিত্রটি গল্পের অনেকটা সময় জুড়ে না থাকলেও চরিত্র হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে। মায়ার মাসী এবং কয়েকজন পল্লী স্ত্রীলোককেও ঘটনা প্রসঙ্গে আনা হয়েছে। পুরুষ চরিত্র ততটা গুরুত্ব পায়নি, শুধুমাত্র মায়ার স্বামী বরদাবাবুকে গল্পের সমস্ত সময়ই বলতে গেলে পাওয়া যাবে, কিন্তু তিনি কিছুটা দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। গল্পটির নামকরণ যে ঘটনা এবং

যাদেরকে ঘিরে তারা হোলো দু'টি শিশু চরিত্র অরুণ ও তরুণ যথাক্রমে অনু এবং মায়ার পুত্র-সন্তান।

পরিচ্ছেদ অনুযায়ী উপশিরোনামগুলি যথাক্রমে—সুন্দরবাংলো, আয়োজন, সাধভক্ষণ, কল্পনা-জল্পনা, নিরুপায়ের উপায়, রেলের গাড়ী, অরুণ, দুর্যোগ, তরুণ, বচসা, দুশ্চিন্তা, বিনিময়, অন্নপ্রাশন, প্রত্যর্পণ। পর্যায়ক্রমে পরিচ্ছেদ অনুযায়ী ঘটনার বিবৃতি দিয়ে গল্পের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনের সমতাবজায়ের ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টির আশঙ্কাতেই মূল ঘটনার উল্লেখ করাই বিধেয়।

বরদাপ্রসাদ, তাঁর মাতা এবং স্ত্রী মায়া আরায় রেল ষ্টেশনের কাছাকাছি একখানি সুন্দর বাংলোতে থাকেন। বরদাবাবু শিক্ষিত এবং সুচাকুরে। মায়া অন্তঃসত্ত্বা, তার সাধভক্ষণের আয়োজন মায়ার মাসী এবং পরশী কয়েকজন স্ত্রীলোক-এর সহযোগিতায় ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বরদাবাবুর বদলীর নির্দেশ আসায় তিনি স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাতাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত হলেন, কারণ এদের একা রেখে বাইরে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়—স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, মাতা বৃদ্ধা। এ সময় আত্মীয় সম্পর্কের বোন অনুর চিঠি পান, তারা স্বামী ও স্ত্রী একটি শিশু সন্তান নিয়ে বড় অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছে, যদি বরদাবাবু কোনো উপায় করে দেন। চিঠিটি বরদাবাবুর নিশ্চিন্ত হবার পক্ষে সহায়ক হোলো। তাই তিনি মাতা এবং স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বোনকে আসবার জন্য লিখে দিলেন। যথাসময়ে অনু স্বামী ও শিশুপুত্র অরুণকে নিয়ে আত্মীয়া পিসিমার (বরদাবাবুর মাতা) আশ্রয়ে এলো। মায়া তাদের সাদরেই গ্রহণ করল। নিজের গহনা দিয়ে ননদকে সাজাল এবং অরুণকেও পুত্রবৎ কাছে টেনে নিল। বরদাবাবুও কিছুটা নিশ্চিত হয়ে নতুন কর্মস্থলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে মায়ার একটি পুত্র সন্তান প্রসব হোলো, পুত্রটির কোনো বিপদের আশঙ্কা না থাকলেও মায়ার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ল, যমে-মানুষে টানাটানি করে অবশেষে মায়া বেঁচে উঠল। কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্বল থাকার জন্ত তার শিশু সন্তানকে পালনের দায়িত্ব অনুই নিল এবং দু'টি পুত্রসন্তানকেই সে একসঙ্গে পালন করতে লাগল।

মায়ার পুত্রের নাম রাখা হোলো তরুণ। অরুণ ও তরুণ একই সঙ্গে সমান ভাবেই বড় হতে লাগল। তরুণের মামা বাড়ী থেকে অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে এসেছে একটি সোনার ঝিনুক এবং বাবা ঠাকুরের প্রসাদী ফুল ভরা একটি ছোট

সোনার মাদুলী। এই মাদুলীটি মায়ার ছিল। এতদিন একে একে মায়ার সব ভায়েরা ছেলেবেলায় ছয়মাস বয়স পর্য্যন্ত গলায় পড়েছে, এবার মায়ার নবজাত সন্তানের জন্য এ'টি পাঠানো হয়েছে।

"এ'টি বড় জাগ্রত দেবতার ফুল—বড় মঙ্গলময়—মায়ার মাতার এ-পর্য্যন্ত কোনো সন্তান নষ্ট হয় নাই সকলেই সুস্থ ও সবল—তাই ইহা মায়ার সন্তানের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। নবজাত শিশু তরুণের গলায় তাহার পিতামহী হরি স্মরণ করিয়া সেই হার পরাইয়া দিলেন।"[৮১]

সোনার ঝিনুক দিয়ে তরুণকে দুধ খাওয়ানো হোতো। একদিন অরুণের পিতলের ঝিনুকটা খুঁজে না পাওয়ায় তরুণের সোনার ঝিনুকে মায়া তাকে দুধ খাওয়াতে দেখায় ঝি দাই কটাক্ষ্য করে বলল,

"আরে বাপরে, সোনার ঝিনুকে দুধ খাওয়ান! অঙ্গে সোনা কখনো চড়েনি, সোনার ঝিনুকে দুধ খাওয়ায়।"[৮২]

একথা শুনতে অনুর মোটেই ভাল লাগল না, বরদাবাবুর মা অনুর কাছে একথা শুনে দাইকেই তিরস্কার করে বললেন,

"দাই তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা যে অনুর কাযে তুমি কথা কও—তাকে মনিব বলে মনে কর না? আমি তোমাকে জবাব দিলাম-অনু যদি তোমাকে রাখে তবেই তুমি এখানে স্থান পাবে।"[৮৩]

দাই-এর পক্ষে অনুর দয়া গ্রহণ মোটেই সহনীয় নয়, তাই কাজে ইস্তফা। এ ঘটনার পর থেকে গৃহের সমস্ত কিছুর দেখাশোনা অনুই করে। মায়ার শরীর কিছুটা সুস্থ হলেও ছেলেদের দেখাশুনা অনুই করত। দু'জনেই একসঙ্গে বড় হতে লাগল, একসঙ্গে অন্নপ্রাশন হোলো। দু'জনের একই রকম ব্যবস্থা, অথচ শিশু দুজন বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনার স্বভাব ভিন্ন দেখা গেল—অরুণ শান্ত, হাসি-খুশি, কিন্তু তরুণ তার বিপরীত। অরুণ যদিও অনুর সন্তান, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তরুণের প্রতিই তার বেশী মনোযোগ, সর্বদাই সে তরুণের প্রতি যত্নবান ও সহানুভূতিশীল। এদিকে অরুণের স্বভাব শান্ত হওয়ায় মায়া নিজের সন্তান অপেক্ষা তাকেই বেশী পছন্দ করে।

একটু বড় হোলে তাদের দু'জনকে পাঠশালায় পাঠানো হোলো। এখানেও অরুণের শান্তভাব, পড়াশুনায় অধিক মনোযোগ ও সকলের বাধ্যের। কিন্তু তরুণ ঠিক তার বিপরীত। বসন্তকালে কচি আমের সময়, ছোটছেলেরা তাই

গাছের নীচ ছাড়তে চায়না। অনু দু'জনকেই বারণ করে দিয়েছিল যেন তারা আম গাছের নীচে না যায়, কারণ কাল-রোগের (বসন্ত) প্রাদুর্ভাব হয়েছে, দুরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু তরুণ বারণ না শুনে তার ফল পেলো। এই দুরারোগ্য কালরোগে সে আক্রান্ত হল। মৃত্যুশয্যায় হাসপাতালে, ডাক্তার তাকে জবাব দিয়েছেন। মায়া পুত্রশোকে জর্জর, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাচ্ছে, সমস্ত বাড়ীটা শোকে থমথমে। এ সময় অনুকে দেখা গেল কঠোর মুখ, ডাক্তারের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করছে, তরুণের প্রতি ঠিকমত নজর হচ্ছে না। মায়ার সন্তানের প্রতি অনুর এতটা সহানুভূতিপরায়ণতা সকলকে নাড়া দিয়েছে।

কিন্তু অনু কি সত্যিই নিজের সন্তানের চেয়ে মায়ার সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহশীলা, অনুভূতিপরায়ণা। এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন লেখিকা গল্পের শেষে অর্থাৎ ঘটনার পরিসমাপ্তি টেনে অনুর সত্যিকারের পরিচয় তুলে ধরেছেন। সকলের বিস্ময়ের এবং শ্রদ্ধার মূর্ত্তিময়ী অনুর প্রকৃতরূপ ফুটে উঠেছে গল্পের শেষে।

"অনুর চক্ষে জল নাই—দেখিতে দেখিতে তাহার মূর্তি উন্মাদিনীর মত ভীষণ হইয়া উঠিল, সে বলিতে লাগিল, "শোন তোমরা, সকলে শোন—বৌ তুমি শান্ত হও, কেঁদ না—কেঁদ না—আমার পাপের ফল আমি একাই ভোগ করবো। যে আজ চলে যাচ্ছে, ঐ আমার বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া ধন—সেই আমার বাছা, সেই আমার অরুণ, সে কেবল আমার। তাকে বাঁচাবার জন্য, তাকে দারিদ্র্যের দুঃখ থেকে রক্ষা করবার জন্য আমি ছেলে বদল করেছিলুম। জানতুম বাবার ফুল বড় জাগ্রত, বাবা তাকে রক্ষা করবেন, তাই এখনও যে তার সে মাদুলী খুলতে দিইনি।" বলিয়া সে আসল তরুণের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া মায়ার কোলে বসাইয়া দিয়া বলিল, "বৌ এই নাও তোমার ছেলে, তুমি শান্ত হও, এর গলা থেকে সোনার হার—মাদুলী খুলে দিয়ে তাকে পড়িয়ে দিয়েছিলুম, বড় জাগ্রত প্রসাদী ফুল বলে। সোনার ঝিনুকে দুধ খাওয়াতুম। হায় হায়, কিছু হল না, রাখতে পারলুম না—পারলুম না।'

"বলিতে বলিতে অনু ছিন্ন লতার মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।"[৮৪]

শরৎকুমারী দেবীর কয়েকটি রম্যরচনা গল্প আলোচনান্তে এটা স্পষ্টতঃ যে

লেখিকা তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তদানীন্তন সমাজের নারীদের কথা তুলে ধরবার যে প্রচেষ্টা রেখেছেন তা অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ইন্দিরা দেবী

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কন্যা ইন্দিরা দেবী ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের লেখিকা। তাঁর প্রবন্ধ রচনার সংখ্যা স্বল্প। 'প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত ও প্রবন্ধে কুসুম গ্রন্থখানি তাঁর স্বামী প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবনী। এতে তিনি প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কিছু রচনাও প্রকাশ করেছেন। এই রচনাগুলি যথাক্রমে—ব্রহ্মলাভ, সকল প্রশ্নের চরম মীমাংসা, ব্রাহ্মধর্মের পূর্ণতা, ঈশ্বরের সর্বব্যাপীত্ব, ব্রাহ্মধর্মের সারকথা, পরলোক প্রভৃতি প্রবন্ধ, কয়েকটি কবিতা-বন্দনাগীতি, জয়পুর, প্রেমের অঙ্গ, স্বপ্নবোধ (সুন্দরদাস হইতে অনূদিত), এছাড়া পরিশিষ্টে একটি অসমাপ্ত কাব্য।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই লেখিকা তাঁর শ্বশুরালয়ের কিছু পরিচয় সংক্ষেপে রেখেছেন। এরপর স্বামীর শৈশবের কার্যধারা সহজ ও সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন। এবং পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ জীবনের কর্মধারার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীঅমৃতলাল বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখেছেন,

"......এইরূপ ধর্মবীরের জীবনী প্রকাশ করিয়া, তাহার যোগ্য সহধর্মিণী যে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের অভাব পরিপূর্ণ করিলেন ও সেই সঙ্গে গৃহস্থ সাধকবৃন্দের সম্মুখে যে একটি আদর্শ জীবন সমুত্থাপিত করিয়া দিলেন, ইহা বলা বাহুল্য বিবেচনা করি।"[৮৫]

গ্রন্থের শুরুতে নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় লেখিকা তাঁর স্বামীর জন্ম তৎসহ শ্বশুরকুলের কিছু পরিচয় রাখেন,

"স্বর্গীয় পতি দেবতা, নদীয়া জেলার মধ্যবর্তী হৃদয়পুর নামক গ্রামে, ১২৫৪ সালে পৌষ মাসে শনিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺কৃপানাথ মুন্সী, মাতার নাম নৃত্যকালী দেবী। আমার শ্বশুর মহাশয় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিশেষভাবে পারস্যভাষা অনুশীলন করিয়াছিলেন কারণ তখনকারকালে পারস্য ভাষাটাই অর্থকরী ছিল। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীও সুশীলা পতিপরায়ণা ও ধার্মিকা ছিলেন। দুঃখের বিষয় আমি তাহাদিগকে দেখি নাই ও তাঁহাদের সেবা করিবার পুণ্য আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।"[৮৬]

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ি হবার পর তাঁদের বাইরের বাড়ীর সামনে জগদ্ধাত্রী পূজার যে আটচালা ছিল তারই সামনে উঠোনে যে পাঠশালা বসত সেখানে পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি জগদ্ধাত্রী দেবীর কৃপালাভ করেছিলেন বলে লেখিকা উল্লেখ করেন।

"পাঠশালা ভাঙ্গিয়া সকলে চলিয়া যাইলে পর তিনি জগদ্ধাত্রী দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—আমি এখন যাই, তদুত্তরে "যাও"শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং গৃহে আসিয়া মাকে বলিলেন—আজ জগদ্ধাত্রী দেবী আমার সহিত কথা কহিয়াছেন।"৮৭

কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেশী দূর পর্যান্ত শিক্ষাগ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হোলো না, ষোলো বছর বয়সে মতিহারী নামক স্থানে তাঁকে কাজের জন্য যেতে হয়। সেখানে অল্পদিন কাজ করবার পর দেশে আসেন এবং এলাহাবাদে টেলিগ্রাফকার্য শিক্ষা গ্রহণ করে সাহেবগঞ্জের রেল আপিসে কাজ নেন। এখানে কর্মরত থাকাকালীন রেলের অনেক দুর্নীতি পরায়ণ, মদ্যপ কর্মচারীকে খারাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে ধর্মীয় কার্যকলাপে যুক্ত হতে সাহায্য করেন।

এসময় মহর্ষি দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট থেকে লেখিকা শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা সংগ্রহ করে এ-গ্রন্থে সটি উদ্ধৃত করেন,

"গঙ্গাতীরে বজরা খুঁজিতে খুঁজিতে নগর ছাড়াইলাম। দেখি যে, জনকোলাহল শূন্য শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ছায়াময় তীরে বজরা বাঁধা রহিয়াছে। গিয়া সেখানে দাঁড়াইলাম। বজরার ছাতে উপবিষ্ট একটি ভৃত্য আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল, তদনন্তর বাহিরে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

"বজরার ভিতরে গিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম দিব্যকান্তি সমাহিত একযোগী সেখানে বসিয়া রহিয়াছেন।...মুখে শ্বেত শ্মশ্রু, মস্তকে শ্বেত কেশ, মুখশ্রী শুক্রতারার ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল, তাহা হইতে ব্রহ্মচর্চ্চ: নির্গত হইয়া সম্মুখের আকাশকে শুভ্র করিতেছে। আমার সন্দেহ হইল যে, এই পুরুষ মনুষ্য না লোকান্তরবাসী দেবতা। তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন, তখন প্রাণ ভরিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বসিলাম।...সমস্ত বৈকাল তাঁহার বাক্যামৃত পান করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলাম।"৮৮

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাঁরই নির্দেশে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় চাকুরী ছেড়ে দিয়ে মহর্ষির কাছে ধর্মশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে যান। পরিবার প্রতিপালন বাবদ অর্থ মহর্ষিই দিতেন। শান্তিনিকেতনে মহর্ষির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর শিষ্য হন। তাঁর বক্তব্যই লেখিকা উদ্ধৃত করেছেন।

"...তিনি আমাকে দুই বাহুদ্বারা আলিঙ্গন দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন-এসো গো। তোমাকে আমাদের আপনার করিয়া লই।

...পরদিন হইতেই মহর্ষি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ...মহর্ষি প্রথমেই আমাকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পাঠ করাইলেন কেন? যেহেতু ইহাতে ব্রাহ্মধর্মের সম্পূর্ণ লক্ষ্য অতি স্পষ্ট ও সুব্যক্ত রহিয়াছে।"[৮৯]

এই ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা গ্রহণের পর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়—ব্রহ্মলাভ, সকল প্রশ্নের চরম মীমাংসা, ব্রাহ্মধর্মের পূর্ণতা, ঈশ্বরের সর্ব ব্যাপীত্ব, ব্রাহ্ম ধর্মের সারকথা, পরলোক প্রভৃতি শিরোনামে প্রবন্ধগুলি রচনা করেন যার মধ্য দিয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মের বিষয় বিষদ আলোচনা করেন।

শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করে মহর্ষির সঙ্গে তিনি ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে বাস করতে থাকেন এবং তাঁরই নির্দেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। লেখিকা এ বিষয়ে তাঁর স্বামীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন,

"এই স্থানে তিনি আমাকে উপনিষৎ ও ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন, এবং 'শাস্ত্রী' এই উপাধি দিয়া ছান্দোগ্য উপনিষৎ অনুবাদ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুমতি করেন।"[৯০]

এরপর বেশ কিছুদিন মহর্ষির সঙ্গে হিমালয়ের মসৌরী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে পরব্রহ্মের ধ্যানধারণাত্মক সাধনায় যাপন করে ফিরে আসেন চুঁচুড়ায়। এখানে তাঁর দীক্ষা এবং বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুদিন পরেই আবার মহর্ষির সঙ্গে ভারত ভ্রমণে বের হন। জয়পুর, যোধপুর, দিল্লী, আগ্রা এবং বিকানীর দর্শন করে বোম্বাইতে বহুদিন থাকেন। বোম্বাইতে থাকাকালীন তিনি 'উদগীথা' কাব্য রচনা করেন।

এই দীর্ঘভ্রমণের পর তিনি কিছুদিনের জন্য গার্হস্থ্য জীবন শুরু করলেও তাঁর অন্তরঙ্গ বৈরাগ্য তাঁকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখতে পারল না। তাই

স্ত্রীকে অর্থাৎ লেখিকার উপর সমস্ত সংসারের ভার দিয়ে নিজের সাধনা ও গুরুসেবায় রত হন। গুরুদেব স্বর্গারোহণের পর থেকে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে ও রক্ষায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয়ের বিষয় উল্লেখ করে লেখিকা বলেছেন।

"এক সময় আমার স্বামী এক ব্যক্তিকে ছয় হাজার টাকা ঋণ দেন, তাহার পর যথাসময়ে সে তাহা পরিশোধ করিতে না পারায়, তাহার বাড়ী ডিক্রী ও ক্রোক করিয়া নিলামে নিজে ডাকিয়া লন। সেই বাড়ীতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সপরিবারে বাস করিত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কান্না করিলে তিনি সেই বাড়ীটি তাকে ছাড়িয়া দিলেন। বাড়ীটির মূল্য ৭৷৮ হাজার টাকা হবে। ...তাঁহার দয়ার পরিচায়ক এইরূপ অনেক ঘটনা আছে..."[২১]

তিনি সারাদিন নানান কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকতেন বলে শরীরের প্রতি নজর নিতেন না, তাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমন কি রোগ শয্যাতেও তিনি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনবরত চিন্তা করতেন। অধিক পরিশ্রমের এই রোগশয্যা হল তাঁর অন্তিমশয্যা। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৮-কার্তিক শনিবার বেলা ১-৩০ মিনিটে ৬৪ বৎসর বয়সে মধুপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইন্দিরাদেবী এই গ্রন্থে তাঁর স্বামী প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন কথা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায়, সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ লেখনীর পরিচয় রেখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই লেখিকার রচিত তাঁর স্বামীর জীবনী গ্রন্থ রচনা ও তাঁর প্রকাশ, পতিপরায়ণা স্ত্রীর যথার্থ কর্তব্য করবার নিদর্শন বহন করে।

মানকুমারী বসু

পদ্য গদ্য, উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ, আখ্যায়িকা রচনা মিলিয়ে মানকুমারী বসুর গ্রন্থের সংখ্যা বারোটি। বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থটি 'প্রিয়-প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়'-প্রকাশকাল ১৮৮৪ সাল, ২৪-ডিসেম্বর তৃতীয় সংস্করণ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন, ১৫নং পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা—১। সাতটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রবন্ধের সমষ্টি যথাক্রমে—দুর্গোৎসব, তুমি কোথায়, চিত্রপট, মুকুরে মুখ, পিঞ্জরে বিহগী, মরুভূমে মরীচিকা, অরণ্যেরোদন, একাদশী। পনেরো বছর পর তারাকুমার কবিরত্ন এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন,

এই সংস্করণে 'সাতক্ষীরায়' নামে একটি কবিতা যুক্ত হয়েছে (১৪-ই আশ্বিন ১৩০৩ বঙ্গাব্দ)।

স্বামীর অকাল মৃত্যুর পরই তাঁর এই প্রথম গদ্যপদ্য রচনা 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়।' এই গ্রন্থের তাই প্রতিটি প্রবন্ধই স্বামীর বিরহে বিরোহিনীর এবং একাকিত্বের যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। প্রবন্ধগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে। 'দুর্গোৎসব প্রবন্ধে লেখিকা তাঁর মনোবেদনা দেবী দুর্গাকে জানাচ্ছেন,

"তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ-কারিণী, তাই তোমায় অত ভালবাসি। মা! তুমি সেই আনন্দময়ী আসিয়াছ, তবে আমার এ নিরানন্দ কেন? দুই চক্ষু পুরিয়া জল আসিতেছে কেন? তোমাকে দেখিয়া বুকের ভিতর অমন করিতেছে কেন? আমার কি হইয়াছে? আমার কি নাই মা? আমি কি হারাইয়া কাঁদি মা? একবার বল' না মা? বাক্স পোরা গহনা পড়িয়া আছে আর গায় দিতে পাইব না, তাই বলিয়া কাঁদি? না, মা, অত ভাল কাপড় পড়িয়া আছে পরিতে পাইব না, তাইতে কাঁদি? না, মা, এ জন্ম চুল বাঁধিতে পাইব না, আলতা পরিতে পাইব না চুড়ী পরিতে পাইব না, সেই সব ক্ষোভে কাঁদি? না মা, সেসব ক্ষোভে কাঁদিতাম, যদি তার চেয়ে শতগুণ বড় অসংখ্যগুণ বড় আর এক দুঃখ না হইত। কি জানি মা, বলতে গেলে বলতে পারি না যে মা, আমার যে সবনাশ হইয়াছে। ঐ যে সিঁদুরটুকু আর পরিতে পাইব না সেই বড় ক্ষোভ হইয়াছে। আর মা। অলঙ্কারের যে অলঙ্কার, বেশ বিন্যাসের যে বেশ বিন্যাস, সিঁদুরের সিঁদুর, দুর্গোসবের যে দুর্গোৎসব তাই যে হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেই যে আমার কপাল পুড়িয়াছে তাতেই আমি কাঙ্গালিনী হইয়াছি।"[১২]

লেখিকা তাঁর স্বামীর অবর্তমানে দুর্গোৎসবের মত বাঙ্গালীর প্রিয় জাতীয় উৎসবকে গ্রহণ করতে পারছেন না। সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে বিষাদময়। এই বিষাদ মানসিক যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্যই দেবী দুর্গার মূর্তির সামনে নিজের মনের সমস্ত ব্যাথা জানাচ্ছেন। লেখিকা এই স্বল্পাতনের প্রবন্ধে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় একটি সদ্য স্বামী হারানো যুবতী বিধবার মনের ব্যথা যে আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তা সবতোভাবে সার্থক। পাঠকের সামনে প্রবন্ধের ভাষা যেন চিত্রকে প্রস্ফুটিত করেছে। তাই তিনি

সার্থক রচনাকার। আপন মনব্যথা প্রকাশের পর অষ্টাদশী বিধবা এই যুবতী যখন দেবীর কাছ থেকে যন্ত্রণা উপশমের কোনোরূপ আশ্বাস পেলো না, তখন তার মনের যে অভিব্যক্তি, লেখিকার কলমে তা জোরালোরূপ পেয়েছে।

"মা! তোমার কাছে এত করিয়া কাঁদিলাম, তোমার চক্ষে এককোঁটা জল এল না! এতক্ষণ যদি মায়ের কাছে কাঁদিতাম, তাহা হইলে মা কত কাঁদিতেন, এতক্ষণ যদি দাদার কাছে কাঁদিতাম তিনি কত বুঝাইতেন, এতক্ষণ যদি সব দুঃখিনীদের কাছে কাঁদিতাম তাহারা আমার সঙ্গে কত কাঁদিত। আর মা, যদি—যাঁহার জন্যে এ কষ্ট, এ যম-যন্ত্রণা পাইতেছি, তিনি যদি দেখিতেন, তাহা হইলে দেখিতে, এই কাঙ্গালিনীর সোহাগ দেখিতে, প্রণয়ের কতদূর ক্ষমতা বুঝিতে, মানুষের ভালবাসা জিনিসটা কি জানিতে।...

মা! তুমি দেবীই হও, ভাগ্যবতীই হও আর ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীই হও, তাহা হইলে আমার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ না করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে। তা কিছুই হ'ল না, তবে আমার দুঃখ তুমি বুঝিবে কেন? এ কান্নায় তোমার মন ভিজিবে কেন? তুমি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আমি অনন্ত দুঃখিনী, তবে আমার কান্নায় তোমার মন ভিজিবে কেন?"[৯৩]

দেবী দুর্গার কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে পেরেছে বলেই স্বামীহীনা এই যুবতীর এত অভিমান। যুবতীর মনে নানান প্রশ্ন—স্বর্গ কি, কয়টী, দেবতারা কি রকম, মানুষ মরিবার পর স্বর্গে যায় এবং সেখানে গিয়ে কি আপনজনকে ভুলে যায়, ইত্যাদি। এত প্রশ্নের পরও ঘুরে ফিরে স্বামীর কথাই তাকে ঘিরে রাখে, এ বেদনা তাঁর অন্তরের অন্তস্থলের। তাই সে মাকে জানায় তার ব্যাথা। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে মায়ের কাছে জানায় বিদায়,

"শ্রীচরণেষু প্রণাম করিয়া বিদায় হইতেছি, বুক ফাটিয়া মরি তাই দুটি কথা বলিতে আসিয়াছিলাম মাত্র। দুর্গোৎসব দেখিতে আসি নাই, যে দিন হইতে আমার দুর্গোৎসব সাঙ্গ হইয়াছে সেই দিন হইতে সকল উৎসবে ইতি দিয়াছি। এবার এই পর্য্যন্ত। যদি এ দুর্ভর দেহ আগামী বৎসর বহন করিতে হয়, আবার তোমাকে বিরক্ত করিব। আর যদি তোমার আশীর্বাদে এই শেষ হয় তবে এই শেষ!"[৯৪]

পরবর্তী প্রবন্ধ 'তুমি কোথায়।' এ প্রবন্ধে লেখিকার কলমে প্রকাশ পেয়েছে মৃত স্বামীকে খুঁজে বেড়াবার ব্যকুলতা। সমস্ত নারীর কাছে তার

স্বামী প্রিয়তম, তাই তো স্বামী যেরকমই হোক না কেন, তার অদর্শনে স্ত্রী ব্যাথা পায়,

"কিন্তু সকলেইত গুণবান হয় না, তবে পোড়া স্ত্রীলোকে অত কষ্ট পায় কেন? হিরর স্বামীরত কত দোষ ছিল, তার জন্যে হির কাঁদিয়া মরে কেন? তবে কিনা, ভালবাসার চক্ষে দোষ ও গুণ বলিয়া ভ্রম হয়। সেইজন্যেই হির, পতিত ভালবাসা ভাবিয়া চির বিরহ-কষ্টে কাঁদে। আচ্ছা, নিস্তারিণীর স্বামী বৃদ্ধ ছিল, প্রকৃত প্রণয় দূরে থাকুক নামে মাত্র বিবাহ হইয়াছিল, সেই নিস্তারিণী অত কাঁদে কেন"[৯৫]

স্বামী বিয়োগ ব্যথা যুবতীকে অধীর করে তুলেছে, তাঁকে ব্যাকুল করেছে, "তুমি কোথায়? আমার সম্পদের সৌভাগ্য! সৌভাগ্যের সম্পদ! বিপদের বন্ধু! তুমি কোথায়? আমার জীবনের ভরসা! রোগের ঔষধ! যন্ত্রণার শান্তি! তুমি কোথায়? আমার সর্বের-সর্বস্ব! সংসারের বন্ধন। মুমূর্ষর অমৃত! তুমি কোথায়? প্রিয়তম! তুমি কোথায়?"[৯৬]

স্বামীর চিত্রপঠ চোখের সামনে রেখে যুবতী তার মনের ব্যথা প্রকাশ করেছেন 'চিত্রপট' প্রবন্ধে। স্বামীর অকালে মৃত্যু হবে, হায় এ কথা কি জানত যুবতী? নিজের জীবনের এই পরিণতিকে তাই বলবার চেষ্টা করেছেন যুবতী।

"...যে দিন আমার "শুভবিবাহ" হইয়াছিল সেদিন কেহ জানিত না যে সেই পরিণয় পরিণামে এই অশ্রুধারায় পরিণত হইবে। আবার যেদিন আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এই দেখা শেষ দেখা....।"[৯৭]

মনের ব্যাথা উপশমের জন্য যুবতী কান্নার মধ্য দিয়ে মন হালকা করতে চাইছেন,

"কান্নার মর্ম অনেকে বোঝে না, আমিও পূর্বে বুঝিতাম না, এখনই বুঝিয়াছি, রোদনজনিত শান্তি এখনই চিনিয়াছি, পূর্বে চিনিতাম না।"[৯৮]

একান্তে সকলের অলক্ষ্যে তাই যুবতী চিত্রপটের সামনে তার মনব্যথা প্রকাশ করে কিছুটা শান্তি পাবার চেষ্টা করছেন এবং দিবাবসানে চিত্রপটকে কিছু সময়ের জন্য বিদায় জানায়, এখানেই এ প্রবন্ধের শেষ করেছেন লেখিকা,

"দিনমণি অস্তে চলিলে? এ দুঃখিনীর দুঃখ আর দেখিলে না! প্রিয় চিত্রপট। যত্নের ধন। মন—মরুভূমের বিশ্রাম স্থান। আইস আজিকার

মত তোমায় তুলিয়া রাখি। তুমি যাহার প্রতিরূপ, তাঁহার কাছে এ কষ্টের কথা বলিতে পারিলাম না, তোমার কাছেই বলিব। রামচন্দ্র সীতা দেবীকে বিসর্জন করিয়া স্বর্ণসীতা বাম পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি তাহাকে হারাইয়া তোমার কাছেই কাঁদিব।"[৯৯]

স্বামীহীনা যুবতী আয়নায় মুখ দেখে স্বামীর বর্তমানে এবং অবর্তমানে তার মুখের বাহ্যিক যে পরিবর্তন ঘটে, সঙ্গে যুবতীর মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন লেখিকা তাঁর 'মুকুরে মুখ' প্রবন্ধে। একজন সধবা নারী এবং একজন বিধবা নারীর মধ্যে বহিরাগত সাজসজ্জার পরিবর্তন ঘটে, বাহিরের এই পরিবর্তিত সাজসজ্জা যেন তার অন্তরেরই প্রকাশ।

স্বামী বর্তমানে যে নারী ছিল উজ্জ্বল, সর্বরূপাঙ্গ সুন্দরী, স্বামীর প্রয়াণ সেই নারীকেই মলিন, নিষ্প্রভ, অলঙ্কার হীনা, ব্যথাপূর্ণহৃদয়া কোরে তোলে। তাই আয়নায় স্বামীহীনা যুবতী তাঁর প্রতিবিম্বকে সহ্য করতে পারছে না। তাঁর মনবেদনা হয়েছে দ্বিগুণ। পূর্বের সৌভাগ্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে পড়েছে দুর্ভাগ্যের ছায়া। কিন্তু এ অবস্থাতেও লেখিকা এই শোকতপ্ত যুবতীর যন্ত্রণার উপশমের জন্য, মনের সাময়িক পরিবর্তন ঘটিয়ে কিছুটা প্রলেপ দেবার চেষ্টা করেছেন। জগতে শুধুমাত্র স্বামীহীনাই অসুখী নয়, অবিবাহিতা নারীও অসুখী, আবার বিবাহ হয়েও স্ত্রীপুরুষের এক হৃদয় না হ'লে দু'টি অসুখী জীবনের সৃষ্টি হয়, তাই তাঁর বক্তব্য, প্রকৃত সুখ শুধু প্রণয়ে,

"সুখ যে এমন দুর্লভ বস্তু, সে সুখের মূল কোথায়? সুখের মূল প্রণয়ে। প্রণয় জগতে প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ দেবতা। এই অসীম বিশ্বরাজ্য প্রণয়ের হস্তমুষ্টি মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, মূর্খ, পাপী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ কেহই প্রণয়কে জয় করতে সক্ষম নহেন।"[১০০]

তাই প্রণয়ের মধ্য দিয়েই যুবতী তার স্বামীকে অন্তরে ধরে রাখবার এবং দুঃখ শোক মুক্ত হবার চেষ্টা করেছেন,

"...এই যে আমার "দশম দশা" উপস্থিত হইয়াছে, তবু লোকে যখন 'তোমার স্বামী, তোমার স্বামী" করিয়া তাঁহার সেই অসীম দয়ার অসীম গুণের ও অসীম মহত্ত্বের কথা বলে তখন যেন প্রাণের ভিতর কেমন একটু আনন্দ পাই - যখন সেই পবিত্র দেব মূর্তি "আমারই" বলিয়া ভাবিতে পাই, তখনই যেন প্রাণের ভিতর আনন্দ পাই"।[১০১]

সংসারের মানুষের মন বিচিত্র, তাই তার ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণাও বিচিত্র। মানুষ নিজেকে নিয়ে বড় ব্যস্ত, অপরের ব্যথা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা এবং ইচ্ছাও তাই পরিসীমিত। একথা বিবেচনা করে যুবতী তার মনবেদনা বিহগীর কাছে ব্যক্ত করে শোকাক্রান্ত অবস্থা থেকে নিজেকে কিছুটা মুক্ত করবার চেষ্টা করছেন, মানুষ অপেক্ষা বিহগীকে বেশী আস্থাশীল মনে হয়েছে লেখিকার। তাই যুবতীর এ ব্যথা লেখিকা তাঁর "পিঞ্জরে বিহগী" প্রবন্ধে মানুষের পরিবর্তে বিহগীর কাছে জানিয়েছেন। অত্যন্ত সাধারণ একজন নারীর মনবেদনা লেখিকা অত্যন্ত সহজ ও আন্তরিকভাবে তুলে ধরেছেন,

"ভাই বিহগি! তুমি একসময়ে যেমন কাহারও প্রিয়তম ছিলে, আমিও সেইরূপ একজন প্রাণসদৃশী স্নেহের পাত্রী ছিলাম। আমি হাঁটিয়া গেলে তিনি গায়ে ব্যথা পাইতেন। আমার কদক্ষরপূর্ণ পত্রবলি পর্য্যন্ত তাঁহার কত ভালবাসার কত আদরের জিনিষ ছিল। সেইসব পত্র তিনি সবুজ ফিতায় বাঁধিয়া আয়নার বাক্সের ভিতর পুরিয়া রাখিতেন, আমি তাহা দেখিয়া মনে মনে কত হাসিতাম। সেই সকল পত্র-তাঁহার প্রিয় পত্রিকা সকল লোকে নাকি আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়াছে "[১০২]

প্রসঙ্গক্রমে লেখিকা যুবতীর মুখ দিয়ে সতীদাহপ্রথা নিবারণের ব্যাপারে পতিব্রতা নারীর মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন,

"সকল মহাত্মারা সহমরণপ্রথা নিবারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারি মহত্ব বড় পুণ্য কর্ম করিয়া গিয়াছেন, অক্ষয় কীর্তি জাগরূক থাকিবে, স্বর্গের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে অধিকার পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই. একদিন দগ্ধ আর চিরদিন দগ্ধ। সতীদাহ-নিবারকদিগের দয়ার শত ধন্যবাদ। অবলা বলিয়া যিনি যা করেন, সবই শোভা পায়। আমাদের কপাল"।[১০৩]

অর্থাৎ স্বামী অবর্তমানে চিরদিন দগ্ধ হবার চেয়ে একদিনে দগ্ধ হয়ে পুড়ে মরা ভাল। এখানে বিধবা যুবতীর সংসারে অসহায় অবস্থার ব্যথাই প্রকাশ পেয়েছে। নিতান্ত সহায় সম্বলহীনা সমাজের বিধবা নারী, সংসারে তাকে সহ্য করতে হয় নানান ধরনের মানসিক ও শারিরিক কুসংস্কারের শিকার হবার যন্ত্রণা। তাই পুড়ে মরে এই সামাজিক কুসংস্কারের শিকার হয়ে যন্ত্রণা ভোগের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যুবতীর মত সতীদাহর

পক্ষেই। স্বামীহীনা যুবতী ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণ করার ক্ষেত্রেও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন,

"ঈশ্বরের বস্তু আবার ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার দুঃখ কি? যিনি দিয়াছিলেন তিনি লইয়াছেন, আমি কে? আমার কি? কিন্তু তবু ঈশ্বর দায়ী, আমার যেদিন বিবাহ হইয়াছিল, সেদিনকার কথা তো ঈশ্বর জানেন। সেই সকল পাঠ্য মন্ত্র, সেই সকল প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর জানেন। আমার জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা ভরণ পোষণ প্রভৃতি সমস্ত ভার যাঁহার হস্তে সমর্পণ হইল, তাঁহাকে, কি বুঝিয়া ঈশ্বর অপহরণ করিলেন? আমি জীবিতা থাকিতে ঈশ্বর কেমন করিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিলেন? তিনি ঈশ্বরকে অত ভক্তি করিতেন,.. "[১০৪]

তাই নিজের স্বামীকে ভুলে ঈশ্বরকে একান্ত আপনার জন ভাবা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। সংসারের কর্মবন্ধন স্বামীহীনার কাছে মোটেই সুখের নয়। বিহগীকে সে তার মনের কথা বলবার একমাত্র সঙ্গী মনে করে,

"আজি হইতে তুমি আমার "সই" হইলে। যখন এ-প্রবাহিনী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইবে তখনই তোমার নিকটে আসিব, অমনি মধুর স্বরে আমায় জুড়াইও। এত ভালবাসাবাসি হইল, দুজনে নূতন সম্বন্ধ পাতাইলাম....।[১০৫]

স্বামীহীনা যুবতীর বিনিদ্র রজনী কিভাবে কাটে,

"এই যে রাত্রি দুই'টা বাজিল। জগৎ নীরব। সকল জীব জন্তুই স্নেহময়ী-নিদ্রা-জননীর অঙ্কে সুষুপ্তি লাভ করিয়াছে। · আমাকে হতভাগ্য দেখিয়া নিদ্রাদেবীও পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাই এ গবাক্ষে বসিয়া কাঁদিতে হইতেছে, ...[১০৬]

সমস্ত জগৎ যখন নীরব প্রাণীকুল নিদ্রামগ্ন, এসময় স্বামীহীনা যুবতী বিনিদ্র রাত্রি কাটায় কোনো দৈববাণী শোনার প্রতিক্ষায়, তার অন্তরের বাসনাই তাকে জানায় যদি দৈববাণী তাকে জানিয়ে দিত, তার স্বামী তারই জন্য পরলোকে অপেক্ষা করছেন, তাকে আর কাঁদতে হবে না। বিনিদ্র রাত্রি জাগরণে যুবতীর মনে হচ্ছে, কোনো অপরূপা সুন্দরী দেবী তাকে তার স্বামীর কাছে নিয়ে যাচ্ছে. তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, যুবতী সেই সুন্দরী দেবীর পথ অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। এ অবস্থায় যুবতীর মনের ভেতরে যে কথাগুলি আন্দোলিত হচ্ছে লেখিকা তা বর্ণনা করেছেন—

"...তথাপি আজ আমাকে কেহই গৃহে আনিতে পারিবে না। আমি যাইতেছি, কি অবস্থায় যাইতেছি? উপমা নাই। এমন ভাগ্য কোন পুরুষের কি রমণীর হয় নাই—আমিই প্রথম, আমারই নূতন। যেদিন নির্বাসিতা সীতা রামচন্দ্রের সভায় যাইতেছিলেন, যেদিন ব্রজাঙ্গনা প্রভাস যজ্ঞে নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন, যেদিন বিষ্ণুপ্রিয়া অদ্বৈতচার্য্যের গৃহে পতি-সন্দর্শনে যাইতেছিলেন, সেদিন তাহাদের মনের যে রূপ অবস্থা, আজি আমার মনেরও সেই অবস্থা।"[১০৭]

যার বিচ্ছেদে যুবতীর কপাল পুড়েছে তাঁকে পাবার জন্য আজ সে মনের আনন্দে এগিয়ে চলছে সুন্দরী মধুর ভাষিনী দেবীকে অনুসরণ করে। কোথায় চলেছে তার তা জানা নেই, নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছে সে। চলার গতির যে বর্ণনা লেখিকা এঁকেছেন, যদিও বাস্তব নয়। তবুও তাঁর সহজ ভাষার গাঁথুনী সে বর্ণনায় দৃঢ়তা এনেছে।

"...সুহাসিনী সহাস্য মুখে কহিলেন, "এই যে সিঁড়ী দেখিতেছ ইহা পাঁচশত। এই সিঁড়ী ছাড়াইলে যে মন্দির দেখিবে, তিনি সেইখানেই আছেন...।"[১০৮]

স্বামীর সঙ্গে প্রথম দর্শনে কি কথা হবে, এতদিনে তাঁর কি কিছু পরিবর্তন হয়েছে, তিনি তাকে গ্রহণ করবেন কিনা, এ সমস্ত নানান চিন্তা করতে করতে যুবতী এগিয়ে চলেছে। এভাবে চলতে চলতে একটা সময় এ'ল যখন তার অর্ধনিদ্রা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, তার কাছে এসে দাঁড়াল বাস্তব অর্থাৎ এতক্ষণ যুবতী যা দেখেছে তা সবই ফাঁকি। তাই সে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন ঈশ্বরকে জানালো তার মনবেদনা,

"ব্যাকুলভাবে উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম, "মা পৃথিবী! অধম সন্তানের জন্য আজি একবার বিদীর্ণ হও মা! আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি, এ মরুভূমে মরীচিকার ছলনা, আর সয়না "হায়রে। পৃথিবীও আমার কথা শুনিল না—সেকালের পৃথিবী এখন নাই—আমার কপালে মৃত্যু হয় না।"[১০৯]

স্বামীহীনা যুবতী মনব্যথা জানিয়েছেন অরণ্যকে। তার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি পতি বিচ্ছেদের অনলে জ্বলছে, জীবনের সমস্ত সাধ আজ ভেঙ্গে গিয়েছে। তবুও অরণ্যের সামনে এসে তার মনে হচ্ছে হারানো দিনগুলি যদি সে আবার ফিরে পেতো তবে তার বেদনা দূর হয়ে যেত। কিন্তু ক্ষণিকের ঘোর কেটে গিয়ে বাস্তব তাকে আত্মজিজ্ঞাসা করতে সাহায্য করে এ'তো

কখনই সম্ভব নয়। তাই তার মনব্যথা আরো প্রবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে অরণ্যের কাছে—

"সুধাহীন সুধানিধি
বিধির কেমন বিধি
জীবন-লহরী মম সুধু মরুময়—
আর তো সহে না প্রাণে
অরণ্যে রোদন গানে
বহিল যে আঁখি ধারা কে মুছাবে হায়।"[১১০]

মানকুমারী বসুর "প্রিয় প্রসঙ্গ না হারানো প্রণয়" গ্রন্থখানির সবশেষ প্রবন্ধ "একাদশী"। একাদশী অর্থাৎ হিন্দু বিধবা নারীর উপর সামাজিক এক সংস্কার মেনে চলবার বিধি। এই বিধিকে লেখিকা যুবতীর বয়ানে পোড়া একাদশী বলে উল্লেখ করছেন। পোড়া একাদশী বলছেন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

"বাস্তবিকও আজ পোড়া একাদশী। যেদিন বঙ্গ-জননীর বিধবা কন্যাগণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হইয়া জননী অঙ্কে পতিত হন, আজ সেই পোড়া একাদশী। প্রাচীনা বিধবাগণ আজি কত কষ্ট পাইবেন। কত নববিধবা আজ এই কঠোর ব্রতে দীক্ষিতা হইবেন, যে কুসুম-সুকুমারা আতপ-তাপেই মলিন হইয়া পড়িয়াছেন, তিনিও প্রাণান্তে আজ, জলবিন্দু পান করিতে পাইবেন না—কেন না আজ পোড়া একাদশী"।[১১১]

কিন্তু একাদশীকেই আবার স্বাগত জানিয়েছেন লেখিকা এক যুবতীর বয়ানে,

"এই একাদশীর ব্রত আমাদের পরম ব্রত, কে না বলিবে? এই বৈধব্য বেশই আমাদের স্বর্গীয় প্রেমের অভিজ্ঞান ও এই ব্রহ্মচর্য্যই আমাদের পতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও পতিপূজা।"[১১২]

যেহেতু এই একাদশীর মধ্যদিয়েই বিধবা রমণীগণ তাদের স্বামীর অন্তরের কাছাকাছি আসে বলে যুবতী মনে করেন, তাই তার বিশ্বাস বঙ্গ রমণী কখনও বিধবা হয় না, কারণ মননে তারা স্বামীর কাছাকাছি, যুবতীর বয়ানে লেখিকার ধারণা যে, মৃত্যু মানুষকে কখনও দূরে সরিয়ে নিতে যেতে পারে না।

"...আমরা মরণশীল, মৃত্যুই নিত্য সম্পত্তি-যে অজ্ঞান সেই মৃত্যুকে পর মনে করে,...।"[১১৩]

আর এই কারণেই যুবতী মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যাতে করে সে মৃত্যুর

পর স্বর্গে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে লেখিকা তাঁর স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বলিত এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন এবং স্বামীহারাবার পর তাঁর মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনায়। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধে নিজের মনব্যথা নানা-জনে প্রকাশ করে আত্ম-সান্তনার 'বাণী'-র খোঁজে তিনি চঞ্চল হয়েছেন। কিন্তু এ 'বাণী' মুহূর্তের মধ্যেই রাত্রির অন্ধকারের মতো কালো হয়ে যায়। তাঁর ব্যথীত হৃদয় হতাশ হয়ে পড়ে।

'সাতক্ষীরায়' (৮৩-৯০) আট পৃষ্ঠায় বারোটি স্তবকের দীর্ঘ কবিতা দিয়ে গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখিকা। এই সাতক্ষীরা স্থানে গ্রন্থকর্ত্রীর পতিদেবতা পরলোকগমন করেন। লেখিকা স্বামীর মৃত্যুর ত্রয়োদশবর্ষে উক্ত স্থানে যান এবং তাঁর মনের যে অভিব্যক্তি তা কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি উক্ত কবিতাটি ১৪-ই আশ্বিন—১৩০৩ বঙ্গাব্দে রচনা করেন, বিষয়বস্তু বলবার অবকাশ রাখে না। এখানে লেখিকার মনের বেদনাসূচক জিজ্ঞাসা,

তুমি যে এসেছ চলি
"ত্বরায় আসিব" বলি
ত্রয়োদশ বর্ষে ফিরে গেলে না তোর আর !
হায় দেবতা আমার।[১১৪]

সাতক্ষীরায় যখন গ্রন্থকর্ত্রী যান, তখন তাঁর সঙ্গে একমাত্র কন্যাটিও ছিল। এই কন্যাকে স্বামীকে দেখাবার জন্য তিনি আকুল হয়ে বলেছেন—

দেখ দেবতা আমার।
তোমার স্নেহের মেয়ে
সাগ্রহে রয়েছে চেয়ে
সে যেন দেখিতে পাবে শ্রীচরণ কারু।[১১৫]

গ্রন্থকর্ত্রীর স্বামী যেহেতু এই সাতক্ষীরায় পরলোকগমন করেন, সেইহেতু এই স্থান তাঁর কাছে মহাতীর্থ, শ্রীক্ষেত্র, গয়া, কাশী, হরিদ্বার সবই এই স্থানে, এখানেই তিনি তাঁর পরম দেবতা ঈশ্বরের সঙ্গে পতি দেবতার উপস্থিতি অনুভব করেন।

এই সেই সাতক্ষীরা দেবতা আমার।
মানসে যা পূজি নিত্য,
এ যে সেই মহাতীর্থ,
....
....
তবু তুমি সাতক্ষীরে।
নীরবে নীরবে ধীরে—
কহিলে আমার কাছে কত কথা তাঁর।[১১৬]

মানকুমারী বসু তাঁর এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে নারীর অন্তরের কথা তুলে ধরবার যে প্রচেষ্টা রেখেছেন তা সার্থক রূপ পেয়েছে বলে বিশ্বাস।

রাজলক্ষ্মী দেব্যা

শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেব্যার 'ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব', ১৫ কার্ত্তিক ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক-সুধাকৃষ্ণ বাগচি। গ্রন্থটিকে লেখিকা মূলতঃ ধর্মীয় আলোচনা করেছেন এবং নিজেকে সমেত কয়েকজন ব্যক্তিত্বের জীবন যাত্রার কিছু ঘটনা আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে যে সমস্ত রচনা স্থান পেয়েছে পর্যায়ক্রমে সেগুলি হোলো—প্রভু যীশু, রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ, বাঘ আঁচড়া ও প্রাণনাথ মল্লিক, ৺কৈলাসচন্দ্র বাগচীর ইংরাজী ডায়েরী, শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের বাংলা ডায়েরী, অলৌকিক ঘটনা, শ্রীহট্টের কথা, মোহিতকৃষ্ণ ও মুকুন্দকৃষ্ণের ডায়েরীর কয়েকটি লেখা, আমার খাতা কিম্বা ছেঁড়া খাতার ক 'পাতা', সাধু মহাত্মাগণের কথা, ইত্যাদি।

রাজলক্ষ্মী দেবীই সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম মহিলা, যিনি শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছিলেন, সময়টা ছিল ১২৮৯ বঙ্গাব্দ। ব্রাহ্মসমাজে কাজ করতে গিয়ে যে নানান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন, লেখিকা তাঁদের কথার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কিছু ঘটনা তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বাগচী ছিলেন রাজলক্ষ্মী-দেব্যার স্বামী। তিনিও ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর ডায়েরীর কিছু অংশ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বামীর মনোভাব প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা রেখেছেন। প্রায় একশত পৃষ্ঠার গ্রন্থটিকে লেখিকা প্রথমেই

প্রভু যীশুর কথা বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী রচনা গুলিতে ব্রাহ্মধর্মের কথা কোনো ব্যক্তি বা কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বলতে গেলে শেষের দিকের এই লেখিকার পুঁথিজ্ঞান বিশেষ ছিল না। কিন্তু ধর্মীয় কারণে নানান ব্যক্তির সাহচর্যে তাঁর লেখনী যা মুদ্রিত অবস্থায় পাঠকের কাছে পৌঁছেছে—বিষয়টি তদানীন্তন সমাজের নারী প্রগতির ইঙ্গিত বহন করে। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ততটা জোড়ালো নয়, কিন্তু লেখিকা আত্মজীবনী লিখতে বসে তা শুধুমাত্র নিজের মধ্যেই আবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর পারিপার্শ্বিক জনের মধ্যে, সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ স্বামী এবং আরও কয়েকজন প্রিয়জনকে।

ঠাকুরবাড়ীর মহিলাদের লেখায় যে দৃঢ় বাঁধুনী আছে, বিষয়বস্তুতে যে জোড়ালো অনুভূত আছে যা সাহিত্য জগতে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করেছে সে ধরনের বিষয়বস্তুর জোড় কিম্বা দৃঢ় বাঁধুনী হয়ত বর্তমান আলোচ্য লেখায় কিছুটা অনুপস্থিত তবে একেবারেই নেই তা নয়। ধর্মীয় আলোচনার প্রসঙ্গে পুরুষের বক্তব্যের পাশাপাশি নারীর অর্থাৎ সুন্দরী মোহন বাবুর স্ত্রী হেমলতা দেবী, চন্দ্রকুমারের স্ত্রী, প্রভৃতি নারীর কথা উঁকি মেরেছে, একই সঙ্গে নিজের মুখ দিয়ে এবং স্বামীর মুখ দিয়েও বলিয়েছেন তিনি। 'আমার খাতা' কিম্বা ছেঁড়া খাতার ক 'পাতা' শিরোনামে নিজের দৈনন্দিন কথা, তারিখ অনুযায়ী ডায়েরী উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি স্বরচিত কবিতা-'জ্যোৎস্নার শেষ রাতের শোভা দর্শনে' (২৬, অগ্রহায়ণ ১৩০১), 'গভীর নিশীথে' (২০ মাঘ, ১৩০১) ; সংসারা-সক্তি', 'শেষের সময়', 'মরণ কাল', (এ তিনটি কবিতা রচনার সময় ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০১, শ্রীহট্ট), 'অরুণোদয়ে সূর্য্যদর্শন' (১মাঘ, ১৩০২), প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু সবাই ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ।

হেমলতা সরকার

হেমলতা দেবী ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে করা হয়েছে। 'ভারতের ইতিহাস' গ্রন্থটি বর্তমান আলোচ্য বিষয় হলেও উক্ত গ্রন্থটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৩১৫ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' পত্রিকার কার্তিক—চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে,

প্রবন্ধটির শিরোনাম 'ভারতের সারকথা।' এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু থেকে লেখিকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিব্যক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ প্রবন্ধে লেখিকা বলতে চেয়েছেন, ভারতবাসীর মনের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, আত্মাব্যতীত জগতে আর কিছুই সত্য নয়। ধনী, দরিদ্র উচ্চ, নীচ সবই বাইরের প্রকাশ, ধর্মীয় বিভেদ যত আছে তা সবই বাইরের প্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশের উপর ভিত্তি করে যদি এগোনো যায় তবে ভারতের মঙ্গল কখনই সম্ভবপর নয়। তাই ভারতের মঙ্গল, ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য এই বাইরের বিভেদ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটাতে হবে।

"জগৎবাসী মনুষ্যমাত্রেই জানেন, ভারতবর্ষ আত্মাব্যতীত আর কিছুকে কখনও সত্য বলে স্বীকার করে নাই। এই এক সত্য বা আত্মাই ভারতবর্ষের মর্ম, এই এক সত্য বা আত্মাকে নিষ্ঠাই ভারতবর্ষের কর্ম্ম। আত্মার পূজা ব্যতীত, আত্মাকে স্বীকার করা ব্যতীত, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা ব্যতীত যোগেশ্বর্য্যের লীলাভূমি, অদ্বিতীয় সত্যের প্রকাশ ক্ষেত্র, আত্মার প্রতিষ্ঠা স্থান, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। যে মুহূর্তে সমস্ত ভারত-বাসী একত্র সমবেত হয়ে, জ্ঞানী,অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, রুগ্ন, সুস্থ, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শ্রেষ্ঠকর্মী, নিকৃষ্টকর্মী সকলের অন্তরে বাহিরের প্রত্যয় প্রকাশমান এই চৈতন্যময় আত্মাকে অন্তরে বাহিরে স্বীকার করিবে সেই মুহূর্তে ভারতবর্ষ বা ভারতবাসী অন্তরে বাহিরে মুক্তিলাভের দ্বারা জ্ঞানে ধন্য, ভাবে ধন্য, কর্ম্মে ধন্য হ'য়ে আপনাকে বা মনুষ্যজাতিকে বা জগতকে পরম কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করিবে।"[১১৭]

উক্ত প্রবন্ধ উপস্থাপনায় লেখিকার চিন্তা শক্তির এবং লেখনীর দৃঢ় বাঁধুনী স্পষ্টতঃ। উনবিংশ শতাব্দীর বলতে গেলে মধ্যদশক থেকে নারীশিক্ষার হাতে খড়ি। এমতাবস্থায় একজন লেখিকার কলমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রমাণ করে যে, একজন নারীর কলমও যথেষ্ট জোরালো হওয়া সম্ভব।

গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী

গিরীন্দ্র মোহিনী দেবী সাহিত্য জগতে কবি হিসাবেই সুপরিচিতা। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ তদানীন্তন সময়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল।

কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়া লেখিকা 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারী। গ্রন্থটিতে রচয়িত্রীর নামোল্লেখ নেই। এতে পদ্যগদ্যে লেখা পাঁচখানি পত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম চারখানি তাঁর স্বামীকে লেখা। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে গদ্যে-পদ্যে লেখা লেখিকার একখানি পত্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা "মানসী—মর্মবাণী' পত্রিকায় (২৪২—২৪৮ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রখানি 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' গ্রন্থের পঞ্চম বা শেষ পত্র হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উক্ত পঞ্চম পত্রখানি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বাকী পত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। 'বসুমতী' পত্রিকা প্রকাশন কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত 'গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলীতে জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' গ্রন্থটি স্থান পায়নি অর্থাৎ প্রকাশিত হয়নি। উক্ত কারণে উক্ত চারটিপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা উক্ত পঞ্চম পত্রখানি প্রকাশ করবার মুখবন্ধে সম্পাদক পত্রটি রচনার ইতিহাস এবং পত্রটি তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশের কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উক্ত কয়টি লাইন উপস্থাপিত হোলো,—

"এ দেশে পত্রাদি সুরক্ষিত হয় না, এবং এই জন্য অধিকাংশ পত্রই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমরা যে বালারচনাটি প্রকাশিত করিতেছি উহা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়কে গদ্যে পদ্যে লিখিত একখানি পত্রিকামাত্র। পত্রখানি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লিখিত—তখন গিরীন্দ্রমোহিনীর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। এই পত্র রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে চৌদ্দ বৎসর বয়সে, অন্তর্বত্নী অবস্থায় গিরীন্দ্রমোহিনী একদিন হঠাৎ পড়িয়া যান। ইহার পর, গর্ভধারণের অষ্টম মাসে, বহুকষ্টে মৃতপ্রায় সন্তান প্রসব করিয়া তিনি সংকটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হন। এদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালী প্রচলনে অগ্রণী বহুবাজার দত্ত বংশোদ্ভব রাজেন্দ্র দত্তের (রাজাবাবুর) নিকট হইতে মহেন্দ্রলাল তখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল নিরতিশয় পরিশ্রম ও যত্নসহকারে দত্ত বধূ গিরীন্দ্রমোহিনীকে সুস্থ করেন। যখন সকলেই প্রসূতির

জীবনরক্ষা করিতে ব্যস্ত এবং নবজাত শিশুটিকে মৃত ভাবিয়া একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তখন হঠাৎ মহেন্দ্রলালের দৃষ্টি শিশুটির প্রতি পতিত হয় এবং তাহাতে জীবনের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া অদ্ভুত চিকিৎসা কৌশলে তাহার জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দেন। এই শিশুটিই গিরীন্দ্র মোহিনীর প্রথম সন্তান প্রকাশচন্দ্র। নিম্নোদৃত পত্রে গিরীন্দ্রমোহিনী মহেন্দ্রলালের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। মহেন্দ্রলাল প্রায়ই বলিতেন, "ছেলেটি আমার, তোমরা তো ছেলেকে ফেলিয়া দিয়াছিলে। গিরীন্দ্রমোহিনী সরকার মহাশয়ের এই স্নেহের অধিকার অস্বীকার করিতেন না এবং উদ্ধৃতপত্রে তাহার উল্লেখ আছে।"[১১৮]

পত্রখানির পরিধি দীর্ঘ নহে, কিন্তু গদ্য-পদ্যে বর্ণিত বিষয়বস্তু লেখিকার চৌদ্দ বৎসর বয়সের রচনার পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসনীয় তা বলবার অবকাশ রাখে না। পত্রটির শুরুতেই তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করে সম্বোধন করেছেন।

"ময়িমহৎ রঞ্জন নক্ষমতা
কিমুত্বং প্রশংসাৎ হাহারতা
দোষান্ পরিহায় দষ্টবুধা
প্রভাকরস্থ মম্বুজ প্রকাশতাং,
প্রেথ প্রফুল্লতেচ্ছয়া সরোজ সন্নিধানে
ভ্রমস্তং তদ্রুপং ময়েচ্ছাম্।"[১১৯]

পত্রখানির বিষয়বস্তু পত্রিকা সম্পাদকের বক্তব্য থেকে স্পষ্টতঃ। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে লেখিকা পত্রখানিতে যেভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সেখানেও যথেষ্ট বিনয় ও সংযম প্রকাশ পেয়েছে।

"...আপনি যদ্রুপ উপকার করিয়াছেন তাহার শতাংশের একাংশও এ সামান্য নারী পরিশোধ করিতে পারিবে না। যদি সমুদ্র মস্যাধার, মন্দার মেরু লেখনী ও চতুর্মুখ লেখক হইতেন তাহা হইলে মহাশয় যে কতদূর স্নেহ ও উপকার করেন তাহা বর্ণন হইত কিনা সন্দেহ এবং ভবদীয়োপকারোপযোগ্য এমৎ কোন দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হইল না যে মহাশয়কে অর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ ও আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করি...।"[১২০]

শিশুটির উপর ডাঃ মহেন্দ্রলাল মহাশয়ের অধিকার মাতা গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী সানন্দেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

"...শিশুটীকে আপনাকেই সমর্পণ করা হইয়াছে, মহাশয় উহাকে যেরূপ স্নেহ করেন, ভরসা করি তাহা কখনই বিচলিত হইবে না।"[১২১]

পত্রখানি পদ্যে শেষ করেছেন লেখিকা। এখানে পদ্য:রচনার দক্ষতা লক্ষণীয়—

ধরাতে কে হিতকর মিত্রের মতন
তুল্য তার মিলা ভার অমূল্য রতন
বিপদে যে হিতকর তারি নাম মিত্র
সম্পদ কালের বন্ধু সে নয় বিচিত্র

শুধিতে তোমার ধার না পারিব কভু আর
পরিশোধ নহে দিলে প্রাণ
পরহিতে রত মন কত ধন বিতরণ
নিজে সদা সামান্যের প্রায়[১২২]

চৌদ্দ বছর বয়সের কিশোরী লেখিকার এই পত্রখানির বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তাঁর লেখনী সত্যই প্রশংসনীয়। পরবর্তীকালে লেখিকার যে কবি হিসাবে স্বীকৃতিলাভ তা তাঁর কৈশরের রচনা থেকেই শুরু। শুধু পদ্য নয়, গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর লেখনী প্রশংসনীয়।

সূত্র নির্দেশ

১. 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি'—শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, শক ১৭৮৭, —মুখবন্ধ
২. ঐ পৃষ্ঠা—১
৩. ঐ পৃষ্ঠা—২
৪. ঐ পৃষ্ঠা—৩
৫. ঐ পৃষ্ঠা—৭
৬. ঐ পৃষ্ঠা—৯
৭. ঐ পৃষ্ঠা—১০
৮. ঐ পৃষ্ঠা—১১—১২

৯. ঐ পৃষ্ঠা—১৫
১০. ঐ পৃষ্ঠা—২২—২৩
১১. ঐ পৃষ্ঠা—২৬
১২. 'হিন্দু ফিমেলস্ বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'—শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী কর্তৃক প্রণীত। শক ১৭৮৫, ভূমিকা, পৃষ্ঠা—১
১৩. হিন্দু ফিমেলস্ বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'—পুস্তকের 'বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের জন্ম' শিরোনামের—পৃষ্ঠা—২
১৪. ঐ —পুস্তকের 'মহিলাগণের বাল্যাবস্থায় ক্রিয়া এবং তাহাদিগের প্রতি পিতামাতার ব্যবহার' শিরোনামের—পৃষ্ঠা—৬-৭
১৫. ঐ —পুস্তকের 'কৌলীন্য মর্যাদা' শিরোনামের—পৃষ্ঠা—৯
১৬. ঐ —পুস্তকের 'জাতিভেদ' শিরোনামের—পৃষ্ঠা—৩৭
১৭. ঐ —পুস্তকের 'বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের বিদ্যাভ্যাস' শিরোনামের পৃষ্ঠা—৬৫-৬৬
১৮. 'হিন্দু ফিমেলস্ বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'—পুস্তকের 'বৈধব্য-যন্ত্রণা' শিরোনামে—পৃষ্ঠা—৭২
১৯. 'ভারতী' পত্রিকা ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, পৃষ্ঠা—২৬৩
২০. 'ভারতী' পত্রিকা ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, পৃষ্ঠা—২৬৪
২১. 'ভারতী' পত্রিকা ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, পৃষ্ঠা—২৭২
২২. 'ভারতী' পত্রিকা ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ, পৃষ্ঠা—১৫৬
২৩. 'ভারতী' পত্রিকা ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ, পৃষ্ঠা—১৫৭
২৪. 'ভারতী' পত্রিকা ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ, পৃষ্ঠা—১৫৯
২৫. 'ভারতী' পত্রিকা ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ, পৃষ্ঠা—১৬০
২৬. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ, পৃষ্ঠা—১৬২
২৭. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ, পৃষ্ঠা—১৬৩
২৮. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ চৈত্র, পৃষ্ঠা—৫৫১
২৯. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ চৈত্র, পৃষ্ঠা—৫৫৭
৩০. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ চৈত্র, পৃষ্ঠা—৫৫৫
৩১. 'ভারতী' পত্রিকা' ১২৯০ বঙ্গাব্দ মাঘ, পৃষ্ঠা—৪৬০
৩২. 'পৃথিবী'-স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত গ্রন্থের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।

৩৩. 'দীপনির্বাণ' স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ শক) গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে সংগৃহীত—পৃষ্ঠা—১৪-১৫

৩৪. ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা—১৬-১৮

৩৫. ঐ পৃষ্ঠা—২৪-২৫

৩৬. ঐ পৃষ্ঠা—২৫

৩৭. 'তারাচরিত'—প্রসন্নময়ীদেবী, প্রণীত, পৃষ্ঠা—৪

৩৮. 'তারাচরিত'—প্রসন্নময়ী দেবী প্রণীত, পৃষ্ঠা—১৩

৩৯. 'তারাচরিত'—প্রসন্নময়ী দেবী প্রণীত, পৃষ্ঠা—১৮

৪০. ঐ পৃষ্ঠা—৪৩

৪১. ঐ পৃষ্ঠা—৪৩-৪৪

৪২. ঐ পৃষ্ঠা—৭৮

৪৩. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮, বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ, পৃষ্ঠা—২৩১

৪৪. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, পৃষ্ঠা—২৩২

৪৫. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, পৃষ্ঠা—২৩২-২৩৩

৪৬. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, পৃষ্ঠা—২৩৩

৪৭. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, পৃষ্ঠা—২৩৩

৪৮. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২০৮ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, পৃষ্ঠা—২৩৪

৪৯. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, পৃষ্ঠা—২৩৬

৫০. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, পৃষ্ঠা—২৩৭

৫১. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, পৃষ্ঠা—২৩৭

৫২. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক, পৃষ্ঠা—৩৩৩

৫৩. 'ভারতী' পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ কার্ত্তিক, পৃষ্ঠা—৩৩৭

৫৪. 'ভারতী ও বালক', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, 'শাশুড়ী ও বৌ', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১১৮-১১৯

৫৫. 'ভারতী ও বালক' ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১১৫

৫৬. 'ভারতী ও বালক', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১১৭

৫৭. 'ভারতী ও বালক', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১১৯

৫৮. 'ভারতী ও বালক', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১২০

৫৯. 'সাধনা', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, মাঘ, 'আদরের না অনাদরের', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১৩৬

৬০. সাধনা, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ মাঘ, 'আদরের না অনাদরের', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী', পৃষ্ঠা- ১৩৯

৬১. 'সাধনা', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ মাঘ, 'আদরের না অনাদরের, শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১৪০

৬২. 'সাধনা', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ মাঘ, 'আদরের না অনাদরের', শরৎকুমারা চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১৪১

৬৩. 'সাধনা', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, মাঘ, 'আদরের না অনাদরে', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১৪৩

৬৪. 'সাধনা', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, মাঘ, 'আদরের না অনাদরের', শরৎকুমারা চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১৪৬

৬৫. 'সাধনা', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, মাঘ, 'আদরের না অনাদরের', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১৪৬

৬৬. 'সাধনা', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ মাঘ, আদরের না অনাদরের', শরৎকুমারী চৌধুরানী, রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১৪৭

৬৭. 'সাধনা', ১৩০০ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, 'কন্যাদায়', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১৫৮-১৫৯

৬৮. 'সাধনা', ১৩০০ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, 'কন্যাদায়', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১৬৪-১৬৫

৬৯. 'সাধনা', ১৩০০ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় 'কন্যাদায়', শরৎকুমারী দেবীর রচনাবলী, পৃষ্ঠা—১৬৪

৭০. 'মেয়েযজ্ঞি', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, প্রকাশকাল, শ্রাবণ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—২১০ (ভারতী পত্রিকা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র)

৭১. 'মেয়েষজ্ঞি', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী। পৃষ্ঠা—২১১ (ভারতী পত্রিকা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ ভাদ্র।)

৭২. 'মেয়েষজ্ঞি', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী। পৃষ্ঠা—২১২ ('ভারতী' পত্রিকা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র)।

৭৩. 'মেয়েষজ্ঞি', শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা—২১৪ (ভারতী পত্রিকা ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র)।

৭৪. 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ (৯-ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, যৌতুক, পৃষ্ঠা—৩৯৭)

৭৫. 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৌষ (৯ম বর্ষ-২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা যৌতুক, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা—৪৭৯)

৭৬. 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৌষ (৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা), 'যৌতুক' সপ্তম পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা—৪৮০

৭৭. 'মানসী ও মর্মবাণী', ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৌষ (৫ম সংখ্যা) 'যৌতুক' (নবন পরিচ্ছেদ), পৃষ্ঠা—৪৮৩-৪৮৪

৭৮. মানসী ও মর্মবাণী', ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৌষ (৫ম সংখ্যা) 'যৌতুক' (দশম পরিচ্ছেদ), পৃষ্ঠা—৪৮৪

৭৯. 'মানসী ও মর্মবাণী' ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৌষ (৫ সংখ্যা) 'যৌতুক' (দশম পরিচ্ছেদ), পৃষ্ঠা—৪৮৫

৮০. 'মানসী ও মর্মবাণী', ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৌষ (৫ সংখ্যা) 'যৌতুক' (দশম পরিচ্ছেদ), পৃষ্ঠা—৪৮৫

৮১. 'মানসী ও মর্মবাণী', ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৌষ (১ম বর্ষ-২য় খণ্ড-৫ম সংখ্যা) 'সোনার ঝিনুক' (নবম পারচ্ছেদ, পৃষ্ঠা—৩৯৩।

৮২. 'মানসী ও মর্মবাণী' ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৌষ (১৩ বর্ষ, ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা), 'সোনার ঝিনুক' (দশম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-৩৯৫)

৮৩. 'মানসী ও মর্মবাণী', ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৌষ 'সোনার ঝিনুক' (দশম পরিচ্ছেদ) পৃষ্ঠা—৩৯৬।

৮৪. 'মানসী ও মর্মবাণী', ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, মাঘ, 'সোনার ঝিনুক' (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ) পৃষ্ঠা—৫০১।

৮৫. 'প্রিয়নাথ মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুসুম' 'ইন্দিরাদেবী (প্রকাশ ১১ মাঘ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) ভূমিকা হইতে সংগৃহীত. পৃষ্ঠা ।/• (পাঁচ)।

৮৬. 'প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুসুম'—ইন্দিরাদেবী, পৃষ্ঠা ১—২।

৮৭. 'প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুসুম'—ইন্দিরাদেবী, পৃষ্ঠা ৩—৪।

৮৮. 'প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুসুম'—ইন্দিরাদেবী, পৃষ্ঠা ১৪—১৫।

৮৯. 'প্রিয়নাথ শাস্ত্র মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুসুম'—ইন্দিরাদেবী, পৃষ্ঠা ২১—২৩।

৯০. 'প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুসুম'—ইন্দিরাদেবী, পৃষ্ঠা ২৩।

৯১. 'প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুসুম'—ইন্দিরাদেবী, পৃষ্ঠা ২৬—২৮।

৯২. প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়'—মানকুমারী বসু, গ্রন্থের 'দুর্গোৎসব' শিরোণামে, পৃষ্ঠা—২।

৯৩. 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়', মানকুমারী বসু, গ্রন্থের 'দুর্গোৎসব' শিরোনামে, পৃষ্ঠা ৪—৫।

৯৪. 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়', মানকুমারী বসু, গ্রন্থের 'দুর্গোৎসব' শিরোনামে, পৃষ্ঠা—১১।

৯৫. 'প্রিয়প্রসঙ্গ' বা হারানো প্রণয়', মানকুমারী বসু, গ্রন্থের 'তুমি কোথায়' শিরোনামে, পৃষ্ঠা ১৭।

৯৬. 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়', মানকুমারী বসু, গ্রন্থের 'তুমি কোথায়' শিরোনামে, পৃষ্ঠা ২১।

৯৭. 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়' মানকুমারী বসু গ্রন্থের, শিরোনাম-চিত্রপট' পৃষ্ঠা ২৪—২৫।

৯৮. 'চিত্রপট'—পৃষ্ঠা ২৯ 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়', মানকুমারী বসু।

৯৯. 'চিত্রপট',—পৃষ্ঠা ৩৫। ঐ।

১০০. 'মুকুরে মুখ',—পৃষ্ঠা ৪৩। ঐ।

১০১. 'মুকুরে মুখ',—পৃষ্ঠা ৪৬। ঐ।

১০২. 'পিঞ্জরে বিহগী'—পৃষ্ঠা ৫১। ঐ।

১০৩. 'পিঞ্জরে বিহগী'—পৃষ্ঠা ৫১। ঐ ।
১০৪. 'পিঞ্জর বিহগী'—পৃষ্ঠা ৫২। ঐ ।
১০৫. 'পিঞ্জর বিহগী'—পৃষ্ঠা ৫৬। ঐ ।
১০৬. 'মরভূমি মরীচিকা'—পৃষ্ঠা ৫৯। ঐ ।
১০৭. 'মরুভূমে মরীচিকা'—পৃষ্ঠা ৬১—৬২। ঐ ।
১০৮. 'মরুভূমে মরীচিকা'—পৃষ্ঠা ৬৩। ঐ ।
১০৯. 'মরুভূমে মরীচিকা'—পৃষ্ঠা ৬৭। ঐ ।
১১০. 'অরণ্যে রোদন' (একাদশ স্তবক)-পৃষ্ঠা ৭১-৭২। ঐ ।
১১১. 'একাদশী'—পৃষ্ঠা ৭৮। ঐ ।
১১২. 'একাদশী'—পৃষ্ঠা ৭৯। ঐ ।
১১৩. 'একাদশী'—পৃষ্ঠা ৮০। ঐ ।
১১৪. 'সাতক্ষীরায়' (প্রথম স্তবক)—পৃষ্ঠা ৮৩। ঐ ।
১১৫. 'সাতক্ষীরায়' (ষষ্ঠ স্তবক)—পৃষ্ঠা ৮৫। ঐ ।
১১৬. 'সাতক্ষীরায়' (দ্বাদশ স্তবক)—পৃষ্ঠা ৮৯। ঐ ।
১১৭. 'ভারতের সারকথা' হেমলতা সরকার, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, 'প্রবাসী', কার্তিক চৈত্র সংখ্যা।
১১৮. 'মানসী মর্মবাণী', ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কার্তিক', 'গিরীন্দ্রমোহিনী বাল্যরচনা,—পৃষ্ঠা ২৪৩।
১১৯. 'মানসী ও মর্মবাণী' ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কার্তিক, 'গিরীন্দ্র মোহিনার বাল্যরচনা'—পৃষ্ঠা ২৪৩।
১২০. 'মানসী ও মর্মবাণী', ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কার্তিক, 'গিরীন্দ্র মোহিনীর বাল্যরচনা'—পৃষ্ঠা ২৪৭।
১২১. 'মানসী ও মর্মবাণী', ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কার্তিক, 'গিরীন্দ্রমোহিনীর বাল্যরচনা',—পৃষ্ঠা ২৪৮।
১২২. 'মানসী ও মর্মবাণী'. ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কার্তিক 'গিরীন্দ্রমোহিনীর বাল্যরচনা',—পৃষ্ঠা ২৪৮।

চতুর্থ অধ্যায়

রসসাহিত্যের ধারা

কথা ও কাহিনী

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যদশকের পর থেকেই নারী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন কিছু পত্রিকায় যে নারীরচিত প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, কবিতা প্রকাশিত হয়, তদানীন্তন পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টালেই তা স্পষ্টতঃ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখ্য দশজন মাত্র লেখিকার কয়েকটি প্রবন্ধ, রম্যরচনা আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত লেখিকাদের পরিচয় শুধুমাত্র প্রবন্ধকার হিসেবেই নয়, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন যাঁদের রচিত গল্প, উপন্যাস, কবিতা, তদানীন্তন পত্র-পত্রিকায় অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গেই স্থান পেয়েছে।

এঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, প্রসন্নময়ী দেবী, মানকুমারী বসু, প্রমুখ লেখিকার কয়েকটি গল্প, উপন্যাস, বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের লেখনী কতটা আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয়েছে তা বোঝা যাবে।

উক্ত লেখিকাগণ ছাড়াও এ অধ্যায়ের কথা ও কাহিনী শিরোনামে অন্য যে সব লেখিকার গল্প কিম্বা উপন্যাস আলোচনা করবার প্রয়াস রাখা হয়েছে তাঁরা হলেন, যথাক্রমে বিনোদিনী দাসী, ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, মিসেস হানা ক্যাথেরীন মালেন্স, হেমাঙ্গিনী দেবী, এবং সরোজকুমারী গুপ্তা।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

শুরুতেই যাঁর রচিত গল্প আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে তিনি হলেন ঠাকুর পরিবারের অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ইনি 'ভারতী' পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার সম্পাদনা দায়িত্বভারও তিনি সানন্দে গ্রহণ করে স্বকার্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালনে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমান আলোচ্য গল্পটি তাঁরই সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় (বৈশাখ চৈত্র, ১২৯২ বঙ্গাব্দ) একটিমাত্র সংকলনেই কয়েকটি ভাগে অর্থাৎ প্রথম ভাগে ৪৫ পৃষ্ঠা থেকে ৪৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় ভাগে ৯৬

পৃষ্ঠা থেকে ১০০ পৃষ্ঠা এবং তৃতীয় ভাগে ১১৮ পৃষ্ঠা থেকে ১২৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়, গল্পটির শিরোনাম 'আশ্চর্য্য পলায়ন', ছোটদের জন্য দীর্ঘ আয়তনের গল্প।

লেখিকা গল্পটির স্থান ঠিক করেছেন রুষিয়া। রুষিয়ায় রাজা-প্রজার বিবাদ লেগেই থাকে। রাজার প্রতি প্রজারা অনেকেই ক্রুদ্ধ, কারণ প্রজাপীড়ন, এই কারণেই প্রজাদের মধ্যে কয়েকজন দল বেঁধেছেন, উদ্দেশ্য, রাজার অত্যাচার বন্ধ করা। এঁরা দলভুক্ত কোনো ব্যক্তির বাড়িতে কিম্বা কোন নির্জন স্থানে অতি গোপনে ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সিদ্ধিলাভের কিছুদিন পূর্বেই রাজকর্মচারীর হাতে তাঁরা ধরা পড়েন। এঁরা কিয়েতের কারাগারে বন্দী। এঁদের সংখ্যা সর্বসমেত চৌদ্দজন, আটজন পুরুষ এবং ছয়জন স্ত্রীলোক, এঁরা বিদ্রোহিতা, গুপ্তনৈতিক সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া, পুলিসকে বাধা দেওয়া, এ সমস্ত দোষে দোষী সাব্যস্ত হন। চার দিন ধরে বিচারের পর তিনজনের ফাঁসির এবং অবশিষ্টের কারাবাসের আদেশ হোলো। কারাবাস অর্থাৎ তীব্র শীতের দেশ সাইবেরিয়ায় নির্বাসন।

এই নির্বাসিতদের মধ্যে ভেবাগোরিও মোগ্রিয়েভিচ্ একজন সম্ভ্রান্ত নির্বাসিত ব্যক্তি। তাঁর সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ও সেখান থেকে পলায়নের বিবরণের মধ্য দিয়েই লেখিকা তাঁর গল্পের ইতি টেনেছেন। দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ঐ ব্যক্তি পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁব বন্ধুর কাছে। ঘটনাটি যেমন রোমহর্ষক তেমনি উপভোগ্য। লেখিকা তাই গল্পটির নামকরণ করেছেন 'আশ্চর্য্য পলায়ন'। গল্পের উক্ত নির্বাসিত ব্যক্তির পলায়নের ঘটনা বৃত্তান্তের সঙ্গে নামকরণের যথেষ্ট সামঞ্জস্য ঘটেছে। গল্পটি শিশুদের পত্রিকার জন্য একটি উৎকৃষ্ট রচনা এবং উৎকৃষ্টতা সাধনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক, এ দাবী অযৌক্তিক নয়। পলায়নের ঘটনাটি সংক্ষেপে—

বন্দীব পোষাকে মোগ্রিয়েভিচ্ অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যাত্রা করলেন,

"আমাদের মত কয়জন উচ্চবংশজাত লোককে কেবলমাত্র বন্দীর কাপড় পরাইয়া দিল, অন্তদের মস্তক মুণ্ডন, পায়ে বেড়ি পর্য্যন্ত হইল। যাহাদের কেবলমাত্র নির্বাসন, তাহাদের কাপড়ে একটা করিয়া হলদে রংয়ের চিহ্ন, যাহাদের কঠিন পরিশ্রমের সহিত নির্বাসন তাহাদের কাপড়ে ঐরূপ দুইটা চিহ্ন। আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যাইতে হইবে

তাহা কি জানিতে পাইব না?' জেনারেল গুরার্ণে উত্তর দিলেন পূর্ব সাইবিরিয়ায় ...চৌদ্দ বৎসর কঠিন পরিশ্রম।"[১]

ট্রেনে **নিজ্‌নি নভগরদ, জলপথে গর্ম** পর্য্যন্ত যাবার পর তাঁরা একখানা ছোট তিন চাকার ঘোড়ার গাড়ি করে যেতে লাগলেন। এ পথেই মোগ্রিয়েভিচ্‌ একবার পালাবার চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হোলো, সাইবেরিয়ার বন্দীরা নিজেদের মধ্যে বদলাবদ্‌লি করে থাকে। তিনি তাই ইরকুটস্কে পৌছাবার চৌদ্দদিন বাকি থাকতে একাজটা সেরে নিলেন, কিছু অর্থের বিনিময়ে।

"পাভ্‌লভ্‌ যিনি আমার স্থানভুক্ত হইলেন তাঁহার চাষার ঘরে জন্ম, ডাকাতি ব্যবসা, তিনি বার টাকা, এক জোড়া বুট, একটা ফ্লানেলের কাপড় লইয়া বদ্‌লি হইতে স্বীকার পাইলেন।...আড্ডায় পৌছিয়া মিনিট কতকের মধ্যে আমরা বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া লইলাম।...পাভ্‌লভ্‌ মুখে রুমাল বাঁধিয়া একটা বেঞ্চে পড়িয়া রহিল। যখন পুরাতন রক্ষকেরা বিদায় লইল তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কি করিয়া এমন সহজে রক্ষকদিগের চক্ষে ধূলা দিতে পারিলাম এখন ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।"[২]

পাভ্‌লভ্‌ প্রথমোক্ত প্রকার বন্দী অর্থাৎ অনেকটা স্বাধীন। তাই পাভ্‌লভ্‌ বেশধারী মোগ্রিয়েভিচ্‌ এই স্বাধীনতাটুকুকে কাজে লাগিয়ে সঙ্গের কিছু পশমের কাপড় বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে নিলেন পালাবার প্রস্তুতি হিসাবে। পরদিন বেলা দশটার সময় প্রচণ্ড শীত থাকা সত্ত্বেও রওনা হলেন। প্রচণ্ড শীত এবং ক্ষুধার যাতনাকে উপেক্ষা করে দিনের বেলায় পথ চলা এবং রাত্রে কোনো না কোনো কৃষকের কুটীরে রাত্রি যাপন। এভাবে চলছে। একদিন বিকালে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তিনি চাকচিক্যশূন্য একটি কুটীরে প্রবেশ করলেন এবং রুসিয়ার রীতি অনুসারে সেন্টের ছবির সামনে গিয়ে ক্রসের চিহ্ন করলেন। দীর্ঘ শ্বেত শশ্রুধারী একটি লোক সে গৃহে ছিল। তাঁর কাছ থেকে একটি রুটি কিনে তিনি রাত্রিটুকুর জন্য স্নানের ঘরে আশ্রয় নিলেন, এখান থেকে পোশাকের কিছুটা পরিবর্তন করে পরদিন ভোরে রওনা হয়ে গ্রাম থেকে পঁচাত্তর ক্রোশ দূরে বন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিবর্তিত চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা—

"কৃষকের স্নানের ঘরে ধূম নির্গমণের পথ প্রায়ই থাকে না, এইজন্য ধুঁয়াতে

সমস্ত ঘর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। আমার ঝুলি হইতে একটি বাতি বাহির করিয়া জ্বালাইলাম। আমি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু ঘুমাইবার আগে বাতির চর্বি এবং দেওয়াল হইতে ঝুল লইয়া আমার কাপড়ের হলদে রং পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ না হউক রংগের এতটা পরিবর্তন হইল যে খুব নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে আসল ব্যাপার সহসা কেহ টের পাইবে না।"[৩]

বন্ধুর বাড়ীতে এসে বন্ধুরই সহযোগিতায় একবৎসর সাইবেরিয়ায় কাটিয়ে যখন তিনি দেখলেন পুলিশ কর্মচারীরা তাঁকে খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছে তখন সেলীভানফ্ নামে এক মৃত ব্যক্তির নামগ্রহণ করে তার পাশপোর্টের সাহায্যে জেনেভায় পৌঁছোলেন। এখানে, এসেই নির্বাসিত মোগ্রিয়েভিচ্ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করলেন,

"জেনেভায় পৌঁছিয়া আমার মনে হইল যে, যথার্থই আবার আমি স্বাধীন হইলাম।"[৪]

সতেরো-আঠারো পৃষ্ঠার ছোটদের জন্য লেখা গল্পটিতে ভাষা এবং সংলাপের বাঁধুনী যথেষ্ট মজবুত। গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখিকার চিন্তাশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঠাকুর পরিবারের বধূ হয়েও স্বামীর সহযোগিতায় বেশ কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন বলেই হয়ত তিনি প্রবন্ধ কিম্বা গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে এতটা সাফল্যলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্পটির বিষয়বস্তুতে রাজ অত্যাচারের প্রতিবাদ করা, রাজদ্রোহী দোষে দুষ্ট হয়ে বন্দী অবস্থায় সুকৌশলে পলায়নের প্রচেষ্টা এবং তাকে কার্যকরী করা প্রভৃতি গল্পের চেহারাকে সমৃদ্ধ করেছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী বাঙ্গলা সাহিত্য রচনার শুরুতে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্ধশতকের পরবর্তী সময়ে সুলেখিকা হিসাবে পরিচিতিলাভে সক্ষম হয়েছেন। দীর্ঘকাল ধরে অর্থাৎ যথাক্রমে ১২৯১ থেকে ১৩০১ বঙ্গাব্দ এবং ১৩১৫ থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দ সময়ের জন্য তিনি 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়কালে 'ভারতীর' পাতায় তাঁর রচিত বেশ কিছু প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রকাশ

লাভ করে। তবে উপন্যাস, গল্প রচনাতেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক পরিস্ফুট। বঙ্গমহিলা লেখিকাগণের মধ্যে তিনিই বোধহয় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ', প্রকাশকাল ১২৮৩ বঙ্গাব্দ, ১৫—ডিসেম্বর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

বর্তমান অধ্যায়ে তাঁর রচিত যে উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচিত হবে সেগুলি হোলো, যথাক্রমে-'দীপনির্বাণ', 'ছিন্নমুকুল', 'স্নেহলতা', 'বিদ্রোহ', 'ফুলের মালা', এবং 'কাহাকে'। উক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বিদ্রোহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'দীপনির্বাণ' এর বিষয় পৃথিরাজ সংযুক্তার কাহিনী, তবে ঘটনা এবং চরিত্রের কিছুটা অতিরঞ্জন পরিলক্ষিত হয়। 'ছিন্নমুকুল' রোমান্সের একঅদ্ভুত উপস্থাপনা। 'কাহাকে' একটি রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী। 'ফুলের মালা' উপন্যাসটিতে ব্যর্থ প্রেমিকার আত্মত্যাগের নজীর বর্তমান হলেও এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'স্নেহলতা'—শিক্ষিত সমাজে আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লেখা।

'দীপনির্বাণ' উপন্যাসটি লেখিকার প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনীর শুরু শক ১০১৪। উপন্যাসে বেশ কয়েকটি পুরুষ চরিত্র যথাক্রমে সমরসিংহ, মঙ্গলাচার্য্য, কিরণসিংহ, জয়সিংহ, অমরসিংহ, পৃথীরাজ প্রমুখ এবং নারীচরিত্র কমলাদেবী, লক্ষ্মীদেবী, পাগলিনী, প্রমুখ। সমরসিংহের পুত্র কিরণসিংহ। মাতৃহীন কিরণসিংহকে লক্ষ্মীদেবী মানুষ করেন, এই কিরণসিংহই পরবর্তী সময়ে কল্যাণসিংহ নামে উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা দেয়। কিরণসিংহের তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত মৃত্যু ফাঁড়া আছে। কুলপুরোহিত মঙ্গলাচার্য্যের নির্দেশে তাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখা হোতো। কিন্তু উপন্যাসে পাগলিনী নামে যে নারী চরিত্রটিকে দেখা যায় তার হস্তক্ষেপের ফলেই কিরণসিংহের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। পাগলিনী কুমারকে তার হারানো ছেলে মনে করে একদিন সুযোগ করে তাকে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে বেড়িয়ে আসে এবং পালিয়ে যাবার সময় নৌকাডুবি হয়ে মারা যায়। শিশু সন্তানটির মৃতদেহ বহু খোঁজার পরেও পাওয়া যায় না, কিন্তু পাগলিনীর মৃতদেহ নদীর পাড়ে পাওয়া গেলে সকলে ধরে নিল কিরণসিংহ মারা গেছে। এই দুঃখে সমরসিংহ চিত্তোরাধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজাদেবীর মন্দিরে দেবীর পদতলে মুকুট পরিত্যাগ করেন এবং যোগীন্দ্র নামে রাজকার্য চালাতে থাকেন।

উপন্যাসটির কাহিনী সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক, তবে লেখিকা কিছু কিছু জায়গায় চরিত্রের নাম পরিবর্তন এবং ঘটনার পার্থক্য রেখেছেন। মূল ঘটনার সঙ্গে তাই কিছু বিসদৃশ থেকে গিয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনায়—অনঙ্গপালের মৃত্যু হলে তাঁর দৌহিত্র আজমীরাধিপতি সোমেশ্বরের পুত্র পৃথীরাজ দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় হন। তাঁর সময়ে যদিও সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাগণ পরাক্রান্ত ছিলেন, তথাপি গৃহবিচ্ছেদে তাঁদের একতা অনেকটা শিথিল হয়ে আসে। সেই গৃহ বিচ্ছেদই পরবর্তী সময়ে সব অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়ায়। কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রই গৃহবিচ্ছেদের মূল কারণ। যখন নাগোর দেশের বহুকালপ্রোথিত ৭০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পেয়ে পৃথ্বীরাজ চিতোরাধিপতি সমরসিংহের সাহায্যে তা হস্তগত করতে সচেষ্ট হন, তখন জয়চন্দ্র ও পত্তনরাজ তাঁর দর্পচূর্ণ করবার জন্য উভয়ে একসঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে মহম্মদ ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করতে আহ্বান করেন। ১১১৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী আর্য্যাবর্তে উপস্থিত হন। স্থানেশ্বরে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ শুধুমাত্র যবনদের পরাস্ত করে ক্ষান্ত ছিলেন না, মহম্মদ ঘোরী এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত যবনকে বন্দী করে আনেন। শেষ পর্য্যন্ত পৃথ্বীরাজ আপন সৌজন্য ও উন্নত স্বভাবের গুণে তাদের মুক্ত করে দেশে প্রত্যাবর্তন করবার অনুমতি প্রদান করেন।

স্থানেশ্বরের প্রথম যুদ্ধ বৃত্তান্তের সঙ্গে লেখিকার এই উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নেই বলে জয়চন্দ্রকে উপন্যাসভুক্ত করা হয়নি এবং তাঁর বিশ্বাসঘাতকতারও উল্লেখ করা হয়নি, স্থলবিশেষে তার নামমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রায় দুই বৎসর পর ১১১৫ শকাব্দে পুনরায় দিল্লী আক্রমণার্থ আগমন করে। এবারেও স্থানেশ্বরে যুদ্ধ হয়, তিনদিন ঘোরতর সংগ্রামের পর যবনদের ধূর্ততায় ও বিশ্বাসঘাততায়, সঙ্গে বিজয় সিং-এর সহায়তায় পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন। এ সময় থেকেই হিন্দু রাজ্যের অবলোপ শুরু হয়।

চিতোরাধিপতি সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন—উপন্যাসে লেখিকা সমরসিংহ প্রসঙ্গে ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। যথা—উপন্যাসে সমরসিংহের বয়ঃক্রম ইতিহাসাপেক্ষা চার বৎসর অধিক করা হয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাসমূলক এবং তাঁদের স্বভাব ও জীবনের মূল

ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক ভিত্তি রক্ষা করবার চেষ্টা করা হলেও কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। চাঁদকবি প্রকৃতই একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত মহাকবি ছিলেন। তিনি পৃথ্বীরাজের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। উপন্যাসে তিনি কবিচন্দ্র নামে অভিহিত হয়েছেন। পাগলিনীর ব্যাপার একটী প্রকৃত ঘটনার আভাষ থেকে কল্পিত। কাপ্তেন টডের রাজস্থান পাঠে জানা যায় যে, আশাপূর্ণা নামে দেবী যথার্থর দিল্লীর কুলদেবতা ছিলেন এবং সকল রাজপুতরাই কোন কর্মে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে আশাপূর্ণা দেবীমূর্তির পূজা করতেন। উপন্যাসে চতুর্ভুজা দেবী মন্দিরের যে উল্লেখ আছে বোধ হয় উক্ত দেবীরই নামের পরিবর্তিত রূপ। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ, সমরসিংহ, কল্যাণসিংহ মারা যান। পৃথ্বীরাজ এর কন্যা উষাবতীও কল্যাণসিংহের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মারা যান। পৃথ্বীরাজের রাজমহিষীও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাকে সঙ্গে নিয়ে কম বেশী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখিকা উপন্যাসটি লিখেছেন। তদানীন্তন পত্র-পত্রিকায় যেভাবে প্রশংসনীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তার পরিপেক্ষিতে বলা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-জগতে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন পত্রিকায় মন্তব্য, উপস্থাপিত হোলো—

"দীপ-নির্বাণ" নামে একখানি অভিনব নভেল আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। শুনিয়াছি এখানি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা, স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশুনা, এরূপ রচনা, এরূপ সহৃদয়তা এরূপ লেখার ভঙ্গী বঙ্গদেশে বসিয়া নয়, অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ('সাধারণী')[৫]

"...We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady, and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengali."

[CALCUTTA REVIEW][৬]

"ছিন্নমুকুল" উপন্যাসের প্রকাশকাল ৪ নভেম্বর ১৮৭৯ সাল (তৃতীয় সংস্করণ ১৯০০ সাল)। উপন্যাসটি দীর্ঘ ২৩৮ পৃষ্ঠার, কাহিনী বিয়োগান্তক। ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহের মধ্যে সাধারণ প্রণয় কাহিনী স্থান নিয়ে উপন্যাসটিতে রোমান্সের নতুনত্ব এনে দিয়েছে।

সুশীলা স্বামী পরিত্যক্তা, পিতার গৃহে অবস্থান করেন। দিদি চারুশীলার পতি বিয়োগের পর দিদির অসুস্থতার খবর পেয়ে চলে আসেন। মৃত্যু শয্যাগত চারুশীলা ভগিনীর হাতে দশম বর্ষীয় পুত্রসন্তান প্রমোদ এবং সপ্তম বর্ষীয়া কন্যাসন্তান কনককে অর্পণ করে মারা যান। আট-দশ বছর পরের কথা প্রমোদ ও কনক দু'জনেই পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রমোদ কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে, পূজোর ছুটিতে প্রমোদ তার বন্ধু যামিনীনাথের সঙ্গে কানপুরে বেড়াতে এসে একদিন শিকার করতে গিয়ে বনমধ্যে পথ হারিয়ে যায়। সেখানেই সন্ন্যাসী কন্যা নীরজার সাহায্যে সঠিক পথ পায় এবং সে রাত্রি সন্ন্যাসীর কুটীরেই আশ্রয় পায়। নীরজার প্রতি দুই বন্ধুর আকর্ষণ পড়লেও নীরজার প্রমোদকে বিশেষভাবে পছন্দ, পরিণামে উভয়েই প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রমোদ ও নীরজার ভালবাসাকে যামিনীনাথ মোটেই সহজে মেনে নিতে পারল না। তাই সে নানান কায়দা করে নিজের লোক দিয়ে নীরজাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে আবার নিজেই নীরজাকে উদ্ধার করে নিজের কাছে নিয়ে এসে বাহবা নেবার এবং নীরজার কাছে প্রেমের স্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করে। এই ঘটনার সময় সন্ন্যাসী বনমধ্যে নিজের কুটীরে ছিলেন না, তাই নীরজার অপহরণের বিষয়ে তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যামিনীনাথের সাহায্যে নীরজা উদ্ধার হয়েছে, তখন কৃতজ্ঞতাবশতঃ যামিনী-নাথের সঙ্গে নীরজার বিবাহদানে সম্মত হন। পরে হিরণকুমারের সাহায্যে প্রকৃত তথ্য জানা গেল যে যামিনীনাথ মূল দোষী এবং প্রমোদ নির্দোষ। তাই নীরজার সঙ্গে প্রমোদের বিবাহ হয়।

এদিকে কনকের প্রতি হিরণকুমারের দুর্বলতা ক্রমশঃ প্রণয়ে রূপ নেয়, কিন্তু শৈশবের একটি ঘটনার রেশ সমেত যৌবনে যামিনীনাথের দুষ্টবুদ্ধির শিকার হওয়ায় প্রমোদ হিরণকুমারকে কখনই পছন্দ করত না। তাই উভয়ের মিলনের ক্ষেত্রেও বাধা হোলো প্রমোদ।

সুশীলার কাছেই মানুষ হয় প্রমোদ ও কনক। এই সুশীলার বিবাহের পর তাঁর স্বামী দয়ানন্দের আচরণ সুশীলার পিতার পছন্দ ছিল না। একদিন দয়ানন্দ মদ্যপ অবস্থায় সুশীলাকে প্রহার করলে শ্বশুরের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যান এবং পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে কয়েক বছরের মধ্যেই মারা গেলেন। এই

দয়ানন্দ হলেন সন্ন্যাসী ও তাঁর কন্যা নীরজা। বেঁচে থাকতে আর সুশীলার সাথে সন্ন্যাসীর চাক্ষুষ মিলন হয় নি।

উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলি বিশিষ্ট। ভগিনী কনকের প্রতি স্নেহান্ধ প্রমোদ যখন জানতে পারল তারই শত্রু হিরণকুমারের সঙ্গে কনকের প্রণয়ের সংবাদ, তখন সে হয়ে উঠল ভীষণ এবং এরই ফলে ভগিনী কনকের প্রতি তার কঠোর ব্যবহার উপন্যাসের পরিসমাপ্তির সঙ্গে বিয়োগান্ত অবস্থার সৃষ্টি করল। কনক এবং হিরণকুমারের প্রণয়ের পরিসমাপ্তি মিলনে নয় মরণে। প্রমোদ হিরণ-কুমারের ভুল বুঝে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে বাধ সাধল, ফলতঃ মিলন হোলো না এবং তার ভগনীকেও চিরজীবনের জন্য হারাল, তারই ভুলের জন্য দু'টি নিষ্পাপ প্রাণ অকালে শেষ হয়ে গেল।

উপন্যাসের খল চরিত্র যামিনীনাথ বন্ধু প্রমোদের প্রেমিকা নীরজাকে পাবার জন্য নানান ছলনার আশ্রয় এমন কি বন্ধু প্রমোদকে পর্য্যন্ত হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে। অবশ্য তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয় এবং লেখিকা এই চরিত্রকে সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত করে সমাজের চোখে শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, খল চরিত্র কখনই সফলতালাভে সক্ষম হয় না। তাই প্রমোদ ও নীরজার মিলন হোলো স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু উপন্যাসের মূল নারীচরিত্র কনকলতা শৈশব থেকে যে স্নেহবঞ্চিতা সেই ফুলের মত বালিকার জীবন অকালে ঝরে গেল শুধুমাত্র তার ভ্রাতার কারণে। এই বালিকা চরিত্রটিকে লেখিকা অদ্ভুতভাবে শান্ত, সহনশীলা, কর্তব্যরতা, ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত অনুগতা করে দেখিয়েছেন, যার ফলে তার ফুলের মত জীবনটা ছিন্নমুকুলের ন্যায় ঝরে গেল।

উপন্যাসে আরো কয়েকটি পার্শ্ব চরিত্র আছে যা উপন্যাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং পূর্ণতা দিতে সাহায্য করেছে, সেগুলি হোলো চারুশীলা, সন্ন্যাসী, ভৃত্য প্রভৃতি। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে বিজয়া শিরোনামে এক চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে কনকলতার জীবন প্রদীপ নিভে যাবার ক্ষেত্রে তার প্রেমিকের অভিব্যক্তির প্রকাশ—

'হিরণকুমার পাগলের মত প্রমোদকে বলিলেন, চুপ! চুপ! কনকের ঘুম আসিতেছে, তুমি ঘুম ভাঙাইও না।"

হিরণ আস্তে আস্তে কাছে বসিয়া শিশুর ন্যায় তাহাকে ঘুম পাড়াইতে

লাগিলেন।…প্রমোদ বুঝিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, হিরণকুমার আবার বালকের মত বলিলেন, "কাঁদিও না, কনকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।" কনকের ঘুম আর কখনই ভাঙ্গিল না, কুসুম কলিকা ছিন্ন হইল।"[৭]

উপন্যাসের যে মূল বিয়োগান্ত দিক তা হোলো হিরণকুমারের সঙ্গে কনকের প্রণয়ে প্রমোদের বাধাপ্রদানে উভয়ের মিলন হোলো না। উপরন্তু প্রমোদ ও নীরজার কাছ থেকে ক্রমশঃ অবহেলা কনককে অত্যন্ত মর্মাহত করে দিল। এমনকি যখন কনককে বিবাহ করবার প্রস্তাব দিয়ে হিরণকুমার প্রমোদকে পত্র লেখে তখন প্রমোদ সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। এরপর কনকের প্রতি অবহেলা চরমে পৌঁছিল, প্রমোদ কনককে একা রেখে নীরজাকে নিয়ে কানপুরে রওনা হোলো। এ-দুঃখ কনককে অত্যন্ত ব্যথিত করে এবং ঝড়ের রাত্রে কনক উন্মাদিনীর মতো গৃহত্যাগ করে চলে যায়। উন্মত্ত অবস্থায় সে গঙ্গাতীরস্থ যে বাড়ীতে প্রবেশ করল সেখানে হিরণকুমারের সঙ্গে তার দেখা হোলো, হিরণ বুঝতে পারলো,

"হিরণ দেখিলেন, কনক উন্মাদিনী। তাহার কথা শুনিয়া তাহার সেই মোহময় আলুথালু বেশ দেখিয়া হিরণের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বলিলেন, "কনক আমার, আমি যে তোমার হিরণকুমার, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না' ?"

উন্মাদিনী বলিলেন, "হিরণকুমার। কৈ তোমার মুখ……।"[৮]

এদিকে প্রমোদ ও নীরজা ঝড়ের উপক্রম দেখে বাড়ী ফিরে আসতে গিয়ে ঝড়ের মুখে পড়লেন এবং ঘটনাচক্রে যামিনীনাথের পুরাতন ভৃত্য রামধনের কাছ থেকে প্রমাণ সমেত জানতে পারল যে, নীরজার অপহরণ, প্রমোদকে এবং সন্ন্যাসীকে হত্যার প্রচেষ্টা সবকিছুর পিছনেই যামিনীনাথের হাত আছে। প্রমোদের তখন হিরণকুমারের প্রতি বিদ্বেষভাব দূর হোলো। ঐ ভৃত্যের সাহায্যে যখন কনকের খোঁজ পাওয়া গেল তখন বড় বেশী দেরী হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ কনকের শেষ অবস্থা।

'…অস্ফুটস্বরে বলিল, "হিরণকুমার, এ জনমে আর হৃদয়ের সাধ পূরিল না-কিন্তু ঈশ্বর—উপাসনার যদি ফল থাকে, বিশুদ্ধ প্রেমের যদি পুরস্কার থাকে, তা হলে মরণে আমার দুঃখ নেই, তা হলে পরলোকে আমাদের মিলন হবেই।" অতিকষ্টে এ কথাগুলি কহিয়াই কনক থামিল। কনকের কথার মর্ম যেন

হিরণকুমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, যাতনা-ব্যঞ্জক শূন্য-দৃষ্টিতে কেবল তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন মাত্র।······কনক আবার কথা কহিবার ইচ্ছায় মুখ খুলিল, অতি ধীরে ধীরে, অতি কষ্টে বলিল—"হিরণকুমার, আর যে দেখতেও পাচ্ছিনে, একটিবার কাছে সরে এস, শেষবার ভাল করে—"

এইটুকু বলিয়া কনক আবার ঢুলিয়া পড়িল,···কনকের আবার চক্ষু মুদিয়া আসিল ভ্রাতার হস্তে মস্তক রাখিয়া কনক অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল, না ফুটিতেই মুকুল ঝড়িয়া পড়িল, দীপ জ্বলিয়াই নির্বাণ হইল,···কুসুমকলিকা ছিন্ন হইল।"[৯]

এভাবেই একটি বালিকার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। উপসংহারে লেখিকা প্রেমিকাবিহীন হিরণকুমারের জীবনের অর্থহীনতা প্রমাণ করবার জন্যই বোধ হয় এই বিয়োগান্ত উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটালেন, '···দেখিলেন হিরণকুমার মুমূর্ষ। প্রমোদ নিকটে আসিয়া তাহাকে সোপান হইতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, তাহার অশ্রুময়নেত্র প্রমোদের চক্ষুতে সংলগ্ন করিয়া অন্তিম-কালের যাতনা কম্পিত স্বরে বলিলেন, আমায় উঠাইও না—আমি এইখানেই মরিব, এইখানেই শুনিয়াছিলাম, কনক আমায় ভালবাসে"[১০]···

উপন্যাসখানি বিয়োগান্ত হলেও তৎকালীন পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলছে এবং যথেষ্ট সমাদর লাভে সক্ষম হয়েছে। তদানীন্তন কিছু পত্র-পত্রিকায় উপন্যাসটির বিষয়ে কিছু মন্তব্যও প্রকাশ পায়--

"Another good book is before us—Chinna Mukul a Novel by the authoress of Dip Nirban and Basanta Utsab. The workmanship throughout is exactly what might be expected from so able a litarary artist. It is a pleasant transition to nature and fancy—to the calm and placid sweetness of Indian home life from the din and bustle of war, the gorgeous magnificence and heroic grandeur of the ancient Rajput Princess of Dip Nirban. A deep shade of Tragedy pervades the whole of the book, giving its color to more than one of the principal characters broken in here and there by a faint glimmer of incidental comic scenes which instead of relieving

the senses, serves to thicken the gloom around. The dialogues are well sustained. The style is, as is characteristic of this writer, chaste, clear, sweet and vigorous. The book is interspersed with many charming little songs, all of which, it is a pity, are not set to tune. Almost all of the characters are extremely natural especially Kanak the heroine of the story. She is an admirable portrait of self-sacrifice and disappointed love. Instances of such grand woman heroism and abnegation of self, liberate the fancy and gladden the heart. The character of Promod, her selfish brother, has hardly, been less cleverly drown. It is not difficult to find original of such character in this cold, calculating world. Niraja, the other female character, thrives well up to a certain point, and then dwindles into insignificance in the greater interest which one feels for Kanak.

The pages that described the conflict of feelings in Kanak's mind, obedience to her brother and guardian on the one side and the dictates of an all—absorbing love on the other. consititute an interesting reading and are sure to give the book in which they occur a respectable place in Bengali fiction.

Indian Mirror (১১)

স্বর্ণকুমারী দেবীর পরবর্তী আলোচ্য উপন্যাস 'স্নেহলতা' ১ম খণ্ড, ১১ মাঘ ১২৯৬ (২৩ জানুয়ারী ১৮৯০; ২য় খণ্ড, ফাল্গুন ১২৯৯, ১৫ মার্চ, ১৮৯৩) উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে লেখিকার কিছু প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবার কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয় এই উপন্যাসে। স্নেহলতা এ উপন্যাসের মূল চরিত্র, বিবাহের অব্যবহিত পরে সে বিধবা হয়। জগৎবাবু তাকে স্নেহ

করতেন অত্যন্তই, তাঁরই সাহায্যে সে নানান বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। জগৎবাবুর পুত্র চারু তার শৈশবের সাথী। বর্তমানে যৌবনপ্রাপ্ত স্নেহলতার প্রতি সে আসক্ত হয়। আর সেই কারণেই চারু বিধবা বিবাহের পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে ব্যস্ত।

'. সে পিতার নিকট আসিয়া স্নেহের কষ্টে বাল-বিধবাদিগের দুঃখময় জীবনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল এবং মনের আবেগে, মন্মোত্থিত সহানুভূতির বলে বিধবা-বিবাহের পোষক যুক্তি সকল সুসঙ্গতরূপে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।'[১২]

জগৎবাবু যদিও স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহের পক্ষে, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি যেন কেমন সংস্কার মুক্ত হতে পারছেন না। তাই ছেলের কথায় সায় দিতে পারছেন না। এক্ষেত্রে চারু আরো যেন মরিয়া হয়ে পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

'...এই দেখুন না বালিকা-বিদ্যালয় অনেক হয়েছে সত্য, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমাদের অন্তঃপুরে কতজন রমণী যথার্থ সুশিক্ষিতা। বিধবা-বিবাহ ধর্ম ও ন্যায় সঙ্গত, এ জ্ঞানটা আমাদের অনেকেরই হয়েছে সত্য, কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন বিধবা-বিবাহ দিতে সাহসী? সমাজে কেই বা বিধবা-বিবাহ দিয়ে জাতিচ্যুত হয়নি? আর বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে ও এত বক্তৃতা, এত আপত্তি চলেছে, তবুও এখনও বাল্যবিবাহ রহিত হ'ল না।'[১৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন লেখিকার লেখনীতে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহরোধ; এ সমস্ত সমাজ সংস্কারকের কথাগুলি বেড়িয়ে এসেছে যথাযথ চরিত্রের মুখ থেকে। বিধবা হবার পর স্নেহলতার নানান বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের কথা তদানীন্তন সময়ে প্রশংসার দাবী রাখে। নারীর আত্ম-মর্যাদা রক্ষার পক্ষে তিনি সোচ্চার হয়েছেন তাই-তো তিনি সার্থক লেখিকা।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিদ্রোহ' প্রকাশিত হয় ১৫-শ্রাবণ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ (৯-আগষ্ট ১৮৯০)। লেখিকার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মেবাররাজ' এই গ্রন্থখানির পূর্বসূরী। তদানীন্তন সময়ে লেখকরা টডের 'রাজস্থান' থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মালমশলা আহরণ করতেন। লেখিকাও সেইকারণে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হন। সাহিত্য সমালোচক

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এক্ষেত্রে ('বিদ্রোহ' উপন্যাসে) তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা রমেশচন্দ্রের দ্বারা বেশী অনুপ্রাণিত হন। শ্রীকুমারের মতে—"সত্যনিষ্ঠা ও তথ্যানুবর্তনে তিনি রমেশচন্দ্রের সহিতই অধিক তুলনীয়। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাসে ভাষা, মন্তব্যের সারবত্তা ও বিশ্লেষণ—নৈপুণ্যের দিক দিয়া বরং সময় সময় রমেশচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।"[১৪]

রাজপুত ইতিহাস এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ভীলদের রাজপুত রাজত্বের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, গোপন বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র, সংঘর্ষ ইত্যাদি এই উপন্যাসের উপজীব্য। ভীলদের অসন্তোষ সত্ত্বেও রাজপুতের প্রতি বন্ধু আনুগত্য, বিশেষত ভীলপুত্র জুমিয়ার মহৎ সরল বিশ্বস্ততা রাজার মনকে আকর্ষণ করে। জুমিয়ার এই বিশ্বস্ততাকে পিতা জন্মু রাজা নাগাদিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কানি দিয়েও টলাতে পারেনি।

মেবারের আদি রাজা গুহার প্রপৌত্র আশাদিত্য। তাঁর পৌত্র নাগাদিত্যের অশুভগ্রহ খণ্ডনার্থে গ্রহাদিত্য নাম রাখা হয়। তিনি চঞ্চলমতি, জেদী কিন্তু রাজোচিত গুণসম্পন্ন। তিনি আবার বন্ধু জুমিয়ার পালিতাকন্যা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা সুহারের প্রতি অনুরক্ত। ফলে সুহারের পাণিপ্রার্থী ভীল যুবক ক্ষেতিয়া রাজার শত্রু ও বিদ্রোহের একজন প্রধান হোতা।

পরাধীন ভীলদের পূবপুরুষ একসময় রাজপুতকে কথার মর্যাদা রাখার জন্য রাজার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রাজত্ব দিয়েছিলেন ; কিন্তু আজ তারা রাজার অধীন। নিজেদের চাষবাস, পশুপালন, শিকার ইত্যাদি কর্মে আবদ্ধ। নিজস্ব কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগতের সীমায় আত্মপ্রীতভীলদের মানসে তাই মাঝে মাঝে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তখনই বিদ্রোহের অনল প্রজ্জ্বলিত হয়। শেষ পর্যন্ত রাজা নাগাদিত্য বা গ্রহাদিত্যের সঙ্গে সুহারের বিবাহ সভায় এই আগুন জ্বলে ওঠে। সুহার ক্ষত্রিয় কন্যা, জুমিয়া তাকে লালন-পালন করেছে। যেহেতু সে ক্ষত্রিয় কন্যা সেহেতু রাজার সঙ্গে তার বিবাহে কোনো বাধা নেই। কিন্তু সেই বিবাহ সভাতেই প্রমাণিত হোলো সুহারা ব্রাহ্মণ কন্যা। মূর্খ, সরল ভীল জুমিয়া রাজপুরোহিত হরিতাচার্য্যের কথায় ঘোষিত এই অশাস্ত্রীয় বিবাহরোধে ক্ষণিকের ক্রোধে রাজাকে বর্শা বিদ্ধ করল সঙ্গে সঙ্গে ভীলেরা রাজপুরী আক্রমণ করল।

"বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।"[১৫]

জুমিয়া যখন তার ক্ষণিকের ভুল বুঝতে পারল তখন বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজবাড়ী ও ক্ষত্রিয়দের রক্ষায়; এখানে জুমিয়াকে প্রাণ দিতে হোলো। নাগাদিত্যের শিশুপুত্র বাপ্পারাও হরিতাচার্য্য এবং সুহারের চেষ্টায় রক্ষা পেল। এইখানেই উপন্যাসের মোটামুটি পরিসমাপ্তি।

এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে লেখিকাকে উদ্দীপনা জাগিয়েছিল রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির অনুরণন প্রকটভাবে ঘটেছে বলে মনে হয়। কারণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অব্যর্থ গণনা, গ্রহচার্য, কুলপুরোহিত প্রমুখ নানাবিধ উপাদান লেখিকা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন, যা বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রায়ই উপস্থিত।

ভীলদের সংস্কার, জীবনযাত্রা, ভাষা ও নানান আনুষঙ্গিকের বিস্ময়জনক অভিজ্ঞতা লেখিকা তাঁর এই উপন্যাসে এনেছেন। জুমিয়া চরিত্রের সহজ নীতিবোধ, সারল্য, বিশ্বস্ততা এক অপূর্ব মানসিক বিকাশ। বন্ধুর প্রতি ভালবাসা সঙ্গে পিতার আদেশ, এই দোটানার মধ্যে পড়েও জুমিয়ার চরিত্র মহত্ব হারায় নি। কিশোর তেজস্বী রাজার চরিত্রের দৃঢ়তা খর্ব হয়নি। রাণী সেমন্তির সঙ্গে রাজার ভুলবোঝাবুঝি ও মান-অভিমান নিপুণ দক্ষতায় বিচিত্রিত। রাজসভা, অন্তঃপুর, উদ্যান, সর্বত্রই লেখিকার বর্ণনাশক্তি প্রকাশ পেয়েছে। অরণ্যের বর্ণনা ভীলদের বর্ণনায় যে নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছে তা লেখিকার কল্পনা ও পর্যবেক্ষণের মিলনের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

হৃত গৌরব জম্বুর অরণ্যদেবতার কাছে কাতর ক্রন্দন মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

'পাখিরা অন্ধকারেই গান গাহিয়া উঠিয়াছে। বনফুলের সুগন্ধ অন্ধকারের মধ্যেই চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। একাকী জম্বু এই সময়ে অরণ্যতলে একটি শালবৃক্ষকে প্রণাম করিতে করিতে বলিলে—"দেবতা, এখন তুইভার এমনি কারখানা, মুইদের ছাড়িয়া তুইভা তানাদের হইলি, তানাদের বড করিলি? মুইদের ধন তানাদের দিলি? তুইকে সোনায় মড়াইবু, তুইভার তলায় হাজার ছাগ বলি দিবু, মুদের পানে ফিরে চাহ'—মুদের দুধ তাড়উ দেবতা।"[১৬]

ক্ষণিকের ভুলে বিদ্রোহ ঘোষণার ফলে অসহায় সরল ভীলের প্রার্থনা কোনো একপ্রকারে অবশেষে সফল হয়েছিল, কিন্তু সেখানে আনন্দের চেয়ে প্রখর বেদনাদায়ক ছিল জজুর পুত্র হারাবার ব্যথা। স্বর্ণকুমারী দেবীর কল্পনা-সমৃদ্ধ ও কবিত্বময় এ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিদ্রোহ' এর লেখনী প্রশংসার দাবী রাখে।

লেখিকার পরবর্তী আলোচ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ফুলের মালা।' প্রকাশকাল ১২ মার্চ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ। উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু হোলো, বঙ্গেশ্বর আলিয়াস সাহেবের পুত্র সুলতান সেকেন্দর সাহের পুত্র সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা নবাবশাহ গায়সুদ্দীন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন সিংহাসন অধিকারের জন্য। গায়সুদ্দীন অত্যন্ত প্রবল হয়ে বহু সৈন্যসহ রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় বাদশাহের সাতপুত্র তাঁকে গতিরোধে অসমর্থ হয় এবং তাঁর সপ্তভ্রাতা তাঁরই হস্তে প্রাণ দেয়। বাদশাহ সুলতান শাহ নিজেই উপায়ন্তর না দেখে পুত্র গায়সুদ্দীনের গতিরোধে অগ্রসর হন। পিতাপুত্রে যুদ্ধ বাঁধল, এ যুদ্ধের পরিণাম,

"এ যুদ্ধের পরিণাম কাহারও অবিদিত নাই। ইতিহাস বহুদিন পূর্ব হইতে তাহা ঘোষণা করিয়াছে—তৃতীয় দিনের যুদ্ধে দুর্ভাগ্য বাদশাহের মৃত্যু হইল। ... পুত্র গায়সুদ্দীন তাঁর সিংহাসন অধিকার করিলেন।"[১৭]

এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সঙ্গে নিয়েই এক বাল্য প্রণয়ের প্রতিহিংসার কাহিনী রচনা করেছেন লেখিকা তাঁর এই উপন্যাসে। দিনাজপুরের চতুর্দশ বৎসরের রাজকুমার গণেশদেব খেলার সাথী ন 'বছরের বালিকা শক্তিকে খেলার ছলে ফুলের মালা পড়িয়ে দিয়ে রাণী করে। আট বছরের নিরুপমা শক্তির খেলার সাথী, গণেশদেবের এ কার্যে সে মনে অত্যন্ত ব্যথা পায়, কারণ, তার ইচ্ছা ছিল রাণী হবার। পরিণত বয়সে নিরুপমার সঙ্গে রাজকুমারের অর্থাৎ গণেশদেবের বিবাহ হয়। এ বিবাহ সংঘটিত হবার সময় শক্তি উপস্থিত ছিল না, সে তার পিতার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে ছিল। দীর্ঘ কয়েকবছর পর বালিকা শক্তি যখন যুবতী হয়ে দিনাজপুরে ফিরে এ'সে এ বিবাহের কথা জানতে পারল, তখন সে রাজকুমারের কাছে শৈশব সম্বন্ধের অধিকার চাইল। কিন্তু যখন সে জানতে পারল এখন তার পুরানো সম্বন্ধ রাজকুমার স্বীকার করতে পারবে না অর্থাৎ সে রাণী হতে পারবে না, তখন তার মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে

উঠল। প্রতিশোধ নেবার কারণে হিন্দু কন্যা হয়েও মুসলমান গায়সুদ্দীনকে সে বিবাহ করল।

গণেশদেবের সঙ্গে বাদশাহ সেকেন্দরসাহের যে বিদ্রোহ চলছিল, বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিসমাপ্তি ঘটল এবং নতুন রাজার সঙ্গে বিরোধ রইল না। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন চলল না। নতুন বাদশাহ গায়সুদ্দীন তাঁর ভাইপো বালক সাহেবুদ্দীনকে এখনও মারতে পারেনি, তাই সে পলায়নরত সাহেবুদ্দীনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কারণ এই বালক তাঁর ভবিষ্যতের জন্য পথের কাঁটা। সাহেবুদ্দীন রাজা গণেশদেবের চরণে শরণ নিলে তিনি আশ্রয় দেন। গোপনীয় হোলেও একথা গায়সুদ্দীনের কানে উঠল। তাই বালক সাহেবুদ্দীন সহ গণেশদেব বাদশাহের মন্ত্রীপুত্র কুতবের হাতে বন্দী হলেন। একথা জানতে পেয়ে শক্তি স্বামীর কাছে বালক সাহেবুদ্দীনকে হত্যা না করবার প্রার্থনা জানালে তা প্রত্যাখ্যাত হোলো।

গায়সুদ্দীন প্রথমে গণেশদেবকে ভবিষ্যতে তাঁর বিপক্ষে না যাবার শর্তে ছেড়ে দিতে রাজী হলেও যখন তিনি কুতবের মাধ্যমে জানলেন শক্তি গোপনে কুতবের সাহায্যেই গণেশদেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, তখন তিনি গণেশদেবের ছিন্নমুণ্ড আনবার আদেশ দিলেন। এদিকে শক্তি গোপনে গণেশদেবকে কারামুক্ত করবার চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হোলো, অর্থাৎ গণেশদেবকে এ কার্যে রাজী করাতে পারল না তখন সে সন্ন্যাসিনীর সাহায্যে ঐ রাত্রেই গণেশদেবকে মুক্ত করল। গণেশদেব একথা জানতেও পারলেন না। সন্ন্যাসিনীর কথা মত স্ত্রীবেশ ধারণ করে শক্তিরই গায়ের শালে মুখ ঢেকে কারাদ্বার থেকে বাইরে এলেন, সেই মুহূর্তেই অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা শক্তি লৌহকবাটে রুদ্ধ হোলো। এতদিনে শক্তি তার প্রেমিক গণেশদেবের জীবন রক্ষা করে নিজের জীবন বলি দেবার যে ত্যাগের আনন্দ অনুভব করে প্রতিশোধ কার্য সমাধা করবার উদ্দেশ্যে গণেশদেবের জায়গায় নিজে ছিন্ন মলিন বস্ত্রে আবৃত হয়ে শুয়ে পড়ল। প্রভাতের পূর্বেই সুলতানের আদেশ বলে ছিন্নমুণ্ড হত্যাকারী কুতবকে এনে দেন, সুলতান কুতবের হাত থেকে সে ছিন্নমুণ্ড নিয়ে মশালের আলোতে দেখে চীৎকার করে উঠলেন, এ ছিন্নমুণ্ড তাঁর স্ত্রী শক্তির। উন্মত্ত হয়ে গেলেন বাদশাহ। তাঁরই আদেশে কুতুব, সাহেবুদ্দীন এবং কারাপুরের প্রহরীদের প্রাণদণ্ড হোলো। একসঙ্গে এতগুলি প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যকরী হল। উন্মত্ত গায়সুদ্দীনের এ

আচরণে অনেকেই গোপনে, কেহ বা প্রকাশ্যে গণেশদেবের পক্ষালম্বন করল, গণেশদেব পুনরায় শক্তি সঞ্চার করে গায়সুদ্দীনকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে সুলতান গায়সুদ্দীন পরাজিত, নিহত হলেন। বঙ্গরাজ্যে আবার হিন্দুরাজা গণেশদেব অধিষ্ঠিত হলেন।

শক্তির সঙ্গে নিরুপমার অদৃষ্টের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শক্তির ধনেই নিরুপমা চিরদিন ধনী, তাই সে আজ বঙ্গেশ্বরী। একদিন নিরুপমা যখন উদ্যানে গণেশদেবের সঙ্গে বসেছিল তখন তার পুত্র রাজকুমার যাদবদেব একটি বালিকার হাত ধরে নিয়ে এসে বলল,

"মা, মা! শাহাজাদীকে আমি বিয়ে করব।"[১৮]

এই শাহাজাদী শক্তির কন্যা গুলবাহার। নিরুপমা, মুসলমান কন্যা বলে এ বিষয়ে আপত্তি জানালেও সন্ন্যাসিনী এবং গণেশদেবের কাছ থেকে আপত্তির পরিবর্তে সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে আর কিছুই বলতে পারল না। যাদব ইতিমধ্যে একগাছি ফুলের মালা সংগ্রহ করে গুলবাহারকে পরিয়ে দিয়ে বলল,

"শাহাজাদি, তুমি আমার রাণী, তোমাকে আমি বিয়ে কর্‌ব।"[১৯]

নিরুপমার শক্তির অভিশাপের কথা মনে পড়ল। গণেশদেবের মাতা যখন বনোয়ারীলালের কুলকলঙ্কিনী ভাগনীর জন্য তার কন্যা শক্তিকে স্ব-পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন, তখন শক্তি ক্রোধে জ্বলে উঠল,

"সে বলিল, "মহারাণি, আপনার মহদ্‌বংশের উপযুক্ত কথাই আপনি বলিয়াছেন। কিন্তু ভগবান ধনী দরিদ্রের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম করেন নাই। যদি ভগবান থাকেন, যদি আমি আপনার পুত্রকে সত্যই একমনে ভালবাসিয়া থাকি, তবে একদিন ইহার বিচার হইবে। আজ যাহাকে ঘৃণা করিয়া অকূল সাগরে ভাসাইলেন, আপনার শ্রেষ্ঠ বংশ সেই হীন বনোয়ারিলালের পদানত হইয়াই সমান আনন্দ অনুভব করিবে। তাহা যদি না হয়, তবে জানিব ভগবান নাই।"[২০]

বালক যাদবই যৌবনে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে গুলবাহারের পানিগ্রহণ করে, এই যাদবদেবই ভবিষ্যতের বঙ্গরাজ জেলালুদ্দীন নামে খ্যাত।

লেখিকা তাঁর কল্পনা এবং কবিত্বশক্তির সাহায্যে ইতিহাসাশ্রিত এই উপন্যাসটিকে পূর্ণতাদানে সক্ষম হয়েছেন একথা স্বীকার্য, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অনুরণন করেছেন,

যোগিনী, মন্দির, সন্ন্যাসিনীর মাধ্যমে তিনি উদ্ধার কার্যগুলি সম্পন্ন করিয়েছেন। গণঠাকুরের মুখ দিয়ে ভবিষ্যত বাণী করিয়ে শক্তির আত্মসত্ত্বাকে জাগিয়ে তুলে প্রতিশোধ নেবার বাসনা চরিতার্থ করিয়ে কাহিনীর গতিধারা অব্যাহত রেখেছেন। গণঠাকুরের ভবিষ্যতবাণী,

'তিনি অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "মা তুমি রাজরাজেশ্বরী হইবে, তোমার কাছে কিছু নেব না।"[২১]

স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত বর্তমান আলোচ্য সর্বশেষ উপন্যাস 'কাহাকে', প্রকাশকাল, জুলাই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ, একটি রোমান্টিক এবং প্রেমকাহিনী। এই উপন্যাসের লেখিকার স্বীয় জগতের ছায়াঘেরা উপন্যাস। এখানে লেখিকা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নারীমনের অন্তর্লীন ভাবসত্তার অতি অনায়াসে উন্মোচন করেছেন। উপন্যাসটি সুমধুর বৈধ রোমান্সপূর্ণ ইঙ্গবঙ্গ সমাজের আচার আচরণ ও পূর্বরাগের চিত্র।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বলাভে সক্ষম হয়েছেন বলে, সামাজিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও লেখিকার সেই ভারাক্রান্ত ভক্তি দেখা যায়। কিন্তু 'কাহাকে' উপন্যাসটি এইরূপ দোষমুক্ত। নারীমনের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ যেখানে সেখানেও তত্ত্বালোচনা বা উপদেশের গাম্ভীর্য নেই, বরং সম্পূর্ণ নারীদৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত একটি নারীর নিজস্ব জগতের নিপুণ চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। ঊনবিংশ শতকের সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কের আলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে এসে পড়েছিল এবং ঠাকুর পরিবারকে আলোর ছটায় উজ্জ্বল করে তুলেছিল। তাঁর শিক্ষার সম্পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে রচনাগুলিতে। তাঁর বিস্তৃত পড়াশুনা এবং ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় এ-উপন্যাস বহন করছে। এমনকি কবিত্বশক্তিরও প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসে।

'কাহাকে' উপন্যাসের নায়িকা বাল্যকালে পাঠশালার সর্দার পোড়ো ছোটুকে ফুল দিত, উভয়েই খেলার সাথী—একাত্মা একপ্রাণ। তারপর স্বাভাবিক কারণেই ছোটুর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যে যে মানসিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল, শারিরিক বিচ্ছেদ তাকে মুছে ফেলতে পারেনি, তাই যুবতী হয়েও নায়িকা শুধু একটা গান, একটা সুর খুঁজে বেড়াত,

হায়! মিলন হোলো,
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো।

হাতে ক'রে মালাগাছি, সারাবেলা ব'সে আছি
কখ্ন ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো।'

এ গানটি সে ছেলেবেলায় ছোটুর মুখে কয়েকবারে শুনেছে। কিন্তু যৌবনে এক গান সে আবার শোনে দিদির বাড়িতে ভগ্নিপতির বন্ধু রমানাথের মুখে। এই একই গান শুনে অভিভূত হয়ে পড়ে সে। অবচেতন মনে যে গান তাকে নাড়া দেয় জাগরণে রমানাথের কণ্ঠে সে গান শুনে সে রমানাথের প্রতি নিজের অজ্ঞাতেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অবশেষে, রমানাথের সঙ্গে বাগ্‌দান। ঠিক তখনই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে ডাক্তার বিনয়কুমারের।

পিতার মতের বিরুদ্ধে রমানাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং বাগ্‌দান, তাই নানান প্রতিকূলতা এসে সামনে দাঁড়ায় তাঁদের বিবাহের ক্ষেত্রে। অবশেষে নানান ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্য দিয়ে রমানাথ নায়িকার জীবন থেকে সরে দাঁড়ায় অর্থাৎ তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায়।

এই অবকাশে ডাক্তার বিনয় নায়িকার হৃদয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, নায়িকার সঙ্গে ডাক্তারের প্রণয় গাঢ়রূপ নেয়। এদিকে পিতার কাছ থেকে এ ব্যাপারে সম্মতি না পাওয়ায় বিষম সংকটের মধ্যে পড়লেও এরও অবসান ঘটে একদিন। পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর একদিন যখন নিজেকে গানের মধ্যে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টায় পিয়ানোয় গাইতে থাকে তার সেই প্রিয় গানটি, 'হায় মিলন হোলো'

এ সময়ই পেছন থেকে অপর একটি কণ্ঠস্বরে একই গান শুনে নায়িকা অবাক হয়ে দেখে ডাক্তার বিনয়কুমার তার গানের কলিটি সম্পূর্ণ করে দিল। এই সময়ই সে জানতে পারল বিনয় ডাক্তারই তার পিতার নির্বাচিত পাত্র এবং বাল্যবন্ধু ছোটু। সমস্ত সংকটের অবসান এখানেই এবং মিলনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপন্যাসের কাহিনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই নায়িকার নারীমনের উথাল-পাথাল করা একটিই প্রশ্ন—সে কাহাকে ভালবাসে, যার উত্তর সে পায় কাহিনীর শেষ পর্যায়ে। এ দিক থেকে উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়।

'হায়! মিলন হোলো......', শৈশবশ্রুত গানটির সম্মোহন শক্তির মতো সর্বত্র ব্যবহার কাহিনীকে জোড়ালো করতে এবং গতিধারা বজায় রাখতে

সাহায্য করেছে। লেখিকার গীতিকাব্যের অপরিসীম মাধুর্য্যের সাক্ষ্যবহন করে গানটি যা উপন্যাসের পশরা। চিরদিন বিশ্বের যত রোমান্স, যত ভালবাসা যা পাঠককে বিমুগ্ধ করে, এ গান যেন তারই বাণী বহন করছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী তৎকালীন সময়ের সুলেখিকার দাবী অর্জন করেন। তাই যখনি তাঁর লেখায় নিজের দেখা ও চারপাশের জগতের উপাদান আরোপ করেছেন, তখনি তাঁর রচিত সাহিত্য তৎকালীন সমাজ দলিল রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এ-উপন্যাসে তরুণ প্রেমের সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত, তাই শত বছর পূর্বে রচিত 'কাহাকে' উপন্যাসটি এ-যুগের পাঠককেও আকর্ষণ করে।

প্রসন্নময়ী দেবী

প্রসন্নময়ী দেবীর সুদীর্ঘ বিরাশি বছরে জীবনে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ন'খানি, কাব্য চারখানি এবং গদ্য পাঁচখানি। পাঁচখানি গদ্যের মধ্যে মাত্র একখানিই উপন্যাস, 'অশোকা'—প্রকাশকাল ১২৯৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। বারোটি পরিচ্ছেদ। প্রতিটি পরিচ্ছেদ উপ-শিরোনামে ঘটনার পূর্বসংকেত, যথাক্রমে মাতাকন্যা, বালক-বালিকা, জীবারাম গোস্বামী, পিতা-পুত্র, রাখিবন্ধন, পীড়া ও দুর্দিন, তারাদেবীর জীবন কাহিনী, চিকিৎসক সমাগম ও তারাদেবীর মৃত্যু, প্রস্তাব ও পরিচয়, বিবাহ ও স্থানান্তর, বিপ্লব, আক্রমণ ও জীবনরক্ষা।

উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী—মথুরার বলরামঘাটের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্রকুটীরে তাবাদেবী তাঁর বালিকা কন্যা অশোকাকে নিয়ে বাস করতেন। তারাদেবীর মামা জীবরাম গোস্বামী সন্ন্যাসী মানুষ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকেন তিনি বিভিন্ন সময়, মাঝে মাঝে মা-মেয়ের খবরাখবর করেন। অশোকার শৈশবের সাথী অরণ্যকমল। ধীরে ধীরে তারা বড় হ'তে থাকে। অশোকা তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা, অরণ্যকমল কিশোর বয়স্ক যুবক, উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মিল। অরণ্যকমলের পিতা তাদের বিবাহে বাধা দিলেন, কারণ তারা রাজপুত, অশোকা ব্রাহ্মণ কন্যা।

"আমি থাকিতে তুমি রাজপুত কন্যা ভিন্ন বিবাহ করিতে কখনও পারিবে না। ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিলে আমার জাতিনাশ হইবে, আমি এই বৃদ্ধকালে সমাজ, জাতি ও জ্ঞাতি-বন্ধুহীন হইয়া থাকিতে পারিব না।...কিন্তু তুমি ভিন্ন জাতিতে বিবাহ করিবে না, তাহাই আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"[২২]

অরণ্যকমল বৃদ্ধ পিতার দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেও সঙ্গে এও ঠিক করল কোনোদিন বিবাহ করবে না। অশোকাকে সে তাই রাখি পূর্ণিমার দিন সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে 'রাখি' বন্ধনের মধ্য দিয়ে বোন সম্পর্ক পাতালো। একান্ত অনিচ্ছায় তাদের এ সম্পর্ক তৈরী হোলো কিন্তু তার মনের অবস্থা লেখিকার লেখনীতে ভাষা পেয়েছে—

"... বালিকার প্রাণের ব্যথা অরণ্যকমল ভিন্ন কে লক্ষ্য করিল—আর ? এ সংসারে নৈরাশ্যের নিশীথ অশ্রুকণা ও হৃদয়ের গভীর নিস্তব্ধ ক্রন্দনধ্বনি কে কবে সমবেদনার সহিত সান্ত্বনা করিয়া থাকে ? স্বজন পরিবেষ্টিত একঘরে পৃথকশয্যায় শয়ন করিয়া যখন অন্ধকারে যন্ত্রণার নয়নাসারে উপাধান অভিসিক্ত করা যায় তখন কে তাহা লক্ষ্য করে।"[২৩]

জীবারাম গোস্বামী মাঝে মাঝেই তারাদেবীদের খবর নিতেন এবং আর্থিক সাহায্যও করতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন জীবারাম গোস্বামীর খবর না পাওয়ায় তারাদেবী কন্যা এবং পরিচারিকা যশোদাকে নিয়ে দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়লেন। মানসিক উদ্বেগ ও অপরিমিত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হোলো এবং ক্রমাগত উপেক্ষায় অবশেষে তিনি শয্যাগত হলেন। এর কিছুদিন বাদে যখন জীবারাম গোস্বামী একদিন প্রবল বর্ষার রাত্রে এলেন তখন তারাদেবী মৃত্যুপথযাত্রী। বহু চেষ্টা করেও তারাদেবীকে বাঁচানো গেল না। ডাক্তার রমেন্দ্র বললেন

"মহাশয়, রোগীর আর বাঁচিবার আশা নাই। সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে, এখন ঔষধ দেওয়া বৃথা।"[২৪]

তারাদেবীর মৃত্যুতে জীবারাম গোস্বামী অশোকার জন্য বড্ড ভাবনায় পড়লেন, কিন্তু এভাবনার অবসান ঘটালেন ডাক্তার রমেন্দ্র। তিনি অশোকাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব দিলেন। রমেন্দ্রর পত্নী এক বছরের একটি শিশু সন্তান রেখে বিয়োগ হওয়াতে এখন তার ঘরশূন্য। গোস্বামী ঠাকুর এ প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং রমেন্দ্রনাথের সঙ্গে অশোকার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর অশোকা যশোদা সমভিব্যাহারে স্বামীর গৃহে বাস করতে লাগল।

বিবাহের কিছুদিন বাদে রমেন্দ্রনাথের লক্ষ্ণৌ বদলীর নির্দেশ এলে অশোকা খুশীই হয়েছিল, কারণ,

"অশোকা শুনিয়াছিল যে অরণ্যকমল লক্ষ্ণৌ আছেন, তাই তাহার কত কথা

একে একে অশোকার মনে আসিতে লাগিল ও সে একটু মৃদু হাসিয়া সচঞ্চল ক্রীড়াশীল খোকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া যশোদাকে খবর দিতে গেল।"[২৫]

লক্ষ্ণৌ গিয়ে ডাক্তার রমেন্দ্রনাথ পরিবার সমেত বিষম বিপদের সম্মুখীন হন।

"সিপাই বিপ্লবের প্রধূমিত ঘোর বহ্নি পশ্চিমের নানাস্থানে সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৮৫৭ সালের ১০-ই মে তারিখে মিরাট সহরে ক্ষিপ্ত সিপাইগণ যুক্তভাবে হঠাৎ কারাগার ও ইংরাজ সৈনিক নিবাস ভাঙ্গিয়া ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষগণকে স্ত্রীপুত্র সহ অযথা হত্যা করিল। কত নিরাপরাধী বৃটিশ কর্মচারী তাহাদিগের হস্তে অকালে জীবন হারাইল।

এই শোচনীয় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে ভারতের চতুর্দিকে মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল। সে সমাচারে রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বড়লাটের স্থির সিংহাসন টলিল এবং বড় বড় ইংরাজ 'মহলে' ভীতি উৎপাদন করিল। উন্মত্ত বিদ্রোহীগণ অদ্য এখানে কল্য সেখানে, গুপ্তভাবে, কখন বা প্রকাশ্যে ইংরাজদিগকে হত্যা ও তাহাদিগের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলেই আপন আপন প্রাণ লইয়া বিব্রত, কেহ কাহাকে সাহায্য করিতে অবকাশ পায় না। সজ্জিত অট্টালিকা ও নানাবিধ ভোগ বিলাস পরিহার করিয়া বিলাসিনী ইংরাজ রমণী গোপনে সামান্য পরিচারিকার বেশে যে 'নিগারকে' পদ দলিত করে সেই 'নেটিব নিগার' দীন কৃষকের পর্ণশালায় জীবন রক্ষার্থে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের অপার দয়ায় ও মনুষ্যত্বে কখন কখন নিরাপদ হইয়া কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় স্যার হেনরি লরেন্স সাহেব (Sir Henry Lawrance) অযোধ্যার চিফ্ কমিশনার (Chief Commissioner)। তিনি তৎকালে লক্ষ্ণৌ অবস্থিত হইয়াও নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে বশীভূত এবং নিরস্ত করিতে পারিলেন না এবং অবশেষে তাহাদিগের হস্তেই সাংঘাতিক রূপে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

সেই সময় তাঁহার অধীন অন্যান্য রাজকর্মচারীর ন্যায় রমেন্দ্রবাবুও লক্ষ্ণৌ সহরে সৈনিকদিগের চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিদ্রোহের সমকালীনই তিনিও সেখানে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। সদা সর্বদা ইংরাজ শিবিরে তাঁহাকেও

যাতায়াত করিতে হইত এবং তাহাদিগের সহবাসে ও কর্ত্তব্যানুরোধে অধিকাংশ সময় বিদ্রোহীগণের প্রতিকূলে কার্য্যাদি করিতেন। তাহাতে তিনিও বিদ্রোহী-দিগের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়া বিপদগ্রস্থ হন।"[২৬]

রমেন্দ্রনাথের আশঙ্কাই কার্যকরী হোলো। সমূহ বিপদ আশঙ্কায় রমেন্দ্রবাবু ঠিক করলেন দেশে ফিরে যাবার, সেইমত ব্যবস্থাও করা হোলো, কিন্তু যাবার আগের দিন রাত্রে তাঁর বন্দুক সমেত সরকারী ভৃত্য তেওয়ারী ঠাকুর হঠাৎ অন্তর্ধান হোলো এবং সেই দিনই গভীর রাত্রে উন্মত্ত বিদ্রোহীদল রমেন্দ্রবাবুর গৃহ আক্রমণ করল। তারা অফিস ঘরের দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করল। রমেন্দ্রনাথকে খুঁজতে খুঁজতে যশোদা যে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্র পাহারা দিচ্ছিল সেখানে প্রবেশ করে তার কাছে চাবির খোঁজ করল। যশোদা চাবি দিতে অস্বীকার করায় তাকে প্রচণ্ড প্রহার করে দড়ি দিয়ে বেঁধে গায়ে কাপড়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল। এসময় হঠাৎ রমেন্দ্রনাথের শিশুপুত্রের কান্নার আওয়াজ শোনা গেলে বিদ্রোহী সিপাইরা সেদিকে এগিয়ে গেল এবং দরজা ভেঙ্গে বেগে প্রবেশ করতে গিয়ে একজন সিপাই চোখের সামনে শিশুপুত্র সমেত অশোকাকে দেখে থেমে গেল। এই সিপাই আর কেউ নয়, অরণ্যকমল।

"রমেন্দ্রনাথ নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে গৃহদ্বার সজোরে উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইলেন এবং খোকা তাহাতে ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সেই রোদন লক্ষ্য করিয়া…অমনি প্রজ্জ্বলিত মশালে শিশুক্রোড়ে অপূর্ব ষোড়শী প্রতিমা অশোকাকে দর্শন করিয়া অরণ্যকমল স্তম্ভিত হইয়া গেল ও হস্তের মশাল শিথিলভাবে ভূমিতে খসিয়া পড়িল।"[২৭]

তেওয়ারী ঠাকুর রমেন্দ্রনাথের বন্দুক চুরি করে নিয়েছিল সেই বন্দুক দিয়েই তাঁকে গুলি করলেও সে চেষ্টা বিফল হোলো। অরণ্যকমলের সহায়তায় ডাক্তার স্ত্রী-পুত্র সমেত রক্ষা পেলেন। যশোদা আগুনে পুড়ে মারা গেলো। অরণ্যকমলের সাহায্যেই সেই রাত্রে রমেন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুত্র সমেত লক্ষ্ণৌ নগরী পরিত্যাগ করতে পারেন।

জীবারাম গোস্বামী যদিও মিরাট থেকে কানপুর পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের দলপতিরূপে গোপনে তাদের উত্তেজিত করেছিলেন এবং এ খবর ইংরাজের কানে পৌঁছালে তাঁকে ধরার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোয়। তাঁর সন্ন্যাসীর বেশ অবশ্য তাঁকে বাঁচিয়ে দিল, তিনি সেখান থেকে পালিয়ে মথুরায় শংকরানন্দ

স্বামীর আশ্রমে আশ্রয় নিলেন, অরণ্যকমল গোস্বামী ঠাকুরের পদানুসরণ করে, সেখান থেকে তারা নেপালে চলে যান।

অশোকা যথারীতি সংসার নিয়ে মেতে আছে, কিন্তু আজও তার মনে,

"অশোকা শ্বশুরালয়ে সাদরে গৃহীত হইয়া পতিপ্রেমে ও অন্যান্য সাংসারিক সুখে সৌভাগ্যবতী থাকিয়াও যশোদার জীবনের শোকাবহ অন্তিম দৃশ্য এবং শৈশব বন্ধু অরণ্যকমলের স্নেহানুরাগ ও 'রাখি' ধর্মের নিঃস্বার্থ উপকার একদিনের জন্য ভুলিতে পারে নাই।

অকৃত্রিম ভালবাসা মনুষ্য জীবনের সর্ব্বস্ব এবং তাহা যিনি একদিনও ইহ সংসারে পাইয়াছেন তিনি যথার্থ সুখী ও পুণ্যবান।"[১৮]

এখানেই উপন্যাসের শেষ। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে অশোকার চরিত্রের উত্থান-পতন ঘটাতে গিয়ে পুরুষ চরিত্র হিসাবে অরণ্যকমলের চরিত্র বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে অরণ্যকমলের চরিত্রটিকে লেখিকা ত্যাগের প্রতীক হিসাবে দেখিয়েছেন প্রথম থেকেই। ডাক্তারের চরিত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এ চরিত্রটি কাহিনীর গতিকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে। জীবারাম গোস্বামীর চরিত্রের দ্বিমুখিতা পরিলক্ষিত হয়, একদিকে সিপাহীদের বিদ্রোহী করে তোলবার প্রচেষ্টা, অপর দিকে পলায়ন প্রবৃত্তি, অবশ্য সাংসারিক কর্ত্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা চোখে পড়ে, কিন্তু সবটাই যেন খাপছাড়া মনে হয়। নারীচরিত্র যশোদার মধ্যে প্রভু ভক্তির দৃঢ়তা লক্ষণীয় যার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বলী হোলো, অথচ তেওয়ারী ঠাকুরের বিশ্বাসঘাতকতা এ পুরুষ চরিত্রটিকে কলুষিত করেছে।

অসহায় নারীকে প্রয়োজনে সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়, অশোকাকে তাই স্ব-প্রেমিককে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দূরে সরিয়ে দিয়ে দোজবরকে গ্রহণ করতে হয় যা ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর প্রাপ্য হিসাবে সমাজ মেনে নিয়েছে। এ-সমাজে কিশোরী, যুবতীকে প্রয়োজনে পূর্বসন্তান সমেত স্বামীকে মেনে নিতে হয়। লেখিকা তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বোধ হয় সমাজের ত্যাগের প্রতীক হিসাবে অরণ্যকমলকে তুলে ধরেছেন, সে আত্মবাসনাকে বিসর্জন দিয়েছে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে। লেখিকা তাঁর এই উপন্যাসে ঊনবিংশ শতকের সামাজিক চিত্র, সঙ্গে ইতিহাসাশ্রিত ঘটনাকে নিয়ে সমতা রক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণতা আনবার যে চেষ্টা করেছেন তা সফল হয়েছে।

শরৎকুমারী দেবী

"মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোনও পুরুষ গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না"।

এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন লেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরানী দেবীকে উদ্দেশ্য করেই। বাস্তবিকই একথা সত্য যে, উনবিশ শতাব্দীর সাহিত্য জগতে শরৎকুমারী দেবীর সমসাময়িক কোন লেখিকা বোধ হয় তাঁর মত মেয়েদের কথা এমন সহজ সরলভাবে সাহিত্যে উপস্থাপন করতে পারেননি। অবশ্য একেবারেই নেই বললে হয়ত ঠিক বলা হবে না, কারণ, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনায় সামগ্রিকভাবে সমাজচিত্র ফুটে উঠলেও মেয়েদের কথা বলবার সময় তাঁর লেখনী ছিল অত্যন্ত দৃঢ়।

শরৎকুমারী দেবীর বেশ কয়েকটি লেখা তদানীন্তন 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এগুলি বলতে গেলে সবই তদানীন্তন নারীসমাজের বিশেষ করে কলকাতার নারী সমাজের কথা। তাঁর রচিত উপন্যাস একটিই মাত্র, 'শুভবিবাহ', একটু পরিণত বয়সের লেখা। যদিও এ উপন্যাসটি প্রকাশ করবার বাসনা লেখিকার মনে হয়নি! তবে শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সমসাময়িক এবং ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর যথেষ্ট পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উপন্যাসের সন্ধান পেয়ে. এ'টি 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' ছাপাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শরৎকুমারী দেবী রাজী হননি, অবশ্য পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই শরৎকুমারী দেবী 'শুভবিবাহ' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দেন। কিন্তু স্থির হয় গ্রন্থে লেখিকার নাম ছাপানো যাবে না, সেইকারণে ১৩১২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মজুমদার লাইব্রেরী থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় লেখিকার নাম ছাড়াই।

অন্তঃপুরের একটা স্বতন্ত্র জীবন আছে যা প্রাত্যহিক জীবন ধারার সঙ্গে সবার অলক্ষ্যেই ফল্গুস্রোতের মত বয়ে চলেছে। এ-বহমান ফল্গুস্রোতের গতি বৃহত্তর চলমান সমাজের দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ। তাই অন্তঃপুরের এ-জীবনের রস এবং রহস্যের পরিচয় অন্তঃপুরের সীমানার বাইরে যারা থাকেন তাঁদের চোখে সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে না। লেখিকার সমস্ত রচনাতেই ছড়িয়ে আছে নারী-জীবনের মর্মকথা, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার অন্তঃপুরের

পরিবর্তিত অবস্থার কথা। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রেখেই নারীদের চালচিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। এই চিত্রের সম্পূর্ণ উপস্থিতি দেখা যায় লেখিকার 'শুভবিবাহ' উপন্যাসে। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয়, শরৎকুমারী দেবী নিজে যে পরিবেশে জীবনযাপন করতেন তার নিখুঁত ছবি এ-উপন্যাসে ধরা পড়েছে। কলকাতার সামাজিক চিত্রও চিত্রিত হয়েছে।

আমাদের দেশে দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত একটি বৃহৎ যৌথ পরিবার কিভাবে পরিচালিত হোতো তার নির্ভরযোগ্য ছবি এখানে মেলে। এ উপন্যাসে অন্দরমহলের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তাঁর মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজ বিবর্তনের ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'শুভবিবাহ' প্রকাশের পর ১৩১৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' এর সমালোচনা প্রকাশ পায়,

'পরিচয় থাকিলেই তাহার বিষয়ে যে সহজে লেখা হয়, এ-কথা ঠিক নহে। নিত্য পরিচয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়তা আনে—মনকে যাহা নূতন করিয়া, বিশেষ করিয়া আঘাত না করে মন তাহাকে জানিয়াও জানে না, যাহা সুপরিচিত, তাহার প্রতিও মনের নবীন ঔৎসুক্য থাকা একটি দুর্লভ ক্ষমতা।

শুভবিবাহে লেখিকা সেই ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলার কোন গল্পের বইয়ে আমরা দেখি নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণ যে লেখিকার বানানো, এ কথা আমরা কোন জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই।'[৩০]

উপন্যাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় কোনো জটিলতা নেই, অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে প্রায় নাটকের আঙ্গিকের সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীটি শুরু থেকে শেষ করেছেন লেখিকা।

প্রবাসিনী ভুবনেশ্বরী দীর্ঘদিন পরে লাহোর থেকে কলকাতায় দিদির বাড়ী এসেছেন পুত্র গণেশকে সঙ্গে নিয়ে। ভুবনেশ্বরী অর্থাৎ ভুবনের চোখ দিয়ে লেখিকা কলকাতার ক্রম-পরিবর্তনের চিত্রটি দেখিয়েছেন। এখানে আছে দু' টি কায়স্থ পরিবারের অন্তঃপুরের চিত্র এবং একটি বনেদী ধনী পরিবারের ধসে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থার চিত্র। দুটি কায়স্থ পরিবারের একটি সাবেকী ধাঁচের, অপরটিতে নবযুগের ছোঁয়া লেগেছে—এই দু'টি পরিবারের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য তা শরৎকুমারী দেবীর লেখনীতে ফুটে উঠেছে অত্যন্ত নিপুণভাবেই। ভুবনের দিদির পরিবার প্রাচীনপন্থী, সেখানে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো হয় না,

কিন্তু বিয়ে দেবার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অপরটি নীরদচন্দ্রের শিক্ষিত পরিবার। এ পরিবারে আপাত সাবেক চালচলন বজায় আছে, মেয়ে-বৌরা ইংরাজী জানে, গান বাজনারও প্রচলন আছে অন্তঃপুরে। ভুবনের ননদ অর্থাৎ গণেশের পিসিমার মস্ত বড চকমিলান বাড়ী, একদিকে মস্ত ঠাকুর দালান। এ-পরিবারে আছেন মাত্র 'দু'জন বিধবা রমণী যাঁরা অন্তঃপুরবাসিনী, মস্ত বড় সম্পত্তি, ভোগ করবার জন্য নেই কোনো বংশধর। আছে শুধু,

"কেন ভাই, শ্যামসুন্দরই ত আমার পুষ্যিপুত্র। যখন তাঁকে সকলে পুষ্যিপুত্র নেবার জন্য পেড়াপেড়ি করলেন, তিনি শ্যামসুন্দরকে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন, আমাকে বল্লেন যে, 'শ্যামসুন্দরই তোমার পুত্র, তাঁর সেবা করেই সুখী হবে, অন্য সন্তানের মত তিনি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাবেন না'……।"[৩১]

ভুবনেশ্বরীর দিদির পরিবারের আর্থিক অবস্থা পূর্বে বেশ খারাপ ছিল, কিন্তু ক্রমে তার পরিবর্তন হয়,—

"ক্রমে ক্রমে দিদির ছেলেগুলির মধ্যে কেহ মুচ্ছুদ্দী, কেহ ডাক্তার, কেহ ডেপুটি, কেহ উকিল হইয়া অট্টালিকায় পারণত হইয়াছে। দাসদাসী, পাচক ব্রাহ্মণ, মাষ্টার, সরকার, পণ্ডিত, পুত্র, পুত্রবধূ, মেয়ে, জামাই, নাতি, নাত্নী, নাতজামাই, নাত্‌বৌ প্রভৃতিতে দিদির অট্টালিকা পরিপূর্ণ।"[৩২]

দীর্ঘদিন পরে দিদি বোন ভুবনকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী। এখানে লেখিকা এ অবস্থার প্রকাশ ঘটিয়েছেন একেবারে সামাজিক সহজ কায়দায়—

"ওলো, কত ভাগ্যি করলে তবে বোনের দেখা পাওয়া যায়, কথায় বলে যে, রাজায় রাজায় দেখা হয় তো বোনে বোনে দেখা হয় না।"[৩৩]

নারীসমাজের নানান সমস্যার কথাও এ-উপন্যাসে উপস্থিত। ভুবনের দিদির মেয়েদের এক এক রকম পরিবারে বিয়ে হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সমস্যাই স্বতন্ত্র। লেখিকা এখানে দেখাতে চেয়েছেন ধনী ও আপাত দৃষ্টিতে সুপাত্রের হাতে কন্যাদান করলেই নারীজীবনের সব সমস্যা দূর হয় না। সেখানে নারীর সুখ পরমুখাপেক্ষী। যেখানে নারীর নিজস্ব কোন মূল্য নেই সেখানে বাইরের অর্থ সাচ্ছন্দ্য প্রকৃত সুখ নয়! ছোট ছোট ঘটনার ছবি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি এক গভীর সত্যে পৌছবার প্রচেষ্টা রেখেছেন,

"আর বোন্, অশুভক্ষণে তাদের গর্ভে ধরেছি। বড় ঘরে দিলেই বা কি

হবে, আর বিদ্বান্ দেখে দিলেই বা কি হবে, কপালের ভিতর যা লেখা আছে, তাই ত হবে। মেয়েটার দশা ত ঐ দেখছিস্, পেটে একটা মেয়েও নেই যে, তাই নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে প্রাণ ধারণ করবে। মেজ মেয়ে শুধু-অমন বড়-মানুষের বাড়ী বিয়ে দিলুম—হতভাগা জামাই এমনি মাতাল, সবস্ব উড়িয়েছে, ইন্দ্রপুরীর মত বাড়ী ঘুচিয়ে এখন আমাদের একখানা ভাড়াটে বাড়ীতে রয়েছে, সদু তাকে গায়ের গহনা বিক্রি করে খাওয়ায়······মেজর ঐরকম পোড়া—সেজর দশা শোন্—সেজ জামাই মস্ত-ডাক্তার। গাড়ী ঘোড়া সুখ ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। আপনি মস্ত সাহেব, কিন্তু আমার মেয়ের জামাটি গায়ে দেবার হুকুম নেই, গাড়ী চড়বার হুকুম নেই, কালে ভদ্রে যদি আমার কাছে আসবে এব ঘেরাটোপ মোড়া পাল্কী ক'রে দুই দরওয়ান দুই দাসা দিয়ে পাঠাবে। তারা যমদূতের মত ব'সে থাকবে—'চল চল' ক'রে হাড় জ্বালিয়ে খাবে, একটা যে মনের কথা কইবে, তার পর্য্যন্ত জো নেই। কর্ত্তার কাছে যাবে, দাসীরা সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে আছে ;····· মেয়ে মানুষের আসল ভাল হ'লে তবে ত সুখ। তা জামাই মেয়ের দিকে ফিরেও দেখে না—শুনতে পাই নাকি মেম বে করেছে, তার ছেলেপিলেও আছে, রাত্রে সেইখানেই খাওয়াদাওয়া, রাত ১২ টার সময়ে বাড়ী আসে, তা সে মা গিয়ে ভাত খাওয়ার কাছে বসে, কাজেই বিধু সেখানে যেতেও পায় না। আর যাবেই বা কি করতে ? মুখ তুলে ত কথাও কইবে না। শুনেছি, জায়েরা এক একদিন বাহিরে বিধুকে শুতে পাঠিয়ে দেয়······ তা কোন দিন বাছাকে শুতে বলে, কোনদিন তাও বলে না। মনের দুঃখে সে আর এদানীং যায়ও না। কত বলব বোন্, আবার কাদুর শাশুড়ী এমন বৌ কাঁটকী, বৌটাকে পেট ভ'রে খেতেও দেয় না··· ।"[৩৪]

উপন্যাসের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক্। নীরদচন্দ্রের মেয়ের বিয়ের গায়ে হলুদের দিনের বর্ণনায় ছোট-খাটো, খুঁটি-নাটি, বিষয়কে সহজ সরলভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা, সামাজিক আচার-আচরণ কোনো কিছুরই ঘাটতি নেই। নীরদচন্দ্র ভুবনেশ্বরীর দিদির মেজ দেওর পো। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান মিটে গেল, এরপর বিয়ের দিনের ঘটনার চিত্র এঁকেছেন তিনি। এরই মাঝখানে ভুবনেশ্বরী তাঁর ননদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন, সেখানকার চিত্রটিও এ-উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত হয়েছে।

বিয়ের দিন দুপুরবেলা ননদের বাড়ী থেকে আহারন্তে বিয়ে বাড়ী রওনা

হলেন ভুবনেশ্বরী। সেখানে পৌঁছে লক্ষ্য করলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

"দিদি রান্নাঘরের রকে বেড়াইতেছেন ও গজ্‌গজ্‌ করিয়া বকিতেছেন, নীরুর মা ভাঁড়ার ঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া আছেন—অন্যান্য সকলে কাজকর্ম করিতেছেন,—কিন্তু সকলেই যেন কেমন মন-মরা, কারো মুখে হাসি নাই।"[৩৫]

ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞাসাবাদ করে শুনলেন যে, ছেলের বাড়ী থেকে কথা উঠেছে মেয়ে কালো বলে, অধিবাস নিয়ে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা এখনো ফেরেনি, নান্দীমুখ করবার অনুমতি আসেনি। এছাড়া, টাকার গোলমাল,—তাই বিয়ে ভেঙ্গে গেল। সন্ধ্যার সময় ঘটকের সঙ্গে নীরু ছেলের বাড়ী থেকে এসে খবর দিল,

"নীরু আসিয়াই হতাশভাবে বসিয়া বলিল, 'দিদি বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে এলুম।'

রানী! কিরে, কি সর্বনেশে কথা বলিস?

নীরু! হ্যাঁ সত্যিই বলছি……ঘটক এখন এসে বলছে কি যে, গায়ে হলুদের দিন যে হাজার টাকা দিয়েছি. সেটা আমি বরকে আশীর্বাদী দিয়েছি—আজ আড়াই হাজার টাকা পুরোই দিতে হবে—ঐ টাকা বরের বাড়ী পৌঁছে দিলে তবে বর আসবে। আমি ব'লে এসেছি যে, 'যদি আমি ও-বরে মেয়ের বিয়ে দিই, তবে আমার চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে!, · ···।"[৩৬]

রাগের মাথায় বিয়ে ভেঙ্গে দিলে, বিয়ের রাত্রে মেয়ে লগ্নভ্রষ্ট হবে এ চিন্তায় বিয়ে বাড়ি নিরানন্দ হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় ভুবনেশ্বরী সমস্যার সমাধান করে দিলেন এবং একটা নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটল।

"নীরু, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে গণেশের হাতে তোমার কন্যাটি সম্প্রদান কর। তোমরা মৌলিক-গণেশের কুলকর্ম হবে না, তার কুল খাটো হয়ে যাবে বটে, কিন্তু জাত যাবে না—তোমার জাত যেতে বসেছে···"।[৩৭]

এ অবস্থায় নীরু যেন হাতে স্বর্গ পেল এবং শুভবিবাহ সম্পন্ন হ'য়ে গেল। এখানে লেখিকা নারীকেই মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। ভুবনেশ্বরীর মধ্য দিয়েই নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। অন্তঃপুরবাসিনী হয়েও একজন নারীই পারে ভুবনেশ্বরীর মত এ ধরনের জটিল সমস্যার সমাধান করতে। এ ধরনের

কাহিনী শরৎকুমারী দেবীর উপন্যাসেই সম্ভব। তাই তো রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, মেয়েদের কথা শরৎকুমারী যেভাবে লিখেছেন তা কোন পুরুষ গ্রন্থকার লিখতে পারেননি।

বিনোদিনী

বিনোদিনী ছিলেন রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী। নটী জীবনের কর্মব্যস্ততার স্বল্প অবসর সময়ে তিনি কাব্যচর্চা করতেন। তিনি যে সুলেখিকা ছিলেন তাঁর কাহিনীকাব্য 'কনক ও নলিনী' (কলিকাতা, কালিকা প্রেস ১৯০৫) সাক্ষ্য বহন করে। যিনি রঙ্গমঞ্চের একজন সুঅভিনেত্রী, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা সাহিত্যিকের নামের তালিকায় তাঁর নাম যে একজন কাহিনীকাব্য রচয়িত্রী হিসাবে শোভাবর্ধন করতে পারে একথা ভাবলে আজকের এই চলমান শতাব্দীর পাঠক হিসাবে গর্বে বুক ভরে ওঠাই স্বাভাবিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীসমাজ ছিল পর্দানসীন। নারী শিক্ষার প্রভাব সেখানে সামান্যই বিস্তারলাভ করেছে। এমতাবস্থায় একজন রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীর এই রচনা আলোচিত হওয়া খুবই জরুরী।

কনক এবং নলিনী দুই বোন। তারা সারাদিন নদীতীরে খেলা করে বেড়ায়, তাদের বাস তপোবনে,—কারণ,

> তাপস তনয়া তারা সরলা সুধার ধারা,
> মূর্ত্তিমতী বনদেবী মূরতি মোহন॥
> নাহি জানে মাতৃস্নেহ, পিতা বই নাই কেহ,
> জানে শুধু পিতা আর তারা দুটি বো'ন।[৩৮]

এদের মধ্যে নলিনী ছোট বোন—বয়স নবম এবং কনক বড়—বয়স ত্রয়োদশ। সারাদিন এরা দুটি বোন নিজেদের মনে ঘুরে বেড়ায়, কখনও বা হরিণীর পিছু ছুটে যায়, কখনও আকাশের তারা গোনে, কখনও বা নদীর তীরে বসে পাখীদের গান শোনে। সারাদিন তপোবনে খেলা করবার পর তারা পিতা তপস্বীর কুটীরের দ্বারে এসে দেখে পিতা বসে শিশিরের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করছেন। এই শিশির হোলো—

> একবিংশ বয়ক্রম শিশির এখন।
> শান্ত ধীর সুপণ্ডিত মধুর বচন॥

তীর্থ পর্য্যটন গিয়ে দ্বারকা ভুবন।
পাইয়ে অনাথ শিশু আনে তপোবন॥
পিতা মাতা কেহ তার ছিলনা—সংসারে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক পালিত তাহারে॥
এবে তাপসের হাতে ক'রে সমর্পণ।
জীবনের পর পার করেছে গমন॥
কুটীরে আনিয়ে তায় পিতার মতন।
যতনে তাপস তারে করেন পালন॥[৩৯]

শিশির এই দুই বোন কনক এবং নলিনীর খেলার সাথী। ধীরে ধীরে তারা বড় হতে থাকে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কনকের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সে যেন,

কিন্তু কনকের মন কখন কেমন।
কি যেন কিসের আশে হয় নিমগন॥
কি অভাব মনোমাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়।
এই বুঝি এই নয় কোথায় পলায়॥
ফুল প্রজাপতি খেলা দেখিয়া এখন।
কনকের নাহি আর পূরে প্রাণমন॥
খেলিতে এখন আর হরিণীর সনে।
ধায়না কনকবালা দূরতর বনে॥
ফাঁকি দিয়ে নলিনীকে খেলিতে পাঠায়।
আপনি একাকী সদা থাকিবারে চায়॥[৪০]

এভাবে বালিকা স্বভাবা কনক যেন ধীরে ধীরে শান্ত, ভাবুক হয়ে উঠল. সর্বদাই সে সবার অলক্ষ্যে নদীতীরে চুপচাপ বসে থাকে। একদিন নলিনী তার দিদিকে খুঁজে না পাওয়ায় শিশিরকে জানালে শিশির কনককে খুঁজতে খুঁজতে শেষে নদীতীরে এসে দেখে কনক,

'শূণ্যপানে দৃষ্টি ক'রে,
দেখিছে চাঁদ চকোরে,·····[৪১]

শিশির তার পাশে ধীরে ধীরে বসল এবং বাল্যকালের খেলার ন্যায় কনকের চোখ দু'টি বন্ধ করে ধরল। এভাবও ভাল লাগল না তাই সে শিশিরকে তার

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিতে বলল। শিশির তার এরকম ব্যবহারের সঙ্গে একা বসে থাকবার কারণ জানতে চাইলে কনক প্রথমে এর সঠিক উত্তর দিতে না চাইলেও মনের অজ্ঞান্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো,

একাকী থাকিতে প্রাণে কেন সাধ হয়।
মনে হয় যাই ভেসে, যেন কোন দূর দেশে,
কিছু নাহি লাগে ভাল সব শূন্যময় ॥[৪২]

শিশিরের মুখে পিতার অসুস্থতার কথা শুনে কনক তখনই তার সঙ্গে কুটীরে ফিরে এল। কুটীরে এসে তারা দেখল,

শুষ্ক পত্র তৃণ' পরে করিয়া শয়ন,
শ্রীহরির ধ্যানযোগে আছেন মগন,
বাসনা মনেতে তাঁর, এড়াতে সংসার ভার
পুরাতন দেহবাস এবে ত্যাজিবারে।
যাইবেন স্বর্গবাসে চিরদিন তরে ॥[৪৩]

পিতার অসুস্থতায় দুই বোন অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। তপস্বী তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে এ সংসারে চিরদিন কেহ থাকে না। সংসারের এই মায়ার বন্ধন কাটিয়ে সময় হোলে সবাইকে চলে যেতে হবে। তাই তারা যেন মনকে শক্ত করে। শিশিরের প্রতি তিনি যে দায়িত্বভার অর্পণ করলেন, তা হোলো কনককে গ্রহণ করা এবং নলিনীকে ভগ্নীবৎ স্নেহে প্রতিপালন করা।

"অতএব রেখো বৎস বৃদ্ধের বচন,
শ্রীহরির পাদপদ্ম ভুলনা কখন,
আর এক দিই ভার, বৃদ্ধের গলার হার,
সরলা সুশীলা মম কনক কুমারী।
এতদিন ছিল মোর, এখন তোমারি ॥

... ...

সুখে রেখো, সুখে থেকো করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হলো আজি এক জীবনের সাধ,
আর এক কথা রেখো, নলিনীরে স্নেহে দেখো,
পিতৃমাতৃহীন বালা জানিতে না পারে
ভ্রাতৃভাবে স্নেহ ক'রো সদা তুমি তারে ॥"[৪৪]

তপস্বী দেহত্যাগ করলেন। এরপর পাঁচ বছর অতিবাহিত হোলো। নলিনী এখন কিশোরী। কনকের সঙ্গে শিশিরের বিবাহ হয়েছে, তাদের একটি পুত্র সন্তান অরুণ। জীবিকা নির্বাহের কারণ অর্থোপার্জনকল্পে শিশির জমিদারের বাড়ীতে নায়েবির কাজ করে। তপোবনের পাতার কুটীর আজ আর নেই, বড় ঘর তৈরী হয়েছে। এভাবেও ছয় বৎসর চলে গেল।

শিশিরকে জমিদার খুবই পছন্দ করেন, তাঁর একমাত্র কন্যা নীলিমার সঙ্গে অরুণের বিবাহের পাকা কথা ঠিক করে রেখেছেন জমিদার। তাই অরুণ এখন পাঠগ্রহণের কারণে জমিদার বাড়ীতেই থাকে,

সে অবধি সেইখানে থাকয়ে অরুণ।
নীলিমা অরুণ সনে, খেলে সদা সুখ মনে,
এক স্থানে বসি করে পাঠ অধ্যয়ন।[৪৫]

নলিনী এখন যুবতী, কিন্তু এখনও সে হরিণীর মত বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। সংসার বন্ধন তার মনে নেই। দূর বনে বৃক্ষের ছায়ায় বসে সে আপন মনে হরিগুণ গায়,

অমল কমল আঁকি, পবিত্র প্রেমেতে মাখি,
পরমেশ পায় যেন লুটাইতে চায়।
অশ্রুবারি মুক্তাসারি হৃদি ভেসে যায়॥[৪৬]

কিন্তু আজকাল নলিনী বড়ই উদাসীন, আত্মভোলা। কখন বা নানারকমের ফুলের গহনা তৈরী করে দিদিকে ও অরুণকে সাজায় এবং কি এক ভাবেতে বিভোর হয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে থাকে, তার চোখে জল, হঠাৎ—

টুস করে ভেসে প'ড়ে চরণে লুটায়।
উপহার দিবে ব'লে মাটীতে গড়ায়॥[৪৭]

নলিনীর এরকম অদ্ভুত ভাবধারায় কনক চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ জানতে চাইলে কোনো উত্তর সে নলিনীর কাছ থেকে পায় না। নলিনী সর্বদাই আপনমনে বিভোর হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, নিজের মনেই কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। সর্বদাই উদাসভাব তার। এমনকি জমিদার বাড়ীতে কোনো কাজকর্মে নিমন্ত্রিত হলে তাকে নিতে এলেও সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায় না। নলিনীর এই উদাসভাব দূর করবার জন্য শিশির ও কনক ভাবল বুঝিবা বিবাহ দিলে ঠিক হয়ে যাবে, তাই তারা জমিদারের ভাইপো ললিত কুমারের সঙ্গে

বিবাহ দেবে ঠিক করল। কিন্তু নলিনী বিবাহ করতে রাজী নয়,

শিশিরের কথা শুনে ফিরায়ে নয়ন।
কি উদাসভাবে চায়, কিছু নাহি বুঝা যায়,
শবসম রক্ত হীন সরস বদন।[৪৮]

দিন দিনই নলিনীর ভাবের পরিবর্তন হতে থাকে, তার উদাসীনতা বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে সে অসুস্থও হয়ে পড়ে। একদিন সে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ল, কনক ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

নিজ কোলে মাথা রাখি মুখপানে চায়।
আঁখিপাতা নাহি নড়ে, নিশ্বাস নাহিক পড়ে,
বিবর্ণ সুবর্ণ দেহ যেন শবপ্রায়।[৪৯]

এভাবে দিনে দিনে নলিনীর অসুস্থতা বাড়তে থাকে। কনক ও শিশির যদিও তাকে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা কিছুটা সুস্থ করে তুলল কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ বুঝি হবার নয় নলিনী। তাই কনক একদিন বোনের কথা শুনে খুবই ব্যথিত হ'য়ে পড়ল, নলিনী বলল,

দিদিগো, পিতারে বড় পড়িছে মনে,
তাই আঁখি জল মম না মানে বারণ।
বড় সাধ হয় মনে মিলি তাঁর সনে;
কতদিন দেখি নাই তাঁহার চরণ।[৫০]

কনক বোনকে সান্ত্বনা দেয়, বিয়ে দিয়ে সংসারী করবার মনবাসনা ব্যক্ত করে, কিন্তু নলিনীর কাছে তা অর্থহীনের মত প্রত্যুত্তর হ'য়ে ফিরে আসে, নলিনী উত্তর দেয়, তার সংসারের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন আর তাই বিবাহ ক'রে সংসারের বন্ধনের প্রয়োজন নেই। এ উত্তর শুনবার জন্য কনক একেবারেই প্রস্তুত নয়, কিন্তু বোনকে আঘাত দিতে সে চায় না, তাই বোনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল না।

বিবাহেতে সাধ যদি না হয় তোমার
থাক তুমি চিরদিন বনদেবী হয়ে।[৫১]

এভাবে ক'দিন চলে গেল। নলিনী এখন কিছুটা সুস্থ, ধীরে ধীরে বাইরে বেড়াতে যায়, কখনও বা নদীতীরে যায়। কিন্তু তার ভাবলেশহীন মূর্তি

নদীর জলে প্রতিবিম্বিত হলে তা দেখে সে নিজের মনে মনে হাসে। তাকে দেখে মনে হয়।

শীতল হাতেতে কেবা দিতেছে লেপন।
উন্মত্ত বাসনা সব ঘুমে অচেতন॥[৫২]

একদিন সন্ধ্যাবেলা কনক ঘরে নেই, অরুণের কাছে গিয়েছে দেখা করতে। শিশির ঘরে এসে নলিনীকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে নদীতীরে এসে দেখে, নলিনী নদীতীরে একা বসে আছে। ঠাণ্ডায় বসে থাকলে নলিনীর অসুস্থতা বাড়বে, শিশির তাই তাকে ঘরে যাবার জন্য পেড়াপেড়ি করলে, সে বলল যে, দিদি যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণ সে নদীতীরেই বসে থাকবে। শিশির নলিনীর অসুখের কথা ভেবেই তাকে আর জোর করল না, বরং তার পাশে বসে তার বিষাদের কারণ জানতে চাইল। নলিনীর এ বিষাদভাব শিশিরের ভাল লাগে না। ছেলেবেলা থেকেই সে উভয় বোনের খেলার সাথী। শিশিরের মনে প্রশ্ন জাগে নলিনী কি কাউকে ভালবেসেছে। যদি বেসে থাকে, তবে তার মিলনের ব্যবস্থা অবশ্যই করবে। তার মনের এ ভাব প্রকাশ পেলে নলিনী হেসে বলল যে শিশির কাকে মিলন বলছে—

পঞ্চম বয়স কালে খেলিতে খেলিতে
পাইনু স্বরূপ এক দেবতা দেখিতে॥
কোমল হৃদয় মম শিরীষ কুসুম সম,
ছেলেখেলা সনে তারে দিনু উপহার।
সে অবধি মন আর নাহি তো আমার॥[৫৩]

এবং সেই থেকেই সে সেই অজানা সুন্দরের পায়ে আত্মসমর্পণ করে আছে। তার কাছে প্রেম হোলো আত্মবিসর্জন। সে এখন ভালবাসা, আশা, তৃষ্ণা, বাসনা, অনুরাগ, বিরাগ, মান-অভিমান, সবই সেই সুন্দরের পায়ে সমর্পণ করেছে। এখন তাই সে বলে,

সংসারের লীলা খেলা আকাঙ্ক্ষা অর্চন।
কিছুই বাসনা হৃদে নাহিক এখন॥
যাইব পিতার কাছে, এইমাত্র সাধ আছে,
দিদি রে রাখিও তুমি করিয়ে যতন।
আমা তরে দিদি যেন না করে রোদন॥[৫৪]

নলিনীর মুখে এ ধরনের কথা শুনবে শিশির মোটেই আশা করে নি, তাই সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার মনে হোলো বিধাতার এ'কি মনবাসনা, যে নলিনী ছিল হরিণীর মতো চঞ্চল, সারাদিন বনে বনে খেলে বেড়ানোই ছিল যার কাজ, তার মধ্যে হঠাৎ এ'কি ধরনের পরিবর্তন। নলিনীকে সে স্নেহ করে, তাই নলিনীর কথায় সে ক্রোধান্বিত হয় না, বরং তার মধ্যে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসে, সংসারের এ দুঃখ, বাসনা-কামনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার মধ্যে কোথাও যেন একটা অর্থহীনতার ভাব তার মনকে অচ্ছন্ন করে। সে ভাবতে থাকে, সংসারের এ-বাসনা-কামনার জালা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথই তার মনে হয়, পরমানন্দ ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভুনারায়ণকে আত্ম-সমর্পণ। নলিনীকে তার মনে হয় যে, নলিনী মানবী নয়, তার প্রাণে পূর্ণ প্রেমের ধারা তাই বুঝি সে আর এ কামনা বাসনাপূর্ণ দুঃখময় সংসারে থাকতে চাইছে না। শিশিরের মনে হেলো সে-ও আর সংসারে থাকবে না, বনে গিয়ে শ্রীহরির চরণে আত্মসমর্পণ করবে। তাই সে বলে,

যে প্রেম সুধার ধারা আপনা হারায়।
সেই প্রেমে প্রাণ মোর মাতিবারে চায়॥[৫৫]

শিশিরের কথা শুনতে শুনতে নলিনী অচেতন হয়ে পড়ল, দু'দিন এ অবস্থায় থেকে নলিনী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। বোনের চিরবিচ্ছেদে কনক আকুল হয়ে পড়ল। কিন্তু শিশিরের মধ্যে এল এক অদ্ভুত পরিবর্তন। সে নলিনীর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল, তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,

মৃতদেহ পানে চাহি শিশির তখন।
সবারে ডাকিয়া বলে শুন দিয়া মন॥
সংসারের এই গতি বিনা সে কমলাপতি,
মানবের গতি মুক্তি নাহিক কখন!
ত্যজ শোক ভজ সেই লক্ষ্মী নারায়ণ॥[৫৫]

কনককে শিশির জানালো যে, সে আর এ মায়ার সংসার বন্ধনে থাকবে না, তীর্থে তীর্থে গিয়ে নিজেকে পরম ঈশ্বরের পায়ে সঁপে দেবার চেষ্টা করবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলেই সে ফিরে আসবে। তাই কনক যেন তাকে বাধা দান না করে, পুত্র এবং পুত্রবধূর সঙ্গে এই সংসারে থেকেই দেবতার অর্চনা করে দিন কাটায়।

তীর্থ স্থানে যাব আমি তপস্যার তরে।
মায়াজালে প'ড়ে আর রবো না সংসারে॥
বয়ে গেল বহুদিন, দেহ-তরী বল হীন,
বিদায় জনম তরে হলেম এখন।
কার্য্য পূর্ণ হ'লে পুনঃ হইবে মিলন॥[৫৭]

এখানেই কাহিনী কাব্যের শেষ হয়েছে। এ-সংসারে যে বন্ধনে থাকবে আর যে বন্ধনহীন হ'য়ে থাকবে দু'জনার জন্যই পথ খোলা আছে, লেখিকা তাঃ তাঁর কাব্যে দু'বোনের জীবনের গতি এবং ইতি দু'ভাবে উপস্থাপিত করেছেন—নলিনীকে তিনি অধ্যাত্ম সংসার-বন্ধনহীন পথে চলবার গতি অব্যাহত রেখে অবশেষে স্বরূপ দেবতার পায়ে নিবেদন করে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালেন, আর কনককে সম্পূর্ণরূপে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং সাংসারিক রীতি-নীতির গতিধারায় অব্যাহত রেখে দিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের কাহিনী কাব্যে স্থান করে নিয়ে সাহিত্যাক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করেছে। একজন মঞ্চ-অভিনেত্রীর কলমে কাব্যটি প্রশংসার দাবী রাখে।

মানকুমারী বসু

মানকুমারী দেবীর রচিত 'বনবাসিনী' স্বল্প দৈর্ঘ্যের উপন্যাস, ভাদ্র, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ (৫—সেপ্টেম্বর ১৮৮৮) বামাবোধিনী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সংক্ষিপ্ত কাহিনী উপস্থাপনে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবগত হওয়া যাবে।

যতীন্দ্রের পিতা একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু মোকদ্দমা মামলায় পড়ে তিনি হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়লেন। পিতার ইচ্ছাক্রমেই আঠারো বছর বয়সে শোভার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পিতার আর্থিক অবস্থা পড়ে যাবার জন্য কলেজের পড়া শেষ করা আর হোলো না যতীন্দ্রর। কিছুদিনের মধ্যে তার পিতা মারা গেলেন এবং তাদের গৃহে আগুন ধরে গিয়ে অগ্নিদেবের কোপে গৃহাদি ভস্মসাৎ হয়ে গেল। এ অবস্থায় যতীন্দ্রের গৃহহীন হয়ে পড়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। গৃহহীন অবস্থায় লোকালয়ে বাস করা সম্ভবপর হোলো না, তাই নিরুপায় হয়ে মাতা এবং স্ত্রী শোভাকে নিয়ে বনে কুটীর বেঁধে বসবাস করতে লাগল।

বনবাসেও যতীন্দ্রের সুখ মিলল না। এখানে আসবার কিছুদিনের মধ্যে তার মা পরলোকগমন করেন। এখন যতীন্দ্র আর শোভা বনকুটীরে বসবাস করতে লাগল। আপনার বলতে যতীন্দ্রের একজনই—সে শোভা, শোভাকে ঘিরেই তার সব।

"...স্বর্গগামিনী হইলেন। এখন যতীন্দ্রের কেবল একমাত্র সম্পত্তি শোভা। শোভাই সব। সহোদর বন্ধু শোভা, শিক্ষয়িত্রী ছাত্রী শোভা, হৃদয়ের আরাধ্য দেবী শোভা, ভালবাসিবার একমাত্র জিনিষ..."[৫৮]

চারটি পরিচ্ছেদ শিরোনামে এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের উপন্যাসটি সম্পন্ন হয়েছে—(১) স্বপ্নের কথা, (২) বাবা-মার কথা, বনের বালকের কান্না, (৩) যতীন্দ্রের আহত অবস্থা, এবং (৪) জমিদারের কুটীরে আসিয়া বিষণ্ণভাবে যতীন্দ্রের অবস্থা শোনা, চতুর্থ অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদে যতীন্দ্রের মৃত্যুতে শোভার একা বনবাসিনী হবার কথা ঘোষণা করেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখিকা।

মায়ের মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন অর্থাৎ বছর পাঁচেক যতীন্দ্র ও শোভা এই কুটীরে বাস করছিল। কিন্তু দুঃখের রজনী আজও বর্তমান, তাই হঠাৎ একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নাবস্থায় মাকে দেখে যতীন্দ্র খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়ল। শোভা এই ব্যাকুলতার কারণ জানতে চাইলে সে স্বপ্নের বিবরণ দিল,

"...দেখিলাম খুব একটা পুকুর, তাতে রাশি রাশি পদ্ম ফুটিয়াছে, সেই পদ্মের উপরে মা যেন পদ্মাসনার মত বসিয়া আছেন; পদ্ম হেলিতেছে, দুলিতেছে, মা'র পা দু'খানিও দোলাইতেছে। আমি দেখিয়া পাগলের মত হইলাম, মা'র কোলে ছুটিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল—পাগলের মত সেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। মাকে ধরিবার জন্য যত ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, মা যেন পদ্মাসনে বসিয়া ততই সরিয়া যাইতে লাগিলেন; আমার কান্না আসিল। আমায় ব্যথিতের মত দেখিয়া করুণাময়ীর হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি মধুর স্বরে কহিলেন 'যতীন বাপ আমার! কেন এ ক্লেশ করিতেছ, আজ আমার কোলে আসিতে পাইবে না।' আমি মর্মাহত হইলাম, বলিলাম 'মা! আজ পাঁচ বছরের পরে তোমার শ্রীচরণ দেখিলাম, আমি আজ তোমায় ছাড়িব না, পায়ে পড়িয়া থাকিব।' মা হাসিয়া বললেন, 'বাপ, আজ কিছুতেই আমায় ধরা পাইবে না, আমি শীঘ্র আসিয়া আবার তোমাকে কোলে লইব।' এই কথা বলিয়া তিনি কোথায় অন্তর্হিতা হইয়া গেলেন, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।"[৫৯]

লেখিকা স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছেন, যতীন্দ্রের অমঙ্গলের পূর্বইঙ্গিত প্রকাশ করবার কারণে। এটি প্রাচীন হিন্দু সংস্কারের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরবার প্রচেষ্টা, তদানীন্তন সামাজিক সংস্কারের উপস্থাপন মাত্র। তাই স্বাভাবিক কারণেই যতীন্দ্রের তথা শোভার জীবনে নেমে এসেছে এক নিষ্ঠুর পরিহাস এবং এরপরই দেখতে পাই যতীন্দ্রের গুরুতরভাবে আহত হবার ঘটনা। একদিন কুটীরের বারান্দায় বসে সংবাদপত্র পড়তে পড়তে সহসা যতীন্দ্র একটি বালকের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল, বনের ভিতর থেকেই সে আওয়াজ আসছে বুঝতে পেরে সে তক্ষুণি ঘরের যা অস্ত্র ছিল তাই নিয়েই শোভাকে সঙ্গে নিয়ে কান্নার আওয়াজ লক্ষ্য করে বনের ভিতরে এগিয়ে চলল। কিছুটা ভিতরে প্রবেশ করে তারা দেখলো এক ভীষণাকৃতি লোক একটি পাঁচ-ছয় বছরের ছোট বালককে গাছের সঙ্গে বাঁধছে, বালকের গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার এবং পরিধানে মূল্যবান পোষাক। বালকটিকে গাছের সঙ্গে বাঁধায় সে প্রচণ্ড কাঁদছে। এ-অবস্থা দেখে যতীন্দ্র সেই লোকটিকে একলাফে আক্রমণ করল। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি শুরু হোলো।

এই অবকাশে শোভা বালকটিকে কোলে তুলে নিয়ে কুটীরে দ্রুত প্রবেশ করে অর্ধমূর্ছিত বালককে কিছুটা সুস্থ করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যতীন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখল সে গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। তার সমস্ত শরীর রক্ত ধারায় ভাসছে, দুর্বৃত্তটি আর সেখানে নেই। শোভা তৎক্ষণাৎ নিজের পরিধেয় বস্ত্রের অর্ধেকটা ছিঁড়ে কাছের নদীর জলে ভিজিয়ে এনে সিক্তবস্ত্রের পট্টি বেঁধে দিল। একটু আরামবোধ করলে যতীন্দ্র শোভার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে কুটীরে প্রবেশ করে দেখে বালকটির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে, সে তার মায়ের জন্য কান্না করছে। শোভা যতীন্দ্রকে শুইয়ে দিয়ে বালকটিকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের কুটীরের সামনে বেশ কিছু পরিমাণ মানুষ জমে গেল। আহত যতীন্দ্র অসুস্থ অবস্থাতেই এর কারণ জানতে পারল। এই বন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে জমিদারের বাড়ী এবং দুর্বৃত্ত ব্যক্তিটি জমিদার বাড়ীর ভৃত্য। ছেলেটি জমিদারের। ছোট বালকের অঙ্গের বহুমূল্য স্বর্ণ-হীরার অলঙ্কারের লোভ সামলাতে না পেরে ভৃত্য এখানে বনে নিয়ে এসেছে বালককে। যতীন্দ্রের চেষ্টাতেই ছেলে রক্ষা পেয়েছে এ খবর শুনে জমিদার

ছেলেকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। সঙ্গে পুরস্কারের পাঁচ হাজার টাকা। শোভা পুরস্কার গ্রহণ করল না ;

" ··আমার স্বামী কর্তব্য কাজ করিয়াছেন, ইহাতে পুরস্কার গ্রহণ করা পাপ, আমাদের অবস্থা নিতান্ত দীন নহে, আশা করি যাহারা বাস্তবিক দারিদ্র, এই অর্থদ্বারা তাহারা পালিত হইবে। জমিদার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যে ডাক্তার পাঠাইয়াছেন, ইহাতেই আমরা যারপরনাই উপকৃত হইলাম।"[৬০]

লেখিকা এখানে শোভাকে একজন আদর্শ অর্থাৎ—পতিব্রতা, কর্তব্যপরায়ণা, নির্লোভী, পরোপকারী নারীচরিত্র হিসাবে চিত্রিত করেছেন। রাতদিন স্বামীর শিয়রে বসে তার সেবা শুশ্রূষা করেও শেষ রক্ষা করতে পারল না শোভা।

"···সহসা দম্পত্তিকে মৌন হইতে হইল। ডাক্তার বাবুর সহিত স্বয়ং জমিদার বাবু যতীন্দ্রের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া শোভা ঘোমটা টানিয়া গৃহের এককোণে দাঁড়াইলেন। ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বিষণ্নভাবে জমিদারের কাণে কাণে কি বলিলেন···"[৬১]

অর্থাৎ ডাক্তার যতীন্দ্রের জীবন প্রদীপ অস্তমিত হবার যে আর দেরী নেই সেকথাই জমিদারকে জানিয়ে দিলেন। যতীন্দ্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে, সকলেই যার যার কর্তব্য কর্ম করে ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন। কিন্তু সেই বনমধ্যে কুটীরে পড়ে রইল শুধু শোভা—শাশুড়ী ও স্বামী বিচ্ছেদের ব্যথা বুকে নিয়ে শোভা বনবাসিনী হয়ে রইল। এখানেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখিকা। স্বল্প দৈর্ঘ্যের এ-উপন্যাসটি নামকরণের দিক দিয়ে যৌক্তিকতাপূর্ণ, আর এ কারণেই লেখিকা সার্থক।

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী থেকে যতটুকু জানা যায় তা হেলো, ইনিই সম্ভবতঃ প্রথম মহিলা কবি। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশের এই কবি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য জগতে তাঁর যে রচনার মধ্য দিয়ে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন সে'টি হোলো কাব্য 'রূপজালাল'।

'রূপজালাল' কাব্য গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৮৭৬। কিন্তু মূল প্রকাশিত গ্রন্থটি সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে মোহম্মদ আব্দুল কুদ্দুস মহাশয়ের সম্পাদনায়—১৯৮৪ সালে ফেব্রুয়ারী

(ফাল্গুন, ১৩৯০) প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে মোহম্মদ আবদুল কুদ্দুস মহাশয়কে বেশ পরিশ্রম করতে হয়, তিনি তাঁর ভূমিকায় একথার উল্লেখ করেছেন।

"নারী নওয়াবের লুপ্ত স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তার দু'টা কীর্তির অবলম্বন গ্রহণ করি।...এ সময় যে সমস্যা সবচেয়ে বেশী বিব্রত করেছিল তা হল মূল বইখানার অভাব। বাংলাদেশের কোথাও সমগ্র বইখানা পাওয়া যায়নি। দেশের যে সব সাহিত্যিক ফয়জুন্নেসা সম্পর্কে লিখেছেন তাদের কাছে কোন বই নাই। সৈয়দ হাবিবুল হক সাহেব বহু তল্লাশীর পর দুই খণ্ডে ৪৭৬ পৃষ্ঠার বইয়ের মাত্র ৪০০ পৃষ্ঠা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। বাকি ৭৬ পৃষ্ঠা কোথাও পাওয়া গেল না অথচ লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বাংলা বিভাগের ক্রমিক নং ১৪১৮ তে সযত্নে রক্ষিত আছে।

নির্ভর করতে হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির উপর...।"[৬২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ, ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর সর্বাধিক কৃতিত্ব তিনিই প্রথম মহিলা কবি যাঁর কাব্য 'রূপজালাল' ১৮৭৬ সালে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ হয়। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যের প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯ সাল। গদ্য-পদ্যের সমাবস্থানে, নানান উপভোগ্য ঘটনা-বহুল সমাবেশে, বিবিধ ছন্দ যথা—**লঘুত্রিপদী, ত্রিপদী, খর্বত্রিপদী, চৌপদী** প্রভৃতির বিন্যাসে সজ্জিত লেখিকার এই কাব্যটি বিগত শতাব্দীর সাহিত্য জগতের গর্ব। সম্পাদিত পুস্তকের তিনশত তেরো পৃষ্ঠার দীর্ঘ কাব্য-গ্রন্থের কাহিনীর বিবরণ গদ্য-পদ্য সমন্বয়ে উপস্থাপিত হয়েছে যার বিস্তৃত বর্ণনা এ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্ত কাহিনীর সাহায্যেই লেখিকার বক্তব্য বিষয়ে অবগত হওয়া সম্ভবপর হবে বলে মনে হয়। তবে বিষয়বস্তুতে যাবার পূর্বে উল্লেখ্য যে রচনাটিতে লেখিকা বেশ কয়েকটি উপ-শিরোনামের ব্যবহার করেছেন যা কাহিনীর কাব্যিক গতিধারা বজায় রেখে কাব্যকে পূর্ণতাদানে সক্ষম হয়েছে। এই উপশিরোনামগুলি যথাক্রমে,

গ্রন্থারম্ভ, রাজপুত্রের জন্ম, রাজপুত্রের মৃগয়াচ্ছলে সুপাত্রী অন্বেষণে গমন, রাজপুত্রের উদ্যান দর্শন, কুমারের রূপবাহু দর্শন, কুমার মনকে ভৎ'সনান্তে প্রিয়তমাকে স্মরণ করে রোদন করিতেছে, কুমারের রোদন শ্রবণে সঙ্গিগণের কুমারকে লইয়া দেশে আগমন ও মন্ত্রিগণের আরোগ্য করার চেষ্টা, রাজাকে

স্মরিয়া রানীর রোদন, পুত্র ক্রোড়ে লইয়া রানীর রোদন, রানী মন্ত্রীদিগের কথায় সুস্থির হইয়া পরামর্শপূর্বক এক দূতী আনাইলেন, কুমার চেতন হইয়া কন্যাকে না দেখিয়া দূতীকে সম্বোধন করিয়া সরোদনে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আক্ষেপ পূর্বক রোদন করিয়া দূতীর সম্মুখে কুমার কর্তৃক কুমারীরূপ বর্ণনা, ধাত্রীর নিকট বিরহ উক্তিতে কন্যার গান, কন্যার স্বীয় বৃত্তান্ত পুনঃ বর্ণনা, সাধুর আক্ষেপোক্তি, এইরূপে সাধুর আরাধনায় বিধি সদয় হইয়া একটি দুহিতা দান করিল, এতত্ত্ব শ্রবণে সাধু ব্যস্ত হইয়া ক্রন্দনকরতঃ প্রভুর মহিমা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল, সাধুর এভাব দর্শনে সকলে আচার্য্যকে ভৎ'সনাকরতঃ সাধুকে প্রবোধ দিতে লাগিল, নাবিকদিগকে স্ত্রীগণের ভাব বর্ণন, ফোরতাস নারী-জাতিকে নিন্দা করাতে গ্রন্থকারিণীর উক্তি, নিশাচরের কন্যার নিকটে গমন, মহারাজার আজ্ঞানুসারে সেনাদলের যুদ্ধবেশে রাজালয়ে প্রবেশ, মহারাজের নানাবিধ সাজ করিয়া রাক্ষস আলয়ে গমন, ভূপতি রণজয়ী হইয়া প্রভুকে স্তুতি করিতে লাগিল, কন্যাকে ও সখীকে বিনাশ করিয়া নৃপতির কিঞ্চিৎ আক্ষেপ-পূবক পুনঃ কলঙ্কভয়ে দ্বিতীয় কুমন্ত্রণা, রাণী ও দ্বিতীয় কন্যাকে নষ্ট করিবার বাসনায় রাজার স্বদেশে গমন, হরবানুর প্রতি রাজার গঞ্জনা বাক্য, হরবানুর কাতরোক্তিতে রাজা তাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া বহির্দেশে গমন করিলেন, এ সকল কথা শ্রবণান্তর সন্তুষ্ট হইয়া রাজার সঙ্গে সাধুর সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ, রূপবানুর গান (রাগিণী মূলতান), রূপবতীর আক্ষেপ, মালিনীর প্রতি দূতীর বিনয়, মালিনীর প্রত্যুক্তি, দূতীর প্রতি মালিনীর উক্তি, দূতীর স্বদেশে আসিয়া কুমারের সঙ্গে কথোপকথন, কুমারকে মালিনীর জিজ্ঞাসা, মালিনীর প্রতি কুমারের বিনয় বাক্য, এ সকল কথা শুনিয়া কুমারের মালিনীকে ভৎ'সনা, কুমারের প্রতি মালিনীর উক্তি, কুমারের পত্র লিখার শিরোনাম, পুনশ্চ, মালিনীর হস্তে পত্র দিয়া মালিনীর নিকট কহিতেছে, পত্র শিরোনাম, পত্র, অপর পত্রিকা, আহা বন্ধো হৃদে থাকি দেখা না দেও মোরে, বহু রোদনান্তে কন্যা ব্যাকুলিতা হইয়া পুনঃ মালিনীকে কহিতেছে, কুমারের বিরহ-দ্যোতক গান, কুমারীকে স্মরণ হইয়া গান করিতে করিতে কুমারের মোহ, গান, গান সমাপ্তের পর অন্তঃকরণে এইরূপ স্থির করিলেন, গান, যুবরাজ প্রভুকে স্মরিয়া ক্রন্দন করে, হজরত খোওয়াজ খেজের কুমারকে এছেম শিখান, কুমার রণজয়ীপূর্বক বন পার হইয়া ঝমঝম রাজার রাজ্যে প্রবেশের উদ্যোগ, কুমারের

রূপদর্শনে ও গুণের প্রশংসা শ্রবণে রাজা স্বীয় তনয়াকে পরিণয় দেওয়া মানসে কুমারকে স্ব আলয় রাখার উদ্যোগের বিবরণ, কারারুদ্ধ হইয়া প্রেয়সীর বিরহে কুমারের বিলাপ, অথ হজরত খোওয়াজ খেজেরের উপদেশ, কুমার বিবাহ করিতে সম্মত হওয়ার বিবরণ, বিবাহের সহেলা রচনা ও বিবাহ সমাপ্ত, কন্যার সঙ্গে কুমারের সহবাস না করার বিবরণ, অথ কুমারের প্রতি সখিগণের উক্তি, অথ নৃপনন্দনের উত্তর, অথ রূপবানুর খেদ ও মালিনীর প্রতি উক্তি, রূপবানুর পত্র লিখা, অথকন্যার পত্রসহ কুমারের অন্বেষণে দূতীর গমন, দূতীসঙ্গে প্রেয়সীর দেশে কুমারের গমন ও মায়াবী কন্যা কর্তৃক অপহরণ, উভয়ের কথোপকথন ও বিলাসের বিবরণ, গান, সখী সঙ্গে কুমারের অরণ্যে গমন ও যাদু হইতে মুক্তি পাওয়া, কুহক মন্ত্র বিস্মরণে কুমারের বিলাপ, প্রভুকে স্তুতিপূর্বক কুমারের গমন ও দৈত্যহস্তে পতন, যুবরাজের নিকট দৈত্যরাজের মানসিক বেদনা বর্ণন, সমসের রাজার রাজ্যে কুমারের গমন ও দানব কন্যার বিবরণ, গন্ধর্ব কুমারের অন্বেষণে কুমারের গমন এবং উদ্ধার ও বিবাহ ইত্যাদি, রায়হান রাজার পুত্রগণ সঙ্গে কুহক কারাগারে কুমারের সাক্ষাৎ ও তাহাদের পরস্পর কথোপকথন, কুমারকে দেখিয়া দানব রমণীগণের পতিনিন্দা, দানব নারীগণের রূপবর্ণনা, দানব রাজার নিকট কুমারের গমন ও যুদ্ধ, কয়েছর ভূপতির বৃত্তান্ত, কয়েছর রাজার সহিত শতভুজের যুদ্ধ, রায়হান রাজসহ শতভুজের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ও কয়েছর রাজার নিধন, কয়েছর রাজার রাণীসহ রায়হান রাজার স্বদেশে প্রত্যাগমন ও রাজকুমারীর সঙ্গে চিত্তহর কুমারের পরিণয় এবং রাজা ও রাণীর মৃত্যু, রাজকুমারগণের নিজালয় গমন ও প্রধান কুমারের বিবাহ, যুবরাজ জালালের গন্ধর্বতনয়ার উদ্যান উদ্দেশ্যে গমন, সংগ্রামবেশে সমসের রাজার রাজ্যে গমন ও গন্ধর্বকন্যার পরিণয়ের উদ্যোগ, দৈত্য কুমারের গন্ধর্বালয়ে গমন, গন্ধর্ব কুমারীর বিবাহ, বারমাসী, রাজকুমারের স্বদেশ গমন, মালিনীর সঙ্গে কুমারের কথোপকথন ও কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ, গান, উদ্যান-বর্ণনা ; কুমারীর সঙ্গে কথোপ-কথন ও কুমারের স্বদেশ গমন, মন্ত্রীগণ সঙ্গে কুমারের ছলবাক্য ও নিজালয় গমন, রাণীর পুত্রপ্রাপ্তে শুভবিবাহের উদ্যোগ, সহেলা, বিবাহ সমাপ্ত ও শয়নাগারে গমন, হুরবানুর বিলাপ, কুমারের স্বপ্ন বিবরণ।

উল্লিখিত উপ-শিরোনামগুলি থেকে কাব্যের কাহিনীর বিষয়বস্তু কিছুটা অবগত হওয়া যায়। সেই কারণে স্বল্প পরিসরের বিস্তারিত বিবরণের পরিবর্তে

সংক্ষিপ্ত কাহিনী উপস্থাপিত করা যেতে পারে। শিমাইল প্রদেশে জামাল নামে ভূপতির পুত্র জালাল, পিতা লোকান্তর হবার পর জালালের মাতা তাকে অধিক স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন, দেশ-বিদেশ থেকে নানান শাস্ত্রজ্ঞ ও বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী মহাবিজ্ঞগণের সাহায্যে যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি ধর্মশাস্ত্রাদি যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করান। কিন্তু জালালের বয়োবৃদ্ধি অর্থাৎ যৌবনাবস্থার প্রভাবে তার মন ছিল সর্বদাই চঞ্চল, অথচ যোগ্য পাত্রীর অভাবে তার বিবাহ হচ্ছে না। তাই যোগ্যপাত্রী অন্বেষণের কারণে, শিকারের ছলে মাতার কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে ঘোটকারোহণপূর্বক স্থানে স্থানে সর্বগুণে-গুণান্বিতা রমণী অন্বেষণ করতে থাকে।

একদিন, একটি মনোহর উপবন দেখতে পেয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করে ভ্রমণ করতে করতে এক যুবতীকে দেখে সে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। কিন্তু যুবতীর সঙ্গে তার মিলনে বাধা ছিল,

"কেননা, ঐ মনোমহিনী রূপবতীর রূপসাগরে এক কৌনপকান্ত মগ্ন হইয়া তাহাকে এইরূপ অবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার গৃহবাসী নারীগণ ব্যতীত যেন অন্য কোন প্রাণী তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে।"৬৩

চঞ্চল জালালের ধৈর্য্য বাধ মানে না, তাই সে ঐ রূপবতীকে পাবার জন্য স্বদেশ ত্যাগ করে, বিনা অশ্বে পদব্রজে পর্যটন করতে করতে ক্ষণে মনুষ্য রাজ্য ক্ষণে অঘোর কানন ইত্যাদি নানা দুর্গম পথ দিয়ে উন্মাদের মত রাক্ষসের আলয় অন্বেষণে ঘুরতে লাগল। কিছুদিন পর, একদিন ঘুরতে ঘুরতে সে প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে গিয়ে পড়ল। ঐ প্রান্তরের মধ্যস্থলে এক অপরূপ উদ্যান দেখে নির্ভয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে উড্ডীয়মান কয়েকটি পাখী ছাড়া আর কোনো জীব না দেখে সে উদ্যানে একাকী ভ্রমণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ভূমিশায়ী হোলো। এ অবস্থায় এক অপ্সরী পরী তাকে অপহরণ করে। পরীকন্যার তাকে খুবই ভাল লাগল, সে কথা পরীমহিষী জানতে পেরে জালালকে পরীকন্যার সঙ্গে বিহার করতে বলায় সে তা অস্বীকার করলে পরীমহিষী রেগে গিয়ে তাকে শাস্তি দেবার জন্য সমুদ্রে ফেলে দিল। যুবরাজ জালাল এমতাবস্থায় প্রভুকে স্মরণ করে ক্রন্দন করতে থাকে, অবশেষে প্রভু হজরতের কৃপায় রক্ষা পায়। লেখিকা তাঁর কাব্যে নানান ছন্দের ব্যবহার করে কাব্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছেন। দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে,

স্মরিলে প্রভুর নাম, পুরে সব মনস্কাম,
সত্য সত্য বলিছে ফয়জন।[৬৪]

হজরত খোওয়াজ খেজের কৃপায় যুবরাজ তিনটি এছেম শিখল, যার সাহায্যে পরবর্তী সময়ে নানান বিপদ থেকে সে মুক্তি পায় এবং নানান কাজও করতে সক্ষম হয়। কাব্যের ভাষায়—

তিনটি এছেম শিখাইলেন সত্বরে॥
.. ..
প্রথম এছেম গুণ কহি বিস্তারিয়ে।
পঠয়ে এছেম যদি নয়ন মুদিয়ে॥
যথা ইচ্ছা হয় তথা পারয়ে যাইতে।
... ...
দ্বিতীয় এছেম গুণ শুন দিয়া মন।
ইহাকে পঠিলে হবে বিহঙ্গ নিধন॥
দ্বারহীন গৃহ যদি থাকয়ে তাহাতে।
ইছিম পঠিলে দ্বার হবে আচম্বিতে॥
তৃতীয় ইছিম গুণ করহ শ্রবণ।
শত্রু সঙ্গে করিবারে হয়ে যদি রণ॥
তৃণ করে নিয়ে যদি ইছিম পঠয়ে।
যে অস্ত্র হইতে ইচ্ছা করেতে মিলয়ে॥[৬৫]

প্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে যুবরাজ বণজয়ী পূর্বক বন-জঙ্গল পার হয়ে ঝমঝম রাজার রাজ্যে প্রবেশ করলে তার রূপ দর্শনে ও গুণের প্রশংসা শুনে রাজা স্বীয় তনয়ার সঙ্গে বিবাহ দেবার মানসে জালালকে বেশ যত্ন করতে থাকলেন। রাজার মনবাসনা প্রকাশ পেলে এবং জালাল রূপবানু ছাড়া অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করবে না জানালে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

রাজআজ্ঞামাত্র নিয়ে ভূপতি কুমারে।
বক্ষেতে পাষাণ দিয়ে রাখে কারাগারে॥

এই কারগারে বন্দী হয়েও হজরত খোয়াজ খেজেরের উপদেশ বলে যুবরাজ মুক্তি পেল—প্রভুর আজ্ঞামত কারাগার থেকে মুক্ত হবার জন্য জালাল রাজকন্যা

হুরবানুকে বিবাহ করলো, কিন্তু কৌশলপূর্বক হুরবানুর সঙ্গে সহবাস করল না। এবার স্বরাজ্যে আসবার ছলনায় সেখান থেকে মুক্ত হয়ে স্বকার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রওনা হোলো। হঠাৎ পথিমধ্যে একস্থানে শুক্লবর্ণ প্রস্তর দেখে সেটিতে পদনিক্ষেপ করলে অমনি ভূগর্ভ থেকে মহাকলরব সমুত্থিত হোলো। যুবরাজ ভীত ও হতবুদ্ধি হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। এমন সময় ধরণী বিদীর্ণ করে মৃত্তিকার অভ্যন্তর থেকে দু'টি কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার দৈত্য উঠে তার সামনে উপস্থিত হল এবং তাকে বাহুর মধ্যে ধারণ করে দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করল। দৈত্যরাজ যুবরাজকে দেখে চিনতে পেরে তাকে তার মানসিক বেদনার কথা বর্ণনা করে তার সাহায্য চাইল—

"আমি পুত্রশোকে শোকাতুর হইয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, যদি সেই পুত্র প্রদান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিতে পার, তবে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে"[৬৭]

জালাল সব ঘটনা শুনে দৈত্যরাজের মনবেদনা দূর করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে প্রতিশ্রুতি দিল। এবং তারই সহায়তায় একজন দৈত্যকে সঙ্গে নিয়ে গন্ধর্বতনয়ার উদ্যানের কূপ থেকে মহৌষধি জল নিয়ে এসে দৈত্যরাজের পুত্রকে সেবন করিয়ে তার মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করল। এই অমূল্য দ্রব্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জালালকে নানান প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে একাধিকবার, কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে তৎসঙ্গে গতিপথে বিপদগ্রস্থ একাধিক জনের বিপদমুক্তিতে সাহায্য করে সে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে। দৈত্যরাজ্যে কিছুদিন কাটিয়ে, জালাল স্বরাজ্যে ফিরে এসে মায়ের অনুমতি নিয়ে সাধুকন্যা রূপবানুকে বিবাহ করে।

একদিন স্বপ্নে হুরবানুকে বিলাপ করতে দেখে জালালের মনে খেদ হোলো যে, তার জন্যই হুরবানু দুঃখ পাচ্ছে। অস্থির মন নিয়ে অশান্ত হয়ে পড়লে রূপবানু বুঝতে পেরে কারণ জানতে চাইলে জালাল তাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত খুলে বলল। জালাল রূপবানুর পরামর্শক্রমে হুরবানুকে স্বরাজ্যে নিয়ে এলো। জালালের মাতা মহিষীও হুরবানুকে গ্রহণ করলেন এবং রূপবানুর সঙ্গে মিলন করালেন,

…হুরবানু নিয়ে রাণী রূপবানু সনে।
মিলন করিয়া দিল প্রবোধ বচনে॥

দোহে সম রূপবতী সমবুদ্ধিমতী।
বিভুকৃত ভেবে দোহে জন্মিল সম্প্রীতি॥
উভয়ে সপত্নী নানা গুণে গুণবতী।
আনন্দে বিহারে দোহে পতির সঙ্গতি॥
দুই জন নিয়ে সম দৃষ্টিতে রাজন।
নিত্য সকৌতুকে কাল করয়ে যাপন॥
সিংহাসনে বসি সদা হরিষ অন্তরে।
বিধি বিধানেতে ভূপ রাজকার্য্য করে॥
বিচার কৌশলে দূর হৈল অবিচার।
প্রজার জন্মিল ভক্তি সুখ্যাতি প্রচার॥
জয় জয় শব্দ হৈল্যে ভুবন ভিতর।
জালাল রাজার জয় ঘোষে নিরন্তর॥[৬৮]

এ-খানেই কাব্যের কাহিনীর সমাপ্তি। কাব্যে বিবিধ ছন্দের ব্যবহার করেছেন কবি। এর মধ্যে কয়েকটি ছন্দের নমুনা উপস্থাপিত হোলো। সাধু ব্যস্ত হয়ে ক্রন্দনকরতঃ প্রভুর মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার করেন—

তুমি প্রভু নিরঞ্জন, সৃজিয়াছ ত্রিভুবন,
তব অগোচর নহে আশ।
তোমার মহিম অতি, দরিদ্র হয় নৃপতি,
মানী জনার মান্য হয়ে নাশ॥[৬৯]

কন্যাকে ও সখীকে বিনাশ করে নৃপতির কিঞ্চিৎ আক্ষেপপূর্বক পুনঃকলঙ্কভয়ে দ্বিতীয় কুমন্ত্রণা এই উপশিরোনামে পয়ার ছন্দের প্রয়োগ হয়েছে—

স্তব্ধ হয়ে অধোমুখে রহে বহুক্ষণ।
আর কুমন্ত্রণা মনে জন্মিল তখন॥
দ্বিতীয় দুহিতা তার নাম হরবানু।
ইন্দ্রশোভা বিমোহিত করে যার তনু॥[৭০]

খর্বত্রিপদী ছন্দ প্রয়োগে, রাণী ও দ্বিতীয় কন্যাকে নষ্ট করিবার বাসনায় রাজার স্বদেশে গমন, উপ-শিরোনামে কবি লিখেছেন—

রক্ত দুনয়ন, রাগেতে রাঙন,
সৈন্য সেনাগণে কয়।
চল শীঘ্র চল, থেকে কিবা ফল,
আর বিলম্ব না সয় ॥[৭১]

হরবাসুর প্রতি রাজার গঞ্জনাবাক্য উপশিরোনামে একাবলি ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে—

শুন পিতঃ মম এ নিবেদন।
অবিচারে কেন লবে জীবন ॥
জননীর এক দুহিতা ভিন্ন।
মা বলিবে হেন নাহিক অন্য ॥[৭২]

পুনশ্চ উপশিরোনামে লঘুত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে—

পুনশ্চ লিখিয়া, বলি বিস্তারিয়া,
শ্রবণ করলো ধনি।
হরি-সুত-বাণ, ঘাতে মম প্রাণ
যেন মণি—হারা ফণী ॥[৭৩]

বারমাসী বর্ণনায় লঘুত্রিপদীর ব্যবহার করা হয়েছে—

বৈশাখ আগত, পুষ্প বিকশিত
সুগন্ধে আমোদ অতি।
... ...
আষাঢ়াগমনে, মেঘের গর্জনে,
চমকি উঠয়ে হৃদি।[৭৪]

এভাবে একাধিকবার উল্লিখিত ছন্দের ব্যবহার করে কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'রূপজালাল'-এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন যা তৎকালীন সাহিত্য জগতে সমাদৃত হয়। এছাড়া, কিছু উপদেশমূলক শ্লোকের ব্যবহার করেছেন এ কাব্যে, যা কাব্য মধ্যস্থিত গদ্যাংশের পূর্ণতা এনেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যুবরাজ জালাল যখন পথমধ্যে দানব তনয়ার দুঃখে দুঃখী হয়ে তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল তার এই সহানুভূতির প্রশংসা করে কবি প্রসঙ্গসাদৃশ্য রেখে চরিত্রের মুখ থেকে বলিয়ে নিয়েছেন,

বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্বজ্জন পরিশ্রমং।
নাহি বন্ধ্যা বিজনীয়াৎ গুর্বীং প্রসববেদনাং।

যেমন বিদ্বান ব্যতীত বিদ্যাপোর্জ্জনের পরিশ্রম অন্যে জানিতে পারেন না, এবং বন্ধ্যা নারী প্রসবের বেদনা জানে না, তদ্রূপ যিনি কখনও যে অবস্থায় পতিত হন নাই, তিনি তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন না।৭৫

সমস্ত কাব্যগ্রন্থখানিই এরূপ নানান ছন্দে, নানান অলংকারপূর্ণ শব্দে, ঘাত প্রতিঘাতের ঘটনা বর্ণনায় সমৃদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর এই মহিলা কবি পর্দাসীন হলেও বাস্তব জীবনে যাঁকে জমিদারী দেখাশোনার মত দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে কাটাতে হয়েছে বেশ খানিকটা সময়, এমত কবির লেখনীতে এ ধরনের উচ্চমানের কাব্যরচনা তাঁর বিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয় যে বহন করে, গ্রন্থখানি হাতে না এলে বোধহয় তা বোঝা যেত না। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ একশত বছরেরও আরো বেশী সময় পূর্বেকার। কাব্যের কাহিনীর ঘটনা বিন্যাসে যদিও দৈত্য-দানব, রাজা, কিছু অলৌকিক বস্তু বা শক্তিকে আনা হয়েছে কাহিনীর গতি বজায় রাখবার জন্য যা বাস্তবতা থেকে কিছুটা দূরেই। কিন্তু রূপকথার কাব্যের মর্যাদা লাভের পাশাপাশি সার্থক প্রেমের, ধর্ম রক্ষার প্রচেষ্টা, মানবের বুদ্ধিমত্তারও দৈব্যশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে কর্মে সাফল্যলাভ করা প্রভৃতির কাছে দানবের দৈহিক শক্তি ম্লান হয়ে গিয়ে মানবের অস্তিত্বকে বাড়িয়ে দেওয়া, ইত্যাদি কাব্যের বলিষ্ঠ রূপ দিতে সক্ষম হয়ে কাব্যটিকে সার্থক কাব্যগ্রন্থ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই কারণে 'রূপজালাল' কাব্যগ্রন্থটি সার্থক এবং বহুজন সমাদৃত।

হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বাঙ্গলা গদ্যের প্রস্তুতি ও পূর্ণবিকাশের যুগ। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীদের পরে, প্রথম যুগের সাংবাদিকগণের এবং অনুবাদকগণের পরে বাঙ্গলা গদ্যজগতে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। এঁরা ছিলেন পথিকৃৎ। এঁদের নির্দিষ্ট পথে আবির্ভূত হলেন "আলালের ঘরে দুলাল" রচয়িতা প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), "কুলিন কুলসর্বস্ব" নাটকের রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬), "ভদ্রার্জুন" নাটকের রচয়িতা তারাচরণ শিকদার, "হুতোম প্যাঁচার" স্বনামধন্য লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)। পর্যায়ক্রমে এলেন একদিকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৮৪) এবং অন্যদিকে মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। "আলালের ঘরে দুলাল" প্রকাশিত

হবার ছয় বৎসর পূর্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যে যে প্রথম উপন্যাস-খানি প্রকাশিত হয় তাঁর রচনাকার ছিলেন একজন বিদেশী মহিলা, নাম শ্রীমতী হানা ক্যাথেরীন মলেন্স। তাঁর রচিত উপন্যাস খানির নাম "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ"—১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কলকাতার খৃষ্টান ট্র্যাকট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

শ্রীমতী ম্যালেন্স ছিলেন ইংরেজ মহিলা, কলকাতায় জন্মগ্রহণ ও দেহত্যাগ করেন (১৮২৬-১৮৬১)। তিনি খৃষ্টান মিশনারী সমাজের মহিলা, তাঁর কর্মক্ষেত্র মুখ্যতঃ সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তিনি গতানুগতিক খৃষ্টান ধর্মমতে আস্থাশীল ছিলেন এবং এ ধর্ম প্রচারের কাজেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে ধর্মপ্রচারের কথাই গুরুত্ব পেয়েছে।

মূল গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, পরবর্তী সময়ে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নতুন সংস্করণঃ বৈশাখে, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থটি আমরা সংগ্রহ করে উক্ত উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হই। উপন্যাসটি সামাজিক। এর ভাষা সহজ, সরল এবং সুখপাঠ্য। উপন্যাস প্রসঙ্গে,

"...এভাবে বাঙ্গলা দেশের বিশেষ কোন অংশে একটি নবগঠিত বিশিষ্ট সমাজের জীবন ও চিন্তা অবলম্বন করিয়া বই লিখিবার প্রয়াস দেখা যায় নাই। বইখানির ভাষা ভালই বলিতে হইবে। সাধু ভাষার ছাঁচে ঢালা ইহার আধার একশ' বছর পূর্বেকার বাঙ্গলা। (যেমন, কলিকাতার বাঙ্গলায় 'আসিল' 'অর্থে' 'এল'—লেখিকা সাধুভাষানুমোদিত রূপ দিয়াছেন 'আইল',—তিনি কোথাও 'আসিল' রূপ ব্যবহার করেন নাই। কারণ ইহা কলিকাতার কথ্য ভাষায় অজ্ঞাত ছিল।..."[৭৬]

গ্রন্থখানি ১৩৬ পৃষ্ঠার দশটি অধ্যায়ে সুমুদ্রিত, নারীগণের শিক্ষার্থেই বিরচিত। লেখিকার এ উপন্যাসে পুরুষ অপেক্ষা নারীচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রধান নারী চরিত্রগুলি—ফুলমণি, করুণা, প্যারী, সুন্দরী এবং রাণী। এদের প্রত্যেককে কেন্দ্র করে এক একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তার যোগসূত্র স্থাপন করেছে নারী চরিত্র ফুলমণি এবং লেখিকা স্বয়ং। লেখিকা নিজের জবানীতে কাহিনীর উপস্থাপনা করেছেন। সেইকারণে উপন্যাসের সব ঘটনা ও চরিত্র তাঁর দৃষ্টি দিয়েই দেখা হবে। কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এর সত্যতা বিচার্য।

ফুলমণি আদর্শ খৃষ্টান রমণী হিসাবে প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর নেয়, তাদের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করে। লেখিকার পরিচয় উপন্যাসে—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্নী, স্বামীর সঙ্গে যেখানে তিনি বাস করেন সেখানকার ইংরেজদের মধ্যে ধর্মভীরু লোক বড় একটা কেউ নেই। স্থানীয় পাদ্রীর নির্দেশেই তিনি তাঁর বাসস্থান থেকে কিছুদূরে বাঙ্গালী খৃষ্টানদের গ্রামে সৎলোকের সন্ধানে, এবং তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যান।

গ্রামে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন খৃষ্টান অধিবাসীদের বাড়িগুলি অপরিচ্ছন্ন, এতে তাঁর মন বড় খারাপ হয়ে গেল। কিছুটা দূরে একটি পরিচ্ছন্ন বাড়ি দেখতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। বাড়িটির উঠোনে শিকল দিয়ে বাঁধা একটি টিয়াপাখীকে একদল কাক অত্যন্ত জ্বালাতন করছিল দেখে তিনি পাখীটি রক্ষার উদ্দেশ্যেই তার শিকল খুলে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে দেখলেন,

"আমার আগমনের শব্দ শুনিয়া একজন অর্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক বাহিরে আইল। তাহার মাথার চুল সুন্দররূপে বাঁধা ও তাহার পরিধেয় শাড়ি অতিশয় পরিস্কার ছিল।"[৭৭]

লেখিকা পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন—

"আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওগো এটা কি তোমার পাখি? কাক সকল ইহাকে বড় দুঃখ দিতেছিল, এজন্য আমি ইহাকে বাটীর ভিতর আনিয়াছি। স্ত্রীলোক উত্তর করিল, বিবি সাহেব আপনার বড় অনুগ্রহ। এ আমার পাখী বটে, আমার পুত্র ভুলে বাহিরে ফেলিয়া গিয়াছে। ইহা বলিয়া সে পক্ষীর সকল এলোমেলো পালকগুলিতে হাত বুলাইয়া সমান করিল, এবং বোধ হইল যে পক্ষী তাহার কর্ত্রীকে ভালরূপে চিনিত, কারণ সে তাহাকে না কামড়াইয়া তাহার বস্ত্রের মধ্যে লুকাইতে চেষ্টা করিল।"[৭৮]

এই স্ত্রীলোকটিই ফুলমণি, সে মেমসাহেবকে অভ্যর্থনা করে বসবার আসন এনে দিল। ফুলমণির বাড়িটি ছবির মতো পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন লেখিকা।

"তাহার চতুর্দিকে বেড়া নূতন দরমা ও নূতন বাঁশ দিয়া ছিল, এবং তদুপরি একটি সুন্দর ঝিঙা লতা উঠিয়াছিল। উঠানের এক পার্শ্বে গোরুর একখানি ঘর দেখা গেল, তাহার মধ্যে একটি গাভী ও বৎস ধীরে ধীরে জাওনা খাইতেছে। গোশালায় ছাতের উপরে অনেক পাকা লাউ দেখিলাম।...

দাবার সম্মুখে ঘরের ছাঁচির নীচে দশ বারটি চারাগাছ গাম্লাতে সাজান দেখিলাম, তাহার মধ্যে তিন চারিটি ঔষধের গাছ ছিল, অন্য সকল গ্যাঁদা তুলসী গন্ধরাজ ইত্যাদি। একটি অতি সুন্দর চীন গোলাপের চারাও ছিল, তাহাতে কুঁড়ি ও ফুল ধরিয়াছিল··· ।"৭৯

ফুলমণির স্বামী প্রেমচাঁদ সাত টাকা বেতনে স্থানীয় পাত্রী সাহেবের কাছে হরকরার কাজ করে। ফুলমণি দুধ বিক্রি এবং সেলাইয়ের কাজ করে আরো কিছু উপার্জন করে। এতেই তাদের সংসার চলে যায়। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মিতব্যয়ী, ধর্মভীরু এবং পরোপকারী। প্রতিবেশীর আপদ বিপদে সর্বদা এগিয়ে আসে। তাদের ছেলে মেয়ে সাধু ও সত্যবতী মিশনারী স্কুলে পড়ে। সাধু ও সত্যবতীর শিশুসুলভ কৌতূহল ও ঔৎসুক্য এবং তাদের মুখে বাইবেলের কথা লেখিকার ভাল লেগেছে। ফুলমণির বড় মেয়ে সুন্দরী স্কুলের পড়া শেষ করে শহরে আয়ার কাজ করে। প্রেমচাঁদ অনেকদিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে থাকবার ফলে ঔষধপত্রের খরচ চালাতে গিয়ে ফুলমণির কিছু দেনা হয়; সেই কারণে এই দেনা শোধ করবার জন্য সুন্দরী অর্থ উপার্জন করতে শহরে গিয়েছে। যদিও প্রতিবেশী মধু সুন্দরীকে বিবাহ করে দেনা শোধ করবার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু মধু মাতাল বলে ফুলমণি এ-প্রস্তাবে রাজী হয়নি। এ'তে মধুর মা সুন্দরীর নামে দুর্নাম রটিয়ে বলতে লাগল, চরিত্রের স্খলন ঢাকবার জন্যই ওকে শহরে পাঠানো হয়েছে।

কয়েক মাস পরে ছুটি নিয়ে বাড়ি এলে সুন্দরীর সঙ্গে লেখিকার দেখা হোলো। সুন্দরীর জন্য লেখিকা একজন চরিত্রবান, শিক্ষিত, উপার্জনশীল বর স্থির করলেও সুন্দরী এ বিয়েতে সম্মত হোলো না; কারণ মনে মনে সে অন্য একজনকে বরণ করেছে।

"···সুন্দরী অধোদৃষ্টি করিয়া কহিল, তাহার কারণ এই আমি অন্য একজনকে প্রেম করিতেছি। আমার মেম তাঁহাকে চিনেন, সে যুবা তাঁহার বৃদ্ধ মালির পুত্র···"৮০

এখানে লেখিকার লেখনী নারীকে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার দৃঢ়তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এবং সুন্দরীর উত্তরকে সমর্থন করেছেন খুশী মনেই। সুন্দরীর পর্দানশীন না থেকে বাইরে বেরিয়ে কাজ করাটা সমাজের চোখে সমালোচনার বিষয় হ'লেও সুন্দরীর সংস্কার মুক্ত হয়ে জনসমক্ষে বেরিয়ে

আসাকে লেখিকা সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—

"আমি কহিলাম, না ফুলমণি, বাঙালী স্ত্রীলোকেরা যে একেবারে ইংরাজ বিবির ন্যায় হয় আমার তো এমত বাঞ্ছা নাই ; কেননা তাহারা পুরুষদের সহিত হিতজনক আলাপ করিতে চাহিলে একপ্রকার লজ্জার আবশ্যক আছে, কিন্তু সেই লজ্জা ঘোমটা দ্বারা নয়, বরং মনের শুদ্ধতা দ্বারা প্রকাশ পায়। যে স্ত্রীর এমত লজ্জা থাকে, সে কখন কোন পুরুষের সাক্ষাতে অপবিত্র বাক্য ও মন্দ কৌতুকের কথা কহিবে না। এই প্রকারে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সহিত স্বচ্ছন্দে আলাপ করিয়া নির্দোষী থাকিতে পারে।...... ।"[৮১]

ফুলমণি যেমন আদর্শ কর্ত্রী, সুন্দরী তেমনি আদর্শ খৃষ্টান কুমারী। ছোট ভাই-বোনকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করে, তাই সংসারের ভার লাঘব করবার জন্য শহরে চাকরি করতে যেতে দ্বিধা করেনি। আর সবচেয়ে সুন্দর তার প্রেমের দ্বিধাহীন স্বীকৃতি। লেখিকার লেখনী উনবিংশ শতকে এ-রকম একটি আদর্শ নারী চরিত্র আঁকতে সক্ষম হয়েছে।

রাণী আর একটি পরিবারের মেয়ে। রাণী ও সুন্দরী একসঙ্গেই স্কুলে পড়ত। মধু রাণীকে বিবাহ করেছে। কিন্তু মাতাল ও লম্পট মধুকে বিবাহ করে রাণীর লাঞ্ছনার শেষ নেই। বিবাহের কিছুদিন পরে মধুর কলেরায় মৃত্যু হয়। রাণী তখন অন্তঃস্বত্ত্বা। মধুর মৃত্যুর দু'দিন পরে রাণীর খোঁজ করতে গিয়ে লেখিকা দেখলেন সে প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে। তার শাশুড়ী অর্থাৎ মধুর মায়ের লেখিকাকে দেখে যে অভিব্যক্তি, সঙ্গে কিছু প্রতিবেশীর বক্তব্য লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে।

"...তাহার শাশুড়ী আমাকে দেখিয়া বলিল, বউ একদিন একরাত্রি এইরূপ অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতেছে, তথাপি সে খালাস হয় এমত কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না।

রাণীর স্বামীর মৃত্যুর সময়ে যেরূপ গোলমাল হইয়াছিল, এখনও স্ত্রীলোকেরা সেইরূপ গোলমাল পুনর্বার করিতেছে ; বিশেষতঃ দশবার জন মেয়্যা আসিয়া রাণীর চারিদিগে দাঁড়াইতেছিল। যদি একজন কথা কহে, তবে অন্যজন আর একটা কথা কহে, একজন তাহাকে বসিয়া থাকিতে কহে, আর একজন বলে, না না, তুমি হাঁটিয়া বেড়াও; এবং তৃতীয় জন কোন অজ্ঞান বুড়ির ঔষধ আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দেয়। এই সকল বৃথা উপায় দ্বারা ছেল্যা শীঘ্র না জন্মিয়া

বরং অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, তাহাতে রাণীর যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি হইল। ……রাণী দুই তিনমাস পূর্বে আপন শাশুড়ীর সাক্ষাতে এমত কথা বলিয়াছিল, যে গত রাত্রিতে একটা পেচা কিম্বা ভূতল পক্ষী ডাকিতে ডাকিতে আমার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। এই কথা এখন তাহার শাশুড়ীর মনে পড়াতে সে বলিতে লাগিল যদি এমত হয়, তবে সে পক্ষী ফিরিয়া না আইলে পোয়াতি প্রসব হইতে পারিবে না। এ কথাতে অন্য সকল স্ত্রীলোকেরা স্বীকার করিল, কেবল একজন বুড়ি ইহাতে সম্মতা না হইয়া বলিল, আমার বোধহয় পেচাতে কোন ক্ষতি হয় না, কেননা একবার আমি পাঁচ সাতজন স্ত্রীলোকের সহিত উঠানে বসিয়াছিলাম, এমত সময়ে একটা পেচা আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল; তখন আমার ছোট ভগিনীর প্রায় নয়মাস গর্ভ ছিল; এই জন্যে তাহার নিমিত্তে আমরা সকলে বড় ভাবিতা হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন ক্ষতি না হইয়া অল্পদিন পরে সে এক ঘণ্টা মাত্র দুঃখ পাইয়া এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল।

ইহা শুনিয়া আর একজন স্ত্রীলোক বলিল, ও কথা আমি কখনও বিশ্বাস করিব না। সকল লোকেরা জানে যে ঐ পক্ষী ফিরিয়া না আইলে পোয়াতি প্রসব হয় না; হয়তো সে ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তোমরা তাহাতে মনোযোগ করিলা না।

প্রথম বক্তা উত্তর করিল, না গো না, কখন ফিরিয়া আইসে নাই, আমাদের কি চক্ষুঃ ছিল না? এবং দিনের বেলা দুই প্রহরের সময় ছেল্যা হইল, তখন কি পেচা থাকে?…মধুর মাতা বার বার বলিতেছিল, হায়; আমার পুত্রের ছেল্যাকে আমি কখন কোলে করিব? কিন্তু তাহার বউর কি গতি হয়, তাহাতে সে কিছুমাত্র ভাবিতা হইল না; শেষে প্রতিবাসীদের কথা দ্বারা সে বোধ করিল, যদ্যপি আমি বউর তত্ত্ব না করি তবে ছেল্যা শুদ্ধ নষ্ট হইবে।"[৮২]

লেখিকার পরিচর্যার ফলে রাণী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিল। এ ঘটনার পর রাণীকে বেশ কিছুদিন উপন্যাসের পাতায় উপস্থিত থাকতে দেখা যায় না। রাণীর দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার সংবাদ জানা গেল কাহিনী উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে।

উপন্যাসের পরবর্তী নারী চরিত্র প্যারী। স্বামী সন্তানবতী এই হিন্দু রমণী

এক সাহেবের বাড়ী আয়ার চাকরি করতে এসে খৃষ্টানুরক্ত হয়ে পড়ে এবং স্বামী সন্তান ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এখন সে বৃদ্ধা, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ফুলমণিদের গ্রামে এসে বাস করে। বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গ জীবন তার অতীতকে মনে করিয়ে দেয়, ছেলে-মেয়েরা তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নেবার জন্য যে আবেদন জানিয়েছিল এখনও তার প্রতিধ্বনি বৃদ্ধার কানে বাজে। এখানেই প্যারীর মৃত্যু হয়।

উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য নারীচরিত্র করুণা। লেখিকা এই চরিত্রটিকে ফুলমণির ন্যায় ধার্মিক করে তৈরী করেন নি। করুণার কথা বলতে গিয়ে লেখিকা তাঁর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়েছেন, জেগে উঠেছে তাঁর শিল্পীসত্তা। করুণা ফুলমণির প্রতিচরিত্র। ফুলমণি আদর্শ খৃষ্টান রমণী। করুণা খৃষ্টান হয়েও সেই ধর্মের নীতি অনুসারে জীবন যাপন করে না। সে অলস, কর্তব্যবিমুখ, কলহপ্রিয় এবং মিথ্যাবাদী। তথাপি লেখিকার সহানুভূতি করুণার উপর। লেখিকার করুণার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ফুলমণির বাড়িতে। লেখিকা ফুলমণির বাড়ি বসে কথা বলছেন এমন সময় সশব্দে কপাট খুলে করুণা প্রবেশ করল।

"তাহার কাপড় বড় ময়লা, এবং চুল বাঁধা না থাকাতে মস্তকের চতুর্দ্দিকে পড়িয়াছিল। সে আমার মুখপানে কিঞ্চিৎকাল অসভ্যরূপে তাকাইয়া ফুলমণি প্রতি ফুস্‌ফাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে? ফুলমণি বলিল, ইনি নতুন মেজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবি।"[৮৩]

মাত্র এ কয়টি লাইনে লেখিকা করুণার স্বভাব বলে দিয়েছেন—সশব্দে কপাট খোলা, অসংযত বেশবাস, অসভ্যরূপে তাকিয়ে থাকা। করুণার আসবার কারণ বর্ণনা করে লেখিকা তার চরিত্রের আরো কিছু আক্রমোচন করবার প্রয়াসী হয়েছেন—

"চড়চড়ি রন্ধন করিবার নিমিত্তে কিছু তৈল তোমার নিকটে চাহিতে আসিয়াছি, ঘরে একটিও পয়সা নাই, আমার পুত্র এখনি কতকগুলিন চুনা মাছ ধরিয়া আনিয়া দিল, সেইগুলিন এই বেলার মত রন্ধন করিব। আমার স্বামিকে তো জান; সে আমাকে কিছু খরচ দেয় না, তথাপি খাইতে না পাইলে সমস্ত রাত্রি তিরস্কার করিতে থাকে।"[৮৪]

করুণা অলস, তাই কারো কাছে হাত পাতাতে তার মোটেই লজ্জা নেই।

লেখিকা ফুলমণির পুত্র ও কন্যাকে একটি করে সিকি দেবার সংবাদ কানে এলে পরদিন সকালে মেমসাহেবের বাংলোয় গিয়ে উপস্থিত হোলো করুণা, যদি কিছু পাওয়া যায়। লেখিকার সহানুভূতি উৎপাদনের জন্য সে বলল, সে বড় দুঃখী, তাই সাহায্যপ্রার্থী। স্বামী লম্পট ও মাতাল, ছুতার মিস্ত্রীর কর্মে নিপুণ, কাজ করলে স্বচ্ছন্দে দৈনিক চার আনা উপার্জন করতে পারে। তথাপি কাজ করবে না তাই করুণার এত দুর্দশা। খাবার পয়সা নেই, পরার কাপড় নেই। লেখিকা করুণার অলস প্রকৃতির কথা আগেই শুনেছেন—সে গির্জায় পর্যন্ত যায় না একথাও লেখিকার অজানা নয়। ধোপার কাছে একটি শাড়ী আছে। করুণা, পয়সার অভাবে আনতে পারছে না, পরনে তার একটি ময়লা শাড়ী, সেই কারণে লেখিকা তাঁকে একটি পয়সা দিয়ে ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় এনে গির্জায় যেতে বললেন। করুণার ভিক্ষা প্রবৃত্তি বেড়ে গেল, তাই—

সে পয়সাটি হাতে করিয়া বলিতে লাগিল, "ও বিবি সাহেব, দয়া করিয়া আমাকে আর কিছু দেও। ঘরেতে আমার একটি সন্তান বড় পীড়িত আছে, এবং তাহাকে কোন খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দি, এমত আমার কিছু সঙ্গতি নাই।"[৮৫]

করুণার চরিত্রের কথা বিবেচনা করেই লেখিকা তাকে নগদ পয়সা না দিয়ে রুটি, মিছরী ও সাগু দিলেন। পরদিন যখন তিনি করুণার বাড়ি এলেন তার অবস্থা দেখতে, দেখলেন, রান্নাঘরের চাল ভেঙ্গে পড়ায় করুণা বড়ঘরের দাওয়ায় বসে রান্না করছে। উঠান অপরিষ্কার, সমগ্র বাড়ি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। তাঁকে দেখে করুণার নেড়ি কুকুরটা চিৎকার শুরু করল। মেমসাহেব চেয়ে দেখলেন করুণা ময়লা শাড়ী পরেই আছে, ধোপা বাড়ী থেকে কাপড় না এনে সে পয়সায় তামাক খেয়েছে। এর কারণ জানতে চাইলে, করুণা বলল,

"কাপড়ের দুই একদিন বিলম্ব হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমরা তামাক না খাইলে মারা পড়ি। ...আমরা দুঃখি লোক, পেটে খাইতে পাই না; তাহাতে ধর্মকর্ম কি প্রকারে করিব?"[৮৬]

এমনকি করুণার যে মিথ্যা কথা বলবার অভ্যাস আছে তা বোঝা গেল, যখন লেখিকা তার পীড়িত ছেলেকে দেখতে চাইল। তখন করুণা বলল, আজ একটু ভালো আছে, খেলতে গেছে। কিন্তু এ বিষয়ে মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল তার ছেলে নবীনের কথায়। নবীনের কাছেই শোনা গেল করুণা রুটি মিছরী দু'পয়সায় এক প্রতিবেশীকে বিক্রি করে সেই পয়সা দিয়ে তামাক কিনে

এনেছে। করুণা এত অলস যে মেমসাহেব তাকে উপার্জনের জন্য পরামর্শ দিলে তা তার মোটেই মনঃপুত হোলো না।

"তুমি যদি তাহা সিলাই কর, তবে আমি তোমাকে প্রত্যেক ঝাড়নেতে দুই পয়সা করিয়া দেব, সর্বশুদ্ধ ২।০ নয় সিকা হইবে, তাহা লইয়া তুমি দুইখান উত্তম শাড়ি কিনিতে পারিবা।

ইহা শুনিয়া করুণা কহিল, আপনি ধনবান্, কোন দীনহিনকে একটা টাকা অমনি ফেলিয়া দিলে আপনকার কিছু ক্ষতি হইবে না।"[৮৭]

অর্থাৎ করুণা শুধু অলস নয়, পরের দ্রব্য হাত পাতিয়া লইতেও তার কোনো লজ্জা নেই। এমত ধরনের অনন্য সাধারণ চরিত্রকেও লেখিকা উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন ঘষে মেজে পরিষ্কার করে একটি সুন্দর রমণী চরিত্রে॥

কয়েকদিন পরে করুণার বাড়ি গিয়ে লেখিকা দেখলেন সিঁড়ির উপর বসে সে কাঁদছে, তার মাথার ক্ষত থেকে গাল বেড়ে রক্ত পড়ছে।

লেখিকাকে দেখে করুণা তার দুঃখের ইতিহাস বলতে লাগল—

"বিবেচনা করুণ আমি অতি দুর্ভাগা, আমি কোথা হইতে সুন্দর ঘর ও পরিস্কার বস্ত্র পাইতে পারি? ও মেমসাহেব, যদি ঘরের মধ্যে মিষ্ট বাক্য বলে, তবে দুইদিন অনাহারে থাকিলেও থাকা যায়; কিন্তু এইরূপ নিত্য ঝগড়া মারামারি ইত্যাদি আমি আর সহ্য করিতে পারি না। হায়! আমার মৃত্যু হইলে ভাল হয়।"

মেমসাহেব প্রশ্ন করলেন, স্বামী কেন মেরেছে?

করুণা উত্তর করল, "মেমসাহেব বলি শুনুন। আজি আমি তাবৎ দিন কিছু খাইতে না পাইয়া তিনটা বেলার সময়ে ফুলমণির নিকট দুইটি পয়সা চাহিয়া আনিলাম; পরে তদ্দারা কতকগুলিন ছোট ছোট মাছ কিনিয়া রাত্রিতে ইহা রান্ধিব এমত মনে করিয়া সেই মাছ কুটিয়া ধুইয়া রাখিতেছি, এমন সময়ে আমার স্বামী আর দুইজন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঘরে আইল। তাহারা সকলে কিঞ্চিৎ মত্ত ছিল, তাহাতে আমার স্বামী বড় রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওগো, ভাত তৈয়ারি আছে কিনা? আমি উত্তর দিলাম, চারিটার সময় ভাত হয়? মাতাল হইয়া কি বলিতেছে, তুমি তাহা জান না; আর তুমি কে, যে তুমি ভাত চাহিতে আসিয়াছ? খরচের নিমিত্ত

কি তুমি পয়সা দিয়াছিলা? সে এই কথা শুনিয়া কোটা মাছের চুপড়িকে মাছসুদ্ধ লাথি মারিয়া নর্দ্দমাতে ফেলিয়া কহিল, তুই এমত কথা বলিস? আমি যদি পয়সা না দিই, তবে এই মাছ কি প্রকারে আপনার জন্য যোগাইয়া রাখিয়াছিলি?"[৮৮]

এইবলে করুণাকে মেরে তার স্বামী সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল। মেমসাহেব একথা শুনে করুণাকে বুঝিয়ে বললেন, মাতালকে তিরস্কার করে কোনো লাভ নেই, বরং তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে ফল পাওয়া যাবে। স্বামীকে যখন ত্যাগ করা যাবে না তখন ধৈর্য্য ধরে তার চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। মেমসাহেবের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে করুণার মনের পরিবর্তন হতে থাকে। করুণার বড় ছেলে বংশী বাবার মতোই দুশ্চরিত্র, এই বংশীর পরিণতি উপন্যাসের পাতায় ঘটেছে তার অকাল মৃত্যু দিয়ে। করুণার ছোট ছেলে নবীন মেম-সাহেবের বাড়ীতে খানসামার কাজ পেয়েছে।

লেখিকা অসুস্থ থাকায় বেশ কয়েকদিন করুণার সংবাদ নিতে পারেননি। প্রায় দেড় মাস পরে এসে দেখলেন করুণার দেহ শীর্ণ, মন বিমর্ষ এবং সংসারের অবস্থা পূর্বের চেয়েও খারাপ। স্বামীর স্বভাব পরিবর্তন হয়নি, তবে করুণা খুব ধৈর্য্যসহকারে তার স্বভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। তিনি যখন করুণার সঙ্গে কথা বলছেন তখনই গ্রামের চৌকিদার মাতাল স্বামীকে ধরে নিয়ে এল। মেমসাহেব ওকে ভাল করে শুইয়ে দিতে বললেন। মেমসাহেবের কথা মত কাজ করলে করুণার স্বামী ভাবল কোন বারবণিতা অর্থের লোভে তার যত্ন করছে।

"করুণার এমত নূতন ব্যবহার দেখিয়া তাহার মাতাল স্বামী তাহাকে কিছুমাত্র চিনিতে না পারিয়া বিছানাতে শুইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল, এ বেটী বড় ভাল মানুষ, ইহার ঘরে বরাবর আসিব।"[৮৯]

এরূপ আশ্চর্য্য নাটকীয় উক্তি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের পাতায় স্থান পেয়েছে, এ অপ্রত্যাশিত নয় কি?

মেমসাহেব করুণাকে দু'টো টাকা দিয়ে স্বামীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবার পরামর্শ দিয়ে চলে গেলেন। পরে তিনি করুণার মুখেই শুনলেন যে করুণার স্বামীর জ্ঞান ফিরলে, করুণা তাকে ভাল ব্যবহার করেছে, স্নান করে আসতে বললে স্বামীর মুখে শুনল,

"বোধ হয়, তুমি আমাকে ফুসলাইয়া আমার কাছে পয়সা লইতে চাও,… সে পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আইলে আমি একটা মাতুর দাবায় বিছাইয়া তাহাকে ইলিশ মাছের ব্যঞ্জন ও ডাল অম্ল ও ভাত আনিয়া দিলাম।"[১০]

স্ত্রীর ব্যবহারে আশ্চর্য্য ও সন্দেহ, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে করুণার স্বামীর ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়েছে। মদ খাওয়া ছেড়ে সে কাজকর্মে মন দিল। করুণাও মাতাল স্বামীর পরিবর্তনে মনে মনে খুশী, তাই সংসারের কাজ করা, গির্জায় যাওয়া শুরু হোলো। এভাবে ধীরে ধীরে করুণার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে উপন্যাসের পরিণতি ঘটিয়েছেন লেখিকা।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর Western Influence in Bengali Literature (1932) গ্রন্থে লিখেছেন:

"In this connection we may also mention ফুলমণি ও করুণার বিবরণ—an imaginary sketch of two Christian girls for the glorification of the Christian faith."[১১]

"ফুলমণি ও করুণার বিবরণ"-এ চরিত্রগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। লেখিকার গ্রন্থরচনার মধ্যেই এই শ্রেণী বিভাগের সূত্র পাওয়া যায়। কয়েকটি চরিত্র ধর্মপরায়ণ, সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ, অন্য চারত্রগুলি কর্তব্য-বিমুখ এবং ধর্মের প্রতি আস্থাহীন। ফুলমণি, প্রেমচাঁদ, সুন্দরী, প্যারী, সাধু, সত্যবতী প্রভৃতি প্রথমোক্তশ্রেণীর এবং করুণা, মধু, রাণী, বংশী, করুণার স্বামী ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর। লেখিকা এ দুই শ্রেণীর চরিত্রকেই সমান যত্ন ও সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন তাঁর রচনায়। কাহিনীর প্রত্যেকটি চরিত্র নিজস্ব ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। শ্রীমতী ম্যালেন্সের চরিত্র চিত্রণের এ'টিই প্রধান কৃতিত্ব। শুধু সহানুভূতি নয়, এই সমাজের বাস্তবানুসারী বর্ণনা দিতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শতাধিক বৎসর পূর্বে বাঙলার নিভৃত পল্লী অঞ্চলের জীবন যাত্রার একটি নিখুঁত ছবি এ কাহিনীর মধ্যে আছে। এ ছবি শুধু বাঙ্গালী খৃষ্টান সমাজের নয়, হিন্দু-খৃষ্টান নির্বিশেষে নিচু-তলার বাঙ্গালী জীবনের ছবি। কারণ খৃষ্টধর্মে নবদীক্ষিত বাঙ্গালীরা হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি ও সংস্কারের হাত থেকে তখনো মুক্ত হয়নি। শতাধিক বৎসর পূর্বেকার বাঙলার নিচুতলার সমাজ তার সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, ঈর্ষা, কুসংস্কার, কঠোর দারিদ্র্য ও অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্য পর্যালোচনায় এটি একটি সজীব বাস্তবানুসারী সামাজিক চিত্র। এমতাবস্থায় বিশেষ প্রতিভার অধিকারী না হলে প্রথম রচনাতে এমন অভিনবত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব যে হয়, লেখিকার রচনা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী

ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখিকাগণের মধ্যে শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর সাহিত্য-জগতে রচনার সংখ্যা খুব বেশী না হ'লেও তাঁর রচনার গুণগত দিক বিচারে উক্ত শতাব্দীর লেখিকা নামের তালিকায় উল্লেখ্য এই কারণে যে, একজন নারীর কথা এবং সে নারীর ব্যথা প্রকাশ করবার মতো মানসিকতা ও সহিষ্ণুতা এই লেখিকার কলমে স্থান পেয়েছে।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর রচনার সংখ্যা খুবই কম এবং তদানীন্তন সময়ে তাঁর রচনা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ পাবে এ চিন্তাও লেখিকার ছিল না। সেই কারণে কোনো বিশেষ তাগিদে নয়, নিতান্তই নিজের খেয়ালেই লেখিকার লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে 'মনোরমা' আখ্যায়িকা একথা সর্বপ্রথমেই স্বীকার করেছেন লেখিকা,

"১২৭২ সালে আমি মনোরমার আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হই, এবং ঐ সালেই ইহা সমাপ্ত করি। কিন্তু ইহা মুদ্রাঙ্কনের নিতান্ত অযোগ্য জানিয়া এ পর্য্যন্ত কাহাকেও না দেখাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে, আমি যাহাকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসি বারম্বার সেই স্নেহস্পদের অনুরোধে অগত্যা মুদ্রিত করিতে হইল। এক্ষণে চিরদুঃখিনী মনোরমাকে আপনার চরণে অর্পণ করিলাম। আমার মনোরমাকে স্নেহের চোখে দেখেন এই প্রার্থনা।

আপনার চরণাশ্রিতা—শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী।

'মনোরমা' আখ্যায়িকায় যে চরিত্রগুলি স্থান পেয়েছে, তারমধ্যে মনোরমা চরিত্রটি মূল চরিত্র যার প্রবাহের ধারার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর গতিবিধি এবং একে ঘিরে আছে বেশ কয়েকটি নারী ও পুরুষ চরিত্র। এগুলি যথাক্রমে, হরিনাথ, দুর্গাচরণ, মনোরঞ্জন, মনোহর, কমলা, ব্রাহ্মণী, মনোরমার পিসী প্রমুখ। গ্রন্থের ভূমিকায় আখ্যায়িকার নায়িকা চরিত্র অর্থাৎ মূল চরিত্র মনোরমার কিছু পরিচয় রেখেছেন। গ্রন্থকর্ত্রীর প্রসঙ্গেও ভূমিকাকার লিখেছেন যে,

গ্রন্থ প্রকাশের তাগিদে নয়—সামাজিক নৈতিকতার তাগিদে অর্থাৎ সমাজের নারীর অবস্থানের কথা, তার সুখ-দুঃখের, উত্থান-পতনের কথা বলবার তাগিদ অনুভব করেছেন লেখিকা, আর সেই কারণেই তিনি কলম ধরেছেন। ভূমিকাকারের বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে, যা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে আশা করা যায়।

"মনোরমা পাঠকগণের হস্তে অর্পিত হইল। গ্রন্থকর্ত্রীর অভিমত না হইলেও আমি যত্ন পাইয়া এখানি প্রকাশিত করিলাম। এতৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা ক্ষুদ্র ভূমিকায় বিবৃত করিলাম।

প্রথমেই বলা ভাল, যাঁহারা রসভাব-মাধুর্য্য, অলঙ্কার-বৈচিত্র্য প্রভৃতি কাব্য শরীরের শোভা ও সৌষ্ঠব দেখিতে চান 'মনোরমা' তাহাদের জন্য নহে, কারণ মুগ্ধস্বভাবা কুলকামিনীরা কি ঐ সকল সৌন্দর্য্যের জন্মভূমি? গভীর-চিন্তাশীল পাঠক! এখানি আপনাদের জন্যও নহে; মনোরমা সাদৃশ্য সরলা বালার কোমল মন আপনাদের কঠোর চিন্তাশক্তির তৃপ্তিকর সামগ্রী কোথায় পাইবে? এতৎপাঠে নবন্যাস বুভুক্ষ নব্যদলেরও আনন্দের সম্ভাবনা অল্প। 'মনোরমা' দরিদ্র-ব্রাহ্মণের কন্যা, সম্পত্তির মধ্যে এক সরল, কোমল ও উদার মন। আর সচ্চরিত্র স্বামীর সহবাসকে যদি 'উচ্চশিক্ষা' বলেন, তবে মনোরমা সে শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

সংক্ষেপে গ্রন্থ-নায়িকার এইমাত্র পরিচয় দিলাম। এক্ষণে এতৎপাঠে কাহার আনন্দলাভের সম্ভাবনা? পাঠকগণ! আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এরূপ প্রকৃতির লোক থাকেন, যিনি, একটি অকৃত্রিম গ্রাম্য দৃশ্যের জন্য শত-শত-আহার্য্য-শোভা পারিবারিক নাগারক দৃশ্যরাশি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত; যিনি সভ্যতা ও বিলাসিতার প্রলোভনপূর্ণ নিমন্ত্রণে কর্ণপাত না করিয়া প্রকৃতির অতি সামান্য দানকেও অসামান্য ও অমূল্য বলিয়া জ্ঞান করেন; যিনি, প্রিয়তমাকে বিবিধ রত্নময় আভরণে ভূষিত অপেক্ষা কতিপয় মানসিক আভরণে সজ্জিত দেখিলে প্রীতি হয়েন; এই 'মনোরমা' প্রকৃতপক্ষে তাঁহারি মনোরমা।

গ্রন্থকর্ত্রী আমার পরম আত্মীয়, এবং সম্বন্ধে গুরুজন, তিনি সাংসারিক কার্য্যের অবসরে এইখানি রচনা করিয়াছেন। এখানি মুদ্রিত ও সাধারণ-সমীপে প্রকাশিত হইবে ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অবসরকাল স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবে এই উদ্দেশ্যে নিজের চেষ্টায় যতটুকু সাধ্য পড়িতে শিখিয়াছেন,

এবং পাঠ্যানুশীলনকালে অন্তঃকরণে যে সকল কোমলভাবের আবির্ভাব হইত, সময়ে সময়ে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব এই 'মনোরমা' তাঁহার নবোদিত সুকুমার ও অপরিস্ফুট সদ্‌ভাববৃক্ষের প্রথম মঞ্জরী। আমি একদা তাঁহার এই অযত্ন-রক্ষিত রচনার কিয়দংশ পাঠ করিলাম। দেখিলাম, ইহাতে নিরীহ গ্রাম্য গৃহস্থ জীবনের ও সরল পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের কোমল ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী নিজে মুগ্ধস্বভাব ও অমায়িক বলিয়া সে সকল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করেন নাই। পরে ভাবলাম, বুঝিবা গ্রহকর্ত্রী আমার বিশেষ আত্মীয় বলিয়া তাঁহার লেখাটুকু আমার মিষ্ট লাগিল। এই ভাবিয়া আমার দুই একটি অপক্ষপাতী বন্ধুকে ইহা পাড়িয়া শুনাইলাম; সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইলেন। অনন্তর গ্রন্থকর্ত্রীর একপ্রকার অনিচ্ছা বা অসম্পূর্ণ ইচ্ছাতেই এখানি মুদ্রিত করিলাম। মুদ্রাঙ্কনকালে দুই একস্থানে বর্ণশুদ্ধির সংশোধন ভিন্ন আর বিশেষ কিছু পরিবতন করি নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, কোমলতা ও সরলতা ভিন্ন মনোরমার অন্য গুণ নাই; এক্ষণে কোমল ও সরল প্রকৃতির পাঠকেরা ইহার অনাদর না করিলেই মনোরমাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিব। আমার মতে কণ্টকময় এই দুঃখের সংসারে যদি 'কাব্য', 'কুসুম' 'কামিনী' এবং 'কোমল ও সরলমন', এই চারি পদার্থ না থাকিত তবে এই জীর্ণারণ্যে কেবল দুরন্ত শ্বাপদকুল বিহার করিত—'নরসমাজ' এ নামও থাকিত না। এই চারিটি থাকিতেই সংসার আমাদের বাসযোগ্য হইয়াছে। আবার বলি, কাব্য, কুসুম, কামিনী এবং কোমল ও সরলমন, এই চারিটির মধ্যে শেষেরটি অর্থাৎ 'কোমল ও সরলমন" 'ভোক্তা' এবং প্রথম তিনটি ভোগ্য। আমার সঙ্কেত বাক্য বোধহয় সকলের পক্ষে সুগম হইল না; এজন্য একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। যাঁহার 'কোমল ও সরলমন' নাই, তিনি কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিকুলের অপূর্ব ভাবভাণ্ডারে, বিকসিত কুসুমবনের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে এবং মুগ্ধস্বভাব কামিনীকুলের মধুপূর্ণ হৃদয় ভাণ্ডারে, কদাচ প্রবেশ করিতে পারিবেন না; সুতরাং সেই সেই রসের 'উপভোগ' তাহার অদৃষ্টে নাই।

ইত্যলং পল্লবিতেন।

কলিকাতা
২০ আষাঢ়, ১২৮১ সাল।

প্রকাশক
শ্রী সঃ

উক্ত ভূমিকাতেই মনোরমার স্বভাব এবং তার পরিণতির আভাস রয়েছে। এক্ষণে, সংক্ষিপ্ত কাহিনী উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি, মূলতঃ মনোরমার কথা জানা যাবে। চারিটি পরিচ্ছেদে কাহিনীর সমাপ্তি অর্থাৎ মনোরমার প্রাণত্যাগের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখিকা। জয়পুর জেলার অন্তঃপাতী চন্দননগর সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ হরিনাথ মুখোপাধ্যায় বাস করতেন। তাঁর পত্নী কমলা ছিলেন পতিব্রতা। এই ব্রাহ্মণ দম্পতির একমাত্র পুত্র মনোরঞ্জন। ছেলেবেলা থেকেই মনোরঞ্জন ছিল পড়াশুনায় মনোযোগী।

"বিদ্যালয়ের শিক্ষক যখন পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রেণীর অন্যান্য বালক অপেক্ষা মনোরঞ্জন উত্তম বলিতে পারিত···।"[৯২]

সহপাঠী মনোহরের সঙ্গে মনোরঞ্জনের খুবই বন্ধুত্ব ছিল। দু'জনে একসঙ্গে শয়ন, অধ্যয়ন চলত। কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থার তারতম্য ছিল। তা সত্ত্বেও,—"মনোহর ধনাঢ্য লোকের সন্তান, হইয়াও প্রতিদিন মনোরঞ্জনের বাটিতে আসিয়া পড়াশুনা করিত, কেবল আহারের সময় বাটি যাইত'·· "[৯৩]

হরিনাথের বাড়ীর অনতিদূরে বাসস্থ এক ব্রাহ্মণ, নাম দুর্গাচরণ, তিনি বাণিজ্য-ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু হরিনাথের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল। এই কারণে দুর্গাচরণের কলকাতার বাড়ীতে হরিনাথ মনোরঞ্জন এবং মনোহরকে পরীক্ষা দেবার জন্য পাঠান। দুর্গাচরণ অর্থবান হলেও সচ্চরিত্র ও ধার্মিক ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যার নাম মনোরমা।

পরীক্ষা শেষে যখন মনোরঞ্জন ও মনোহর গ্রামে ফিরতে চাইল তখন দুর্গাচরণ তাদের কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে বললেন। কারণ তিনি কয়েক-দিনের মধ্যেই গ্রামে যাবেন, তাই একসঙ্গে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে ছাত্রদ্বয় রাজী হয়ে গেল।

কলকাতায় ক'দিন ঘুরে ফিরে নানান নতুন সামগ্রীও তাদের দেখালেন দুর্গাচরণ। কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার বহুচেষ্টা করেও দুর্গাচরণকে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হলেন না। ব্রাহ্মণ নিজের মৃত্যু নিকটবর্তী বুঝতে পেরে মনোরঞ্জনের হাত ধরে বললেন,

"বাপু! তুমি আমার যেরূপ সেবা ও যত্ন করিয়াছ, পুত্রে পিতার এরূপ করে কিনা সন্দেহ। আমি কায়মনোবাক্যে জগৎপিতার নিকট এই প্রার্থনা

করিতেছি যে তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া জগতের মঙ্গল সাধন কর—আমি তোমাকে আর একটি অনুরোধ করিতেছি—আমার কন্যাটির মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান করিও এবং ব্রাহ্মণীকে বলিও—আমি পরলোকে জগৎ পিতার নিকট গমন করিলাম… ।"[১৪]

দুর্গাচরণের ভৃত্যসহ মনোরঞ্জন ও মনোহর গ্রামে এসে পৌঁছিল। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনে ব্রাহ্মণী বারংবার মূর্ছা যেতে লাগলেন এবং মূর্ছান্তে নানানভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। পদ্যের ছলে লেখিকার এই দীর্ঘ প্রলাপ উপস্থাপনের দক্ষতা উল্লেখের দাবী রাখে। এক্ষণে সামান্য উপমা উপস্থাপিত হোলো।

"… … … …

আমি নারী অভাগিনী পড়ে কাঁদি একা।

এস এস প্রাণনাথ! এসে দাও দেখা॥

… … … …"[১৫]

ব্রাহ্মণীর এরূপ বিলাপ দেখে সকলেই তাঁর প্রাণ নাশের আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়ল এবং তাঁকে নানান ভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেও বিফল হোলো। দুর্গাচরণের ব্যবসায়ের একজন বহুদিনের কর্মচারী ছিলেন, তিনি বহুদিন যাবৎ এদের বাড়ীতে থাকেন এবং তাঁর কথা সকলেই শুনত। ব্রাহ্মণী যখন আত্মঘাতী হবার অর্থাৎ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন তখন এই বৃদ্ধ কর্মচারী তাঁকে নানান যুক্তির সাহায্যে প্রবোধ দিতে লাগলেন। একমাত্র কন্যা মনোরমাকে দেখিয়ে বললেন,

"এই সুকুমারী কুমারীর কি এখন পিতৃহীন হইবার সময়। মা তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর। স্থির হও, উঠ! উঠিয়া উহাকে নিকটে ডাক…।"[১৬]

ব্রাহ্মণী যদিও বৃদ্ধ কর্মচারীর প্রবাধ বাক্যে কিছুটা শান্ত হয়ে আত্মহত্যা করবার চিন্তা ত্যাগ করলেন কিন্তু তিনি আর সংসারী হলেন না। তিনি বাড়ীর নিকটস্থ তাদের পুষ্পোদ্যানে এসে বললেন,

"তোমাদের সকলকে বিনয় করিয়া বলিতেছি পুরুষমাত্রেই যেন, এ উদ্যানে না আসেন। আমি সংকল্প করিয়াছি যে পুরুষের মুখাবলোকন করিব না।"[১৭]

ব্রাহ্মণী উদ্যানস্থিত রামসীতার মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে পাশে একটি সামান্য গৃহ ছিল, তার মধ্যে বনবাস করবার সংকল্প নিলেন। মনোরমা দাসীর কাছেই থাকত এবং তার পিসীমা তার দেখাশুনা করতেন।

একদিন মনোরঞ্জনের মা তাদের খবর নিতে এলে মনোরমার পিসীমার কাছে সব শুনে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ব্রাহ্মণী তাঁকে তাঁর মনের দুঃখের কথা বললেন ; এবং মনোরমা বিষয়ে তাঁর চিন্তার কথা বলতে গিয়ে বললেন যে, মনোরমাই তাঁর জীবনের একমাত্র পায়ের বেড়ি,

"আপনি যদি দয়া করিয়া মনোরঞ্জনের সহিত মনোরমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমাকে এই গুরুতর চিন্তা হইতে মুক্ত করা হয়।"[৯৮]

মনোরঞ্জনের মাতা এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তাই হরিনাথ তাঁর পুত্র মনোরঞ্জনের সঙ্গে মনোরমার বিবাহ দিলেন। ব্রাহ্মণীকে চিন্তা মুক্ত করেও মনোরঞ্জনের মাতা আর পুত্রবধূ নিয়ে ঘর করবার আশাপূর্ণ করতে পারলেন না, কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ জ্বরে তিনি পরলোকগমন করেন।

মায়ের মৃত্যুতে মনোরঞ্জন অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়ল। মনোহর বন্ধুর পাশে থেকে তাকে নানান ভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল। বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই মাতৃবিয়োগ হেতু মনোরঞ্জনের যত রাগ গিয়ে পড়ল মনোরমার উপর, ক্রোধে সে নারীজাতির বিষয়ে দোষারোপ করলে মনোহর তাকে বোঝালো,

"স্ত্রীজাতির প্রতি এতে দোষারোপ কি জন্য করিতেছ ?···পৃথিবার হিতের জন্যই করুণাময় পরমেশ্বর স্ত্রী জাতিকে কোমলপ্রকৃতি ও সাহসহীন করিয়াছেন, ···স্ত্রী জাতি দ্বারা জগতের উপকার হয় না একথা তোমায় কে বলিল ? ইহাদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে এবং সদুপদেশ প্রদান করিলে বুঝিতে পারিবে যে স্ত্রীজাতি দ্বারা জগতের উপকার হইতে পারে কিনা।"[৯৯]

এখানে লেখিকার নারী জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এর কিছুদিন পরে মনোরমার মায়ের মৃত্যু হলো। বেচারী মনোরমা, শৈশবের অতি আদরে পালিতা দুর্গাচরণের একমাত্র কন্যা সে, অসময়ে পিতৃবিয়োগ এবং মায়ের অনাদর। যদিও বা শ্বশ্রুমাতার স্নেহ পাবার জন্য বিবাহ হলো, কিন্তু তা থেকেও সে বঞ্চিত হলো, এমনকি স্বামীর ভালবাসা থেকেও বঞ্চিত। এখন স্ব-মাতৃ-বিয়োগে সে একেবারে একা হয়ে পড়ল। মনোরমার মায়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং এদিকে স্ত্রীবিহীন সংসার দেখাশুনা করবার জন্য হরিনাথ পুত্রবধূকে স্বগৃহে নিয়ে এলেন। মনোরমা শ্বশুরের গৃহে এলো, এবং স্বামী ও শ্বশুরের দেখাশুনার ভার নিয়ে তা স্বযত্নে প্রতিপালন করবার চেষ্টাও করতে লাগল। শ্বশুর বাড়ীতে বহুদিনের একজন পরিচারিকা ছিল, সেই-ই মনোরমার সঙ্গে সাংসারিক কাজে

সাহায্য করত। মনোরমা লেখাপড়া একেবারেই শেখে নাই, সেইকারণেই মনোরঞ্জন তাকে বিদ্যাশিক্ষা ও তৎসঙ্গে জ্ঞানোপদেশ দিতে আরম্ভ করলো।

"মনোরমা পতির আজ্ঞানুসারে প্রথমভাগ আরম্ভ করিলেন এবং একাগ্র চিত্তে পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিলেন।"[১০০]

সারাদিন গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম করবার পর রাত্রে মনোরমা অধ্যয়ন করতে লাগল। এভাবে ধীরে ধীরে সে বাংলা পড়তে ও লিখতে শিখল। কিছুদিন এভাবে তাদের সংসার ভালই চলছিল। কিন্তু সামান্য চাষ-বাসের উপর নির্ভর করে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়লে মনোরঞ্জন চাকরীর চেষ্টা করতে লাগল। ইতিমধ্যে তাদের দু'টি পুত্রসন্তান হয়েছে। মনোরঞ্জনের একটা কাজও যোগাড় হ'ল, গোরকপুরের জমিদারের অধীনে দু'শত টাকা মাইনের চাকরী, তাই স্ত্রী-পুত্র ও পিতাকে রেখে কর্মস্থলে রওনা হলো।

এর কিছুদিনের মধ্যে মনোরঞ্জনের পিতা পুত্রের চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দিন দিন শ্বশুরের অবস্থার অবনতি হতে লাগল, মনোরমা তাই স্বামীকে পত্র লিখল। কিন্তু কোনো উত্তর আসার পূর্বেই হরিনাথ পরলোকগমন করলেন। মনোরমা একেবারে একা হয়ে দু'টি পুত্রসন্তান নিয়ে অত্যন্ত চিন্তায় পড়ল, এদিকে স্বামীর কোনরূপ পত্র না পাওয়ায় সে একেবারে অধীর হয়ে পড়ল, সবসময়ই সে পতি চিন্তায় মগ্ন।

একদিন মনোরমার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র একটি পত্র এনে মায়ের হাতে দিল। মনোরঞ্জনের পত্র বুঝতে পেরে এবং কোনো অমঙ্গল আশঙ্কায় মনোরমা সে পত্র খুলতে পারল না, মনোহরের পত্নী অবশেষে সে পত্র খুলে দেখল—মনোরঞ্জনের লেখা দীর্ঘ বিলাপপূর্ণ পত্র।

... ...

দেখা যদি পাই তবে বলিব সকল।
নতুবা আমার মনে জ্বলিবে অনল॥

... ...[১০১]

মনোরঞ্জনের পত্রের বিষয় ছিল যে, গোরখপুরে চাকরী করতে গিয়ে সেখানকার জমিদারের কর্মচারীর কারসাজিতে মনোরঞ্জনকে চুরির অপবাদে হাজতে পাঠানো হয় এবং বন্দী থাকা অবস্থাতেই অতিকষ্টে মনোরঞ্জন মনোরমাকে এ পত্র লেখেন।

পত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই মনোরমা সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে আর কাল বিলম্ব না করে পুত্রসন্তান দু'টিকে মনোহরের স্ত্রীর কাছে রেখে পুরানো পরিচারিকাকে নিয়ে গোরখপুরে যাত্রা করল। মনোরমা কোনদিন গৃহের বাইরে বার হয়নি, তার কাছে তাই রাস্তাঘাট একেবারেই অজানা।

"কতক হাঁটিয়া কতক রেলে···এইরূপে মনোরমা অষ্টম দিবসে গোরখপুরে পঁহুছিলেন।"১০২

গোরখপুরে গিয়ে তারা শুনল নির্দোষী প্রমাণ হওয়াতে তিনদিন হলো মনোরঞ্জন কারামুক্ত হয়ে অযোধ্যা গিয়েছে। মনোরমা অযোধ্যা রওনা হলো। সেখানে গিয়ে শুনল যে, অযোধ্যায় ঘণ্টা পাঁচ-ছয় বিশ্রাম করবার পর মনোরঞ্জন নৈমিষারণ্য গমন করেছেন। নৈমিষারণ্যে পৌছে তারা জানল, জনকপুরে গমন করেছেন। অনেককষ্টে জনকপুরে এসে মনোরমা স্বামীর অনুসন্ধান করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই যখন মনোরঞ্জনের সন্ধান পাওয়া গেল না তখন বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বাড়ী ফিরে যেতে বলে মনোরমা দু'চোখ যেদিকে যায় চলে যাবে বলে এগিয়ে চলল।

পরিচারিকা ক্রন্দন করতে করতে ফিরতে লাগল, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এলে বৃদ্ধা খুব অসহায় বোধ করতে লাগলে তার ক্রন্দনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পথে এ সময় এক যুবকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে সব তাকে খুলে বলল এবং তারা দু'জনে মিলে মনোরমাকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলল। যুবক জানতে চাইল, "বাছা! দুঃখিনী মনোরমা পতির উদ্দেশ্যে কোন দিক গিয়াছে বলিতে পার?"১০৩

তারা দু'জনে যে পথে মনোরমা গিয়েছে সেদিকে এগিয়ে চলল, পথে মনোহরের সঙ্গে তাদের দেখা হ'লে বৃদ্ধা তাকে সবকথা বলল। যুবক এতক্ষণ আত্মগোপন করে থাকলেও এবার আর নিজের পরিচয় না দিয়ে থাকতে পারল না। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল,

"তোমাদের হতভাগা মনোরঞ্জন এই এখনও জীবিত আছে?"১০৪

তারা সবাই মিলে এগিয়ে চলল মনোরমার খোঁজে। এদিকে মনোরমা পতিবিরহে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যখন অগ্নিশিখা গগনস্পর্শ করল তখন তার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে মনোরমা প্রার্থনা করতে লাগল—

.. ..

কোথায় হে দীননাথ। দাও দরশন।
অভাগিনী আত্মপ্রাণ দেয় বিসর্জন।[১০৫]

মনোরঞ্জন ও মনোহর দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে ছুটে গেল, কাছে এসে মনোরমার হাত ধরে মনোরঞ্জন কিছু বলবার আগেই সে চেতনা শূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, এ-মূর্ছা আর ভাঙ্গল না।

লেখিকা সম্পূর্ণ আখ্যায়িকা জুড়েই মনোরমার শৈশব থেকে জীবনের শেষ পরিণতির কথাই বলে গিয়েছেন, সেই কারণে তাঁর রচনার সার্থক নামকরণ হয়েছে বলা যায়। গদ্য-পদ্যের সমন্বয়ে লিখিত আখ্যায়িকাখানি লেখিকার বলিষ্ঠ লেখনীর সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমাজ সংসার সমস্যাবহুল একটি বাস্তব চিত্র লেখিকা তাঁর লেখনীতে চিত্রিত করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা যে সমাজের পক্ষে কতটা সাহায্যকারী এবং সুফল প্রদান করতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর এই লেখিকা তা অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই বোধ হয় মনোরমাকে শিক্ষিত করবার দায়িত্ব পালনে মনোরঞ্জনকে আকৃষ্ট করেন।

সরোজকুমারী গুপ্তা

সরোজকুমারী দেবীর কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প, গ্রন্থটি ছোট-মাঝারি মাপের এগারোটি গল্পের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে। গল্পগুলি যথাক্রমে 'ভুল', 'বিসর্জন', 'অদৃষ্ট', 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া', 'সন্দেহ বিভ্রাট', 'পরাজয়', 'প্রতিশোধ', 'শাপেবর', 'হারজিত', 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এবং 'প্রেমের জয়'। উক্ত গ্রন্থের গল্পগুলি লেখিকার মূল্যবান রচনা। এ বিষয়ে উল্লেখ্য, ভূমিকাতে শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের বক্তব্য,

"বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িত্রী সরোজকুমারী ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর পূর্ব্বে মহিলা রচিত বাঙ্গালা নবেল এদেশে আর প্রচার হয় নাই। সরোজকুমারী নবেল রচনায় দ্বিতীয় মহিলা এবং এই তাঁহার প্রথম উদ্যম।..."[১০৬]

উক্ত গল্পগুলি নানান স্বাদের। ইংরাজী গল্প অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'ভুল' গল্পটি। এটি একটি ইংরাজী গল্পের ছায়ানুভাসে লিখিত অর্থাৎ অনুবাদিত নয়। গল্পের চরিত্রগুলি,—এলা, সুকুমার, পিসিমা, অবিনাশ দাদা, দিদি, মিষ্‌টার বসু, লীলা, বিনয়, সুরেশ মজুমদার, দেবেন দত্ত, মিস লি, আন্না

প্রমুখ। সংক্ষিপ্ত কাহিনী উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুর প্রতি আলোকপাত করা যাবে। এলা সুকুমারের স্ত্রী, দেবেন দত্ত গল্পের খল নায়ক, সে সুকুমারের সহপাঠী। পার্শ্বচরিত্র হিসাবে সুরেশ মজুমদার কাহিনীর গুরুত্ব এনেছে। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রগুলি কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এলার সামান্য ভুলের জন্য খলনায়ক দেবেন কাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এলা সুকুমারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। এই বিচ্ছেদের সূত্র একটি উড়ো চিঠি যা এলাকে চঞ্চল করে দিয়ে বিচ্ছেদের সূচনা ঘটায়। চিঠির বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো।

ম্যাডাম —

"আপনাকে শিরোনামায় 'মিসেস রায়' লিখতে বাধ্য হইলাম·· ···তিনি ধর্মতঃ আপনার স্বামী নহেন, কারণ তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন আমাদিগের দেশের বিধিমতে লিই প্রকৃত মিসেস রায়। এই বিবাহের সার্টিফিকেটের নকল পাঠাইলাম।"

আপনার বিশ্বাসী

কেম্ব্রিজ তাং-সন। এম. এল. স্মিথ।[১০৭]

এই চিঠিটিই একটি সুন্দর সংসার ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সুরেশ মজুমদারের সহায়তায় এ চিঠি জাল প্রমাণিত হয়। মিস লি যে দেবেন দত্ত কর্তৃক একটি কল্পিত চরিত্র যাকে সুকুমারের স্ত্রী সাজিয়ে বিচ্ছেদের সূচনা করা হয়, এ প্রমাণ করে সুরেশ এলাকে পত্র লেখেন। কিন্তু এ চিঠি পাবার আগেই সুকুমার বিলেত পাড়ি দেন। এলার সন্দেহ মোচনের জন্য উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এলার উপর অভিমান করেই সুকুমার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ চিঠিটি দেবেন যে কলকাতা থেকে পাঠিয়েছে সে প্রমাণও পাওয়া গেল। কিন্তু মনের ভুলে এলা দেবেনের চিঠিটি শীতের বস্ত্র শালের মধ্যে রাখায় এবং তা সুকুমার দেখতে চাওয়ায় চিঠিটি দেখাতে পারেনি। চিঠিটি যে কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছে তাঁর প্রমাণও মেলে সুরেশের চিঠি থেকে এবং এলাও চিঠিটি খোঁজ করে পেয়ে সমস্ত বিষয়ই বুঝতে পারে। কিন্তু তখন আর কিছু করবার নেই, সুকুমার বিলেত পাড়ি দিয়েছে। ব্যাপারটা যখন জলের

মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল তখন এলা নিজের ভুল স্বীকার করে, ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে সুকুমারকে পত্র লেখে। কিন্তু এখানেও একটি ছোট ভুলে সে পত্র সুকুমারের হাতে পৌছালো না। ভুলটি হোলো, এলার বাচ্চার আয়ার। আয়াকে চিঠিটি পোষ্ট করবার জন্য দেওয়া হয়, কিন্তু সে মনের ভুলে চিঠিটি পোষ্ট করে না।

এভাবে ক্রমশঃ সামান্য ভুল বিচ্ছেদের বেদনাকে বাড়িয়ে বৃহত্তর আকার ধারণ করে এবং বেশ কিছুকাল চিরস্থায়ীও হয়। অবশেষে এ ভুলের পরিসমাপ্তি ঘটে এলার ছেলে 'অমিয়'র নামকরণের আগের দিন। আয়ার সে চিঠির কথা মনে পডলে সে তখনই এলাকে দেখালে, নিজের ভুল স্বীকারক্তিপূর্বক সুকুমারকে এলা পত্রটি পাঠিয়ে দেয়। পত্র প্রাপ্তির পর সব অভিমানের অবসান ঘটে, বিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি ঘটে। এলা ও সুকুমারের মিলন সংগঠিত হয়।

উক্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা কাহিনীকে পূর্ণ রূপ দিয়েছে এবং নামকরণে সার্থকতাও রক্ষা করেছে।

লেখিকার এ গল্পের মূল চরিত্রগুলিকে পার্শ্বচরিত্রগুলিও যথেষ্ট সহায়তা করেছে যা গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে অত্যন্ত সাবলিলভাবে। এবং নামকরণও সঠিক হয়েছে।

সমাজের বাস্তবজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রকাশ পেয়েছে লেখিকার 'বিসর্জন' এবং 'অদৃষ্ট' গল্প দু'টিতে, যেখানে কাহিনীর শুরুতেই তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ'টি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

'বিসর্জন' গল্পের চরিত্রগুলি হলো—উমাশশী, উমার পিতা, শরৎচন্দ্র, উমার শাশুড়ী এবং মেয়ে সুধাময়ী। এ গল্পের কাহিনী একেবারে সমাজের ঘরোয়া কথা যেখানে উমাশশীই মুখ্য চরিত্র এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি উমাশশীর জীবনের পরিণতি ঘটাবার পক্ষে সাহায্য করেছে। শৈশব থেকে চিররুগ্না ও ভীরু-স্বভাবের উমাশশী সকলের চোখে বোকা মেয়ে হ'য়ে শৈশব সদ্য পার হয়ে কৈশোরে পা দিয়েছে। এগারো বছর বয়সে বি. এ. পাশ করা বি. এল. পাঠরত শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। বি. এল. পাশ করে স্বামী গ্রামে প্র্যাক্টিস করবার জন্য স্ত্রী উমাশশীকে নিয়ে গ্রামে তার নিজের বাড়ীতে বসবাস করতে লাগল। শ্বশুরবাড়ীতে উমাশশীকে বোকা বৌ উপাধি গ্রহণ করতে হোলো তার সরল ও ভীরু স্বভাবের জন্য। ষোড়শ বছর বয়সে সে একটি শিশুকন্যার জন্ম

দিল, নাম সুধাময়ী। সে এখন মা উমাশশী। কিন্তু উমাশশীর জীবনে বুঝিবা শান্তি নেই, তাই শরৎচন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অবশেষে পরলোকগমন করলেন। স্বামী বিচ্ছেদের শোক সামলে উঠতে না উঠতেই অর্থাৎ দু'মাসের মধ্যে দুই বছরের কন্যা জলে ডুবে মারা গেল। সংসারের প্রতি বিদ্বেষ, হতাশা উমাশশীকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। তাই সে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করল। কিন্তু কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ফলে তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং শেষ হলো মৃত্যুতে। কাহিনীর শেষে লেখিকার উক্তি গল্পের সজীবতা এনেছে।

"হরিনামের মালা হাতে ধরিয়া অভাগিনী কন্যাশোকে কাতরা বিধবা সজ্ঞানে হরির বৈকুণ্ঠ লোকে চলিয়া গেল। সেই দগ্ধ প্রাণ শান্তি লভিল। এখনও আমার মানসচক্ষে সেই দৃশ্য জীবন্তভাবে জাগিয়া আছে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। বিধবা হইয়া সে বৎসরখানেক এ পৃথিবীতে অশেস যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। তাহার ব্রত পূর্ণ হইলে সে অমর ধামে পতিদেবতার চরণোদেশে চলিয়া গেল। ঈশ্বর তাহাদের দুঃখময় তাপিত আত্মদ্বয়কে সম্মিলিত করিয়া চিরশীতল করুণ, এই প্রার্থনা।"[১০৮]

'অদৃষ্ট' গল্পের চরিত্রগুলি—মনোরমা, নরেন্দ্র, গুরুঠাকুর, কুসুম, নরেন্দ্রর বাবা, যতীন, খুড়ীমা, মনোরমার মা, নরেন্দ্রর মা, শরজ্জন্দ্র, যতীশ প্রমুখ। গুরুঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণী, পিতার শাসনের কারণে স্বামী-স্ত্রী মিলনে বাধা ঘটায় একাকী থাকার নিসঙ্গতা, অবশেষে স্বামীর মৃত্যুতে মনোরমার জীবনের দুঃসহ অন্ধকার রাত্রির শুরু—এখানেই কাহিনীর শেষ। তাই মনোরমা এ গল্পের মুখ্য চরিত্র, যাকে ঘিরে অন্যান্য চরিত্র কাহিনীর উপযোগীতা অনুসারে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

কিশোরী মনোরমার বিবাহ হয় বি. এ. পাঠরতা নরেন্দ্রর সঙ্গে। ফুলশয্যার রাত্রে গুরুঠাকুর মনোরমাকে আশীর্বাদ করতে এসে তার হাত দেখে ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "মা তুমি লক্ষ্মী, তুমি চিরসুখী হও"। গুরুঠাকুরের এই আশীর্বাদ কাহিনীর শেষে গিয়ে প্রহসনে পরিণত হয়েছে কিভাবে তা লেখিকার লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। ফুলশয্যার রাত্রেই মনোরমার প্রবল জ্বর হল, এদিকে নরেন্দ্রের পড়াশুনা, সবদিক বিবেচনা করে নরেন্দ্রের পিতা ঠিক করলেন দু'জনকে আলাদা রাখবার এবং তা কার্যকরীও হলো। বিবাহের পর পরই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে নরেন্দ্র পিতার আদেশানুসারে মনোরমাকে সেখানে রেখে এল।

কিশোরী মনোরমার এই আলাদা থাকা একেবারেই ভাল লাগে না, তবু উপায় নেই, শ্বশুরের নির্দেশ। নরেন্দ্র ও মনোরমা উভয়ই একাকীত্ব অনুভব করে, যোগাযোগ শুধুমাত্র চিঠিতে। চাক্ষুষ মিলনের জন্য উভয়ের আকুল, পরীক্ষা শেষে পিতার অনুমতি ব্যতিরেকেই নরেন্দ্র চলে যায় মনোরমার সঙ্গে দিন তিন চারেকের জন্য দেখা করতে। শ্বশুর বাড়ীর আদর একদিকে, অন্যদিকে পিতার শাসন, নরেন্দ্র জামাইষষ্ঠীতে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নেয়।

খুড়ীমার হাওয়া বদল করবার জন্য জামালপুরে যাবার প্রয়োজন, নরেন্দ্র তাঁকে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরোয়, পিতার নিকট থেকে কোনো পত্র নেই। শুধুমাত্র ভায়ের কাছ থেকে পত্র পায়, পরীক্ষায় ফেল হবার সংবাদ। নরেন্দ্র পিতার এরূপ ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে পড়ল। পিতার সামনে যাবার মত মানসিক শক্তি তার ছিল না। তাই সে খুড়ীমার সঙ্গে জামালপুরে থাকতে লাগল। এই জামালপুরেই একদিন গঙ্গাবক্ষে তিন পাহাড়ের মন্দির দর্শন করতে যাবার জন্য রওনা হয় দুই বন্ধু। কিন্তু পথে নৌকাডুবি হয়ে নরেন্দ্র ও যতীশ উভয়েই মারা যান। জামাইষষ্ঠীতে তার আসা হ'ল না। মনোরমার স্বামীর চিরবিচ্ছেদ এবং দুঃখের রজনী শুরু। এখনকার মনোরমার অবস্থা বলেছেন লেখিকা তাঁর লেখনীতে—

"এখনো সে অযত্নে পালিত বন্য কুসুমের মত পড়িয়া আছে। কবে সে দিন আবার সে নরেন্দ্রকে পাইয়া সকল ব্যথা ভুলিবে? এই জগতের বিরহের পর কি সেই পুণ্য লোকে চিরমিলন হইবে না...।"[১০৯]

সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে নিয়ে লেখিকা আরো যে গল্প বা কাহিনী লিখেছেন তার মধ্যে নারীর দম্ভের পরিণতিকে দেখিয়েছেন 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' গল্পে। স্বামীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে স্ত্রী যে নিজের এবং সংসারের কত ক্ষতি ডেকে আনতে পারে তার একটি চিত্র লেখিকা তাঁর 'সন্দেহবিভ্রাট' গল্পের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

ধনীর দুহিতা উষার সঙ্গে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র নীরদের বিবাহ হওয়ায় সামাজিক এবং সাংসারিক ক্ষেত্রে যে প্রতিফলন পড়েছে তারই একটা নিটোল চিত্র এঁকেছেন সরোজকুমারী দেবী তাঁর 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' গল্পটিতে। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া অর্থাৎ বহু জাঁকজমক সহকারে আরম্ভ কর্মের তুচ্ছ পরিণতি

বা সামান্য ফললাভ। এ-গল্পের মধ্য দিয়ে ধনী দরিদ্রের সম্পর্ক এবং উভয়ের কাছে কার দাম কত বেশী তা প্রকাশ পেয়েছে লেখিকার এ গল্পে। ধনীর আছে ধনসম্পদের অহংকার আর দরিদ্রের আছে বিদ্যার গৌরব, যে সম্পদে সমৃদ্ধশালী দরিদ্র নীরদ স্ত্রীর অন্যায় দম্ভকে মেনে নিতে পারেনি, প্রতিবাদ করেছেন অত্যন্ত শালীনতা বজায় রেখে। এ প্রতিবাদের ভাষা নীরব। তাই তো নীরদ জয়ী হয়েছে আর উষা আত্মগরিমা ও দম্ভের জ্বালায় নিজেকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শোধন করে আত্মসমর্পণ করেছে স্বামীর কাছে। বিত্তবান উমাকান্তবাবু তাঁর দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা উষাকে বিবাহ দেন মেধাবী দরিদ্র ছাত্র নীরদের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে নীরদের পড়াশুনার সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব নেন। ধনী পিতার আদরের দুহিতা উষা ছিল জেদী এবং স্বাধীনচেতা। এর ফলে দাম্পত্য জীবনে ছোট-খাটো দেনা-পাওনা, মান-অপমান, চাওয়া-পাওয়া প্রভৃতির দ্বন্দ্বে পরে উভয়েরই মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা হোতে থাকে। এমনি একদিন গঙ্গা স্নানকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা চরমে পৌছোয় এবং নীরদ বস্তুতঃ পক্ষে স্ত্রীর উপর ক্রোধ এবং অভিমান করে লাহোরে চলে যায় বি. এল. প্র্যাক্‌টিসের আছিলায়। আত্মগরিমায় গরবিনী উষা আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ টেনে আনে, পরবর্তীসময়ে ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়। এবং স্বামীর চলে যাবার কিছুদিনের মধ্যে শয্যা নেয়। তার শরীর ভেঙ্গে পড়তে থাকে, এ বিষয়টি উমাকান্তবাবু এবং তাঁর স্ত্রী উভয়ের চোখে এড়ায় নি। তাই তাঁরা মধ্যস্থতা করে উভয়ের মিলনে সাহায্য করেন। উষাকে নিয়ে তাঁরা তীর্থভ্রমনে যান এবং সেখানে থেকে ফেরবার পথে লাহোরে নীরদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন, নীরদ কংগ্রেস অধিবেশন থেকে ফেরবার পথে দুর্ঘটনার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই রাত্রেই উষা সবার অলক্ষ্যে স্বামীর কাছে গিয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়। ফলতঃ দু-জনের মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতা তা কেটে গিয়ে পুনরায় উষার সঙ্গে নীরদ একাত্ম হয়ে যায় এবং চিরবেচ্ছেদের অবসান ঘটে।

সুধীর চন্দ্র তাঁর গ্রামের জমিদারীর দায়িত্বভার নায়েব মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করে স্ত্রী চারুশীলাকে নিয়ে কলকাতায় বসবাস করতে থাকে। পল্লীগ্রামের মেয়ে চারু প্রথমে অসুবিধা হলেও ধীরে ধীরে শহরের আদব-কায়দা আয়ত্ত করে নেয়। তারা সন্তানহীনা। একবার তাঁর মুঙ্গেরে বন্ধু মহিমাচরণের বাড়ী

বেড়াতে যায়, সেখানে একদিন নদীতীরে পীড়পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে এক সুন্দরী খৃষ্টান রমণীকে দেখে সুধীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন এবং তাকে লক্ষ্য করে তার বাসস্থানও সন্ধান করে নেন। এরপর প্রায় প্রতিদিনই সুধীর সেই রমণীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। স্ত্রী চারুর বিষয়টি গোচর এড়ায় না, সে রমণীর পরিচয় জানতে চাইলে সুধীরের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পায় না। ফলে চারুর মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে এবং সে স্বামীকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। চারুর সন্দেহ ক্রমশঃ চরম পর্যায়ে পৌঁছলে সে তার দাসী বিন্দার সাহায্য নেয় এবং সেই রমণীর গৃহে গিয়ে তাকে সেখান থেকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ জানায়, এমনকি অর্থের বিনিময়ে যাতে রমণী সে স্থান ছেড়ে যেতে রাজী হয় তার প্রচেষ্টা করতে থাকে। ঘটনাক্রমে সুধীর সেখানে উপস্থিত, সুধীর এবার চারুর মনের অবস্থা অনুভব করে সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটায় অর্থাৎ সেই খৃষ্টান রমণীর পরিচয় প্রকাশ করেন। চারু জানতে পারে ঐ রমণী সুধীরের নিজের বোন কমলা। কমলার স্বামী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তার পিতা তাকে ত্যাজ্য পুত্র করলে কমলাও শ্বশুরের গৃহ থেকে সে রাত্রেই পালিয়ে স্বামীর কাছে চলে আসে। কমলার স্বামীর অকালমৃত্যুতে সে মুঙ্গেরে এসে বাস করছে এবং এখানেই ছোট ছেলেমেয়েদের একটা স্কুল করেছে। সব শুনে চারুর মনের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেলে এবং সে নিজে গিয়ে কমলার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। কমলাকে তারা তাদের সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। একবছর পর চারু মহিমাচরণের স্ত্রী নলিনীকে পত্রে জানাল যে চারুর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে এবং পীরপাহাড়ের সেই রমণী এখন কলকাতাতেই থাকে, তাঁদের নিকট আত্মীয়া। এখানেই সন্দেহ বিভ্রাট গল্পের শেষ। গল্পের বিষয়বস্তু শিরোনামের উপযোগীই।

ইতিহাসকে আশ্রয় করে রচিত লেখিকার দু'টি গল্প এ-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, যথাক্রমে, 'পরাজয়' এবং 'প্রতিশোধ'। যদিও ইতিহাস আশ্রয়ে গল্প দু'টির শুরুতে মনে হবে বিদ্রোহ যুদ্ধ। কিন্তু উভয় গল্পের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে নারীপুরুষের প্রণয় মিলনে এবং কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রণয়ই কাহিনীকে বেঁধে রেখেছে।

দুর্গাধিপতি অনন্তদেবের মৃত্যুর পর সে দুর্গ অধিকার করলেন সুরজমল। সুরজমলের পুত্র বিনায়ক এ-দুর্গে এলেন। আসবার পথে তাঁর অশ্বের তাড়ায়

অনন্তদেবের কন্যা তারাদেবী মূর্ছা যায়। যুবক বিনায়ক শুশ্রূষা করে। জ্ঞান ফিরলে তারা দম্ভভরে তার পরিচয় দিয়ে গ্রামের প্রান্তের ক্ষুদ্র কুটীরে মায়ের কাছে চলে গেলে। অনন্তদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী কন্যা তারাকে নিয়ে গ্রামের প্রান্তে ঐ ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করতেন। ধীরে ধীরে নতুন দুর্গাধিপতি সুরজমল এবং তাঁর পুত্র বিনায়ক স্বকর্মের দ্বারা গ্রামবাসীর মনে শ্রদ্ধার আসন তৈরী করে নিলেন। তারার মন থেকেও তাই বিনায়কের প্রতি বিদ্বেষ কেটে গেল। একদিন বিশ্বস্ত কর্মচারী মহাবীরের সঙ্গে দরিদ্র গ্রামবাসীদের খোঁজ খবর নিয়ে ফিরবার সময় নদী পারে তারাকে বিনায়ক বসে থাকতে দেখে। তারা সে সময় নদীর জলে বিনায়কের প্রতিবিম্ব দেখে এত মুগ্ধ হয়ে যায় যে, নিজের অজান্তেই জলে পড়ে যায়। নদীর পারে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রামরত বিনায়ক এ অবস্থা দেখে তারাকে জল থেকে তুলে উদ্ধার করেন। এরপর মাঝে মাঝেই তাদের দেখা হতে থাকে। বিনায়কের মাতা মায়াদেবী বিষয়টা বুঝতে পারলেন এবং তাঁরই নির্দেশে তারা বিনায়কের বাড়ী মায়ের কুমারী ব্রতে কুমারী ভোজনের নিমন্ত্রণ পেল, সে শুভ্রবস্ত্রে বিনায়কের বাড়ীতে গেলে পুত্রের ইচ্ছানুসারে মায়াদেবী তারাকেই প্রথম বরণ করেন। বিদায়ের সময় তারা দুর্গের দিকে তাকিয়ে তার পুরানো বাসস্থানের শোভা দেখে পূর্বকথা স্মরণ করে কাতর হ'য়ে পড়ে ও একটি বৃক্ষতলে বসে একমনে জলরাশির দিকে তাকিয়ে কাঁদতে থাকে, যে পুরানো স্মৃতি ছিল সুখকর, আজ তাই দুঃখময়। সেসময় বিনায়ক সেখানে আসে এবং তারার মনের কথা বুঝতে তাঁর এতটুকু দেরী হয় না; সে তাই তারার কাঁধে হাত রেখে তারার মনের সুপ্ত ভালবাসার সম্মতি জানায়। তারাও ধরা দেয়। এখানেই উভয়ের মিলনে কাহিনীর যবনিকা টানেন লেখিকা।

'প্রতিশোধ' গল্পটিতে যদিও প্রণয়ের কথা আছে, কিন্তু এ গল্পে প্রণয়ে ব্যর্থতা ত্যাগের রূপ নিয়েছে। অনন্তসিংহ লীলার পিতার বন্ধু। লীলা শৈশবেই পিতৃমাতৃহীনা হয়ে মাতুলালয়ে পালিতা। দুই বন্ধুর ইচ্ছানুসারে শৈশবেই অনন্তসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহের সঙ্গে লীলার বিবাহের কথা পাকা হয়ে আছে। লীলা শৈশব অতিক্রান্ত করে যৌবনে পা দিতেই অনন্তসিংহ ঠিক করলেন লীলাকে মাতামহল থেকে নিয়ে আসবেন এবং পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবেন। অমরসিংহ শারীরিক অসুস্থতার জন্য ভাই অজয়সিংহকে নদীতীরে

লীলাকে নেবার জন্য পাঠায়। শৈশবের অমরসিংহকে লীলার মনে নেই, সে তাই অজয়সিংহকেই অমরসিংহ মনে করে নিল। সুপুরুষ অজয় সিংহ সহজেই লীলার মনে আশ্রয় করে নিল। কিন্তু অমরসিংহকে দেখবার পর লীলা ভুল বুঝতে পারল। শ্রীহীন অমরসিংহ কিন্তু আর লীলার মনে জায়গা করে নিতে পারল না। কারণ রাজপুত রমণী, একবার কোনো পুরুষকে মন দিলে ফিরিয়ে নিতে পারে না। এ ব্যাপারে লীলা প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ল। শুধু একা লীলা নয়, অজয়সিংহও লীলার প্রতি আকৃষ্ট। তাই বিবাহের কয়েকদিন আগেই অজয়সিংহ গত্যন্তর না দেখে বিদ্রোহ দমনের ছলে পিতার কাছে অনুমতি নিয়ে চলে যেতে চাইল। বিদায়ের আগের দিন রাত্রে বাগানে লীলা ও অজয়ের কথোপকথন আড়াল থেকে শুনে অমরের বুঝতে একটুকুও অসুবিধা হলো না যে লীলা ও অজয় উভয় উভয়কে ভালবাসে। পরদিন সকালে অমর লীলাকে ডেকে পাঠালো এবং পূর্বদিনের তাদের সবকথা শুনেছে একথাও স্বীকার করলো। তাই সে তার সবচেয়ে প্রিয় লীলাকে, যে ছিল তার শৈশবের বাগদত্তা, অজয়ের হস্তে সমর্পণ করে নিজে অসুস্থ দেহেই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে বিদায় নিল। যেহেতু লীলা তার বাক্‌বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি সেই কারণে অমর নিজেকে সুখ থেকে বঞ্চিত করে চিরবিদায়ের পথ বেছে নিয়ে লীলার উপর তার সত্যিকারের ভালবাসার প্রতিশোধ নিল। এখানেই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখিকা।

শ্রীযুক্তা সরোজকুমারী দেবী তাঁর এই ক্ষুদ্রগল্প ও কাহিনী গ্রন্থে যে গল্প ক'খানি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তা বিভিন্ন স্বাদের। ইংরাজী সাহিত্য থেকে অনুবাদিত একটি গল্প এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে "শাপেনর"। এ'টি একটি অদ্ভুত রকমের একেবারে ভিন্ন স্বাদের যেখানে দু'জন রোগী যথাক্রমে মিস টরনার এবং মিঃ আর্মিটেজ যারা দু'জনেই লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ডাক্তার সার সিডনি হ্যারিসনের চিকিৎসাধীন এবং এদের দু'জনকেই ডাক্তার বলেন যে তাঁদের আয়ুষ্কাল আর মাত্র ছয় মাস। মৃত্যু সামনে জেনেও ঘটনাক্রমে তাঁরা দু'জন ক্ষণিকের আনন্দ, সুখ, দাম্পত্য জীবনের স্বাদ গ্রহণের আশায় প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন এবং দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। কিন্তু এক অদ্ভুত পরিবর্তন, শুধুমাত্র সংবাদপত্রে একটি সংবাদ, তাঁদের দাম্পত্য জীবন ক্ষণস্থায়ী নয়, দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। তাঁরা উভয়ে কজম্বোতে বিবাহ করে এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে খবরটি পায়,

ডাঃ হ্যারিসনের বাতুলালয়ে মৃত্যু হয়েছে। বেশ কিছুদিন থেকেই ডাঃ হ্যারিসন মস্তিষ্ক বিকৃতির রোগে ভুগছিলেন এবং তাঁর সমস্ত রোগীর সম্বন্ধেই তিনি একই মন্তব্য করেছেন বিগত ছয়মাস ধরে তা হোলো, তারা হৃদরোগের কারণে অসুস্থ এবং তাদের আয়ুমাত্র ছয়মাস। উক্ত মিস টরনার এবং মিঃ আর্মিটেজ উভয়েই এই বিধান শুনে মনদুঃখে জাহাজে পাড়ি দেবার সময় সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় এবং এই সূত্র ধরেই উভয়ের যোগাযোগ। এবার তাঁরা উভয়েই চিন্তামুক্ত হয়ে সংসার করতে লাগলেন।

লেখিকার গল্পগুলিতে প্রণয়ের সবক্ষেত্রেই জয়জয়কার। প্রণয়ের নির্ভেজাল গল্প যথাক্রমে 'হারজিত', 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এবং 'প্রেমের জয়'। উক্ত গল্প তিনটিতে প্রণয়ের কথা, নারী-পুরুষের প্রেমের কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনটিই ভিন্ন স্বাদের।

'হারজিত' গল্পে ব্যর্থ প্রেমিক সুশীলের মুখে তার ব্যর্থ প্রেমের গল্প শুনে বন্ধু বিনয় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে এবং সাথে সাথে তার বন্ধুর প্রেমিকা নলিনীর প্রতি ক্রোধবশতঃ সুশীলের ব্যর্থ প্রেমের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনয় নলিনীর সঙ্গে প্রেমিকের অভিনয় করে তার মন জয় করবার চেষ্টা করে। কিন্তু অভিনয় করতে করতে একদিন তা বাস্তবরূপ নেয়। পরপর সাতজনকে প্রেম প্রত্যাখ্যান করে নলিনী এবার বিনয়ের অভিনয়ে সত্যিসত্যিই তার প্রেমে পড়ে যায়, বিনয়ও অভিনয় করতে করতে কখন নলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, প্রতিশোধ নেবার কথা তাই ভুলেও যায়। নলিনীর বাবা শ্যামাপদবাবু উভয়ের মধ্যে বিবাহ দিতে রাজীও হন। সুশীল নিজে প্রেমে ব্যর্থ হলেও বন্ধু যে সেখানে জিততে পেরেছে এতেই তার নিজের জিৎ মনে করে এ বিবাহে মত দেন এবং দামী উপহার সমেত সক্রিয় অংশগ্রহণও করেন।

"মধুরেণ সমাপয়েৎ" গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পত্রের মাধ্যমে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রেমের কাহিনীর বর্ণনা। পত্রগুলি হোলো—যামিনীকে লেখা লীলার, শরতকে লেখা শিশির কুমারের। প্রেমের কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা যথাক্রমে শিশির কুমার এবং লীলা। লীলা গোবিন্দপুর থেকে যামিনিকে যথাক্রমে—২ শে ডিসেম্বর, ১৫ই জানুয়ারী, ৪ঠা মার্চ, ১৫ই এপ্রিল অর্থাৎ চারখানি পত্রে শিশির কুমারের সহিত প্রণয়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। বি. এ.

পাশ শিক্ষয়িত্রী লীলা এলাহাবাদের স্কুলের চাকুরী ছেড়ে গোবিন্দপুর গ্রামে বিন্দুদিদির বাড়ীতে এসে বন্ধু যামিনীকে তার পত্রে জানায় গ্রামের সুন্দর পরিবেশ, শিশির কুমারের সঙ্গে পরিচয় এবং অবশেষে প্রেমের পরিণতি বিবাহ। ঠিক একই রকমভাবে শিশির তার বন্ধু শরতকে যথাক্রমে—২৪শে ডিসেম্বর, ১০ই জানুয়ারী, ২৫শে মার্চ, এবং সর্বশেষ বোম্বাই হোটেল থেকে অর্থাৎ চারখানি পত্রের মাধ্যমে গ্রাম্যচাষার মেয়ের ছদ্মবেশের আড়ালে পার্শ্ববর্তী খামারের কর্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী মিত্রের দৌহিত্রী লীলার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, অসুস্থ থাকাকালীন লীলার সেবায় মুগ্ধ হওয়া এবং পরে লীলার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে উভয়ে প্রেমে আবদ্ধ হয়ে পরিণতি স্বরূপ শতবাধা অতিক্রম করে মিলনের কথা জানায়।

'প্রেমের জয়' গল্পে লেখিকা প্রেমের প্রাধান্যকে স্বীকার করে তাকে জয়ী করেছেন। প্রতাপের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

"দাঁড়াও মীরা, আমিও আসিতেছি"[১১০]

দস্যু প্রতাপ তার দস্যু বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে তারই দস্যু সঙ্গীদের সহায়তায় মীরার সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবনে ফিরে এল, যার একটাই কারণ মীরার ভালবাসা। তাই লেখিকার কলমে প্রকাশ পেয়েছে,

"এ ধরণী প্রেম মন্ত্রে ঘুরে নিরন্তর
এ জগতে সর্বজয়ী প্রেম শ্রেষ্ঠতর।"[১১১]

সূত্র নির্দেশ

১. 'বালক' পত্রিকা বৈশাখ-চৈত্র, ১২৯২, 'আশ্চর্য্য পলায়ন', পৃঃ ৯৬
২. 'বালক' পত্রিকা বৈশাখ-চৈত্র, ১২৯২, 'আশ্চর্য্য পলায়ন', পৃঃ ৯৯
৩. 'বালক' পত্রিকা বৈশাখ-চৈত্র, ১২৯২, 'আশ্চর্য্য পলায়ন', পৃঃ ১২৩
৪. 'বালক' পত্রিকা বৈশাখ-চৈত্র, ১২৯২, 'আশ্চর্য্য পলায়ন' পৃঃ ১২৪
৫. 'দীপ নির্বান', স্বর্ণকুমারী দেবী, পরিশিষ্ট, Opinion of the Press, পৃঃ 1
৬. 'দীপ নির্বান', স্বর্ণকুমারী দেবী, পরিশিষ্ট, Opinion of the Press, পৃঃ 1

৭. 'ছিন্নমুকুল' স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ ২৩৫
৮. 'ছিন্নমুকুল' স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ ২১৮
৯. 'ছিন্নমুকুল' স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ ২৩৪-২৩৫
১০. 'ছিন্নমুকুল' স্বর্ণকুমারী দেবী, উপসংহার, পৃঃ ২৩৭
১১. 'দীপনির্বাণ' স্বর্ণকুমারী দেবী, (দ্বিতীয় সংস্করণ) পরিশিষ্ট, Opinion of the Press, পৃঃ 6-7
১২. 'স্নেহলতা' স্বর্ণকুমারী দেবী, দ্বিতীয় ভাগ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩০
১৩. 'স্নেহলতা' স্বর্ণকুমারী দেবী, দ্বিতীয় ভাগ, নবম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৬
১৪. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' 'স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় বাণী রায়-এর আলোচনা হইতে সংগৃহীত।
১৫. 'বিদ্রোহ', স্বর্ণকুমারী দেবী, পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৭৬
১৬. 'বিদ্রোহ' স্বর্ণকুমারী দেবী, একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭৬-৭৭
১৭. 'ফুলের মালা', স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থাবলী, বিংশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৪২-১৪৩
১৮. 'ফুলের মালা', স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থাবলী, উপসংহার, পৃঃ ১৬৫
১৯. 'ফুলের মালা', স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থাবলী, উপসংহার, পৃঃ ১৬৬
২০. 'ফুলের মালা', স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থাবলী, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১২১
২১. 'ফুলের মালা', স্বর্ণকুমারী দেবী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১১৫
২২. 'অশোকা', প্রসন্নময়ী দেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পঃ ১৫
২৩. 'অশোকা', প্রসন্নময়ী দেবী, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৩-২৪
২৪. 'অশোকা', প্রসন্নময়ী দেবী, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৬
২৫. 'অশোকা', প্রসন্নময়ী দেবী, দশম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৮
২৬. 'অশোকা', প্রসন্নময়ী দেবী, একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৯-৫০
২৭. 'অশোকা', প্রসন্নময়ী দেবী, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৬
২৮. 'অশোকা', প্রসন্নময়ী দেবী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬২
২৯. 'শুভবিবাহ', শরৎকুমারী চৌধুরানী, চিত্রাদেবের ভূমিকা হইতে পৃঃ ৪
৩০. 'শুভবিবাহ', শরৎকুমারী চৌধুরানী, চিত্রাদেবের ভূমিকা হইতে পৃঃ ৪
৩১. 'শুভবিবাহ', শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ ৯০
৩২. 'শুভবিবাহ', শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ ১-২

৩৩. 'শুভবিবাহ', শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ ৭
৩৪. 'শুভবিবাহ', শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ ৩০-৩২
৩৫. 'শুভবিবাহ', শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ ৯৬-৯৭
৩৬. 'শুভবিবাহ', শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ ১০২
৩৭. 'শুভবিবাহ', শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ ১০৩
৩৮. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ২ (স্তবক-১)
৩৯. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ৪-৫ (স্তবক-২)
৪০. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ৬-৭ (স্তবক-২)
৪১. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ৯ (স্তবক-৩)
৪২. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ১২ (স্তবক-৩)
৪৩. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ১৩ (স্তবক-৪)
৪৪. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ১৫ (স্তবক-৪)
৪৫. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ২৩ (স্তবক-৬)
৪৬. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ১৯ (স্তবক-৫)
৪৭. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ২০ (স্তবক-৫)
৪৮. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ২৬ (স্তবক-৬)
৪৯. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ২৭ (স্তবক-৬)
৫০. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ২৯ (স্তবক-৭)
৫১. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ৩১ (স্তবক-৭)
৫২. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ৩২ (স্তবক-৮)
৫৩. 'কনক ও নলিনী', 'বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ৩৭ (স্তবক-৮)
৫৪. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ৩৯ (স্তবক-৮)
৫৫. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ৪১ (স্তবক-৮)
৫৬. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ৪৩ (স্তবক-৮)
৫৭. 'কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পৃঃ ৪৫ (স্তবক-৮)
৫৮. 'বনবাসিনী', মানকুমারী বসু, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র, ১২৯৫, পৃঃ ১৪৫
৫৯. 'বনবাসিনী', মানকুমারী বসু, প্রথম পরিচ্ছেদ, বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র, ১২৯৫, পৃঃ ১৪৪

৬০. 'বনবাসিনী, মানকুমারী বসু, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র, ১২৯৫, পৃঃ ১৪৮

৬১. 'বনবাসিনী', মানকুমারী বসু, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র, ১২৯৫, পৃঃ ১৫০

৬২. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, ১৯৮৪, বাংলা ঢাকা একাডেমী, থেকে সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা হইতে, পৃঃ ৭—৮

৬৩. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ১১৯

৬৪. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ১৩২

৬৫. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ১৩৩

৬৬. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ১৪৪

৬৭. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ১৮০—১৮১

৬৮. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ৩১৩

৬৯. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ৫০

৭০. রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ৮৩

৭১. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ৮৫

৭২. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ৮৯

৭৩. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ১০৯

৭৪. 'রূপজালাল', ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ২৭১—২৭২

৭৫. 'রূপজালাল', 'ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ২২২

৭৬. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, সম্পাদিত গ্রন্থের পরিচিত শিরোনাম, শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩—৪

৭৭. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ২

৭৮. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ২—৩

৭৯. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৩—৪

৮০. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, দশম অধ্যায়, পৃঃ ১২৭

৮১. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, নবম অধ্যায়, পৃঃ ১২০
৮২. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ ৩৯—৪০
৮৩. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৪—৫
৮৪. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৫
৮৫. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ২৬
৮৬. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ২৭
৮৭. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৩১
৮৮. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ৫৪
৮৯. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ৯৪
৯০. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ ৯৯
৯১. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, ভূমিকা হইতে সংগৃহীত, Western Influence in Bengali Literature, পুস্তকের পৃঃ ৩১৩
৯২. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩
৯৩. 'মনোরমা' হেমাঙ্গিনী দেবী, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩—৪
৯৪. 'মনোরমা' হেমাঙ্গিনী দেবী, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯
৯৫. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৩
৯৬. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২০
৯৭. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৪

৯৮. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৯
৯৯. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৯
১০০. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৭
১০১. 'মনোরমা', 'হেমাঙ্গিনী দেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৮২
১০২. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৮৫
১০৩. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯২—৯৩
১০৪. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯৩
১০৫. 'মনোরমা', হেমাঙ্গিনী দেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯৩
১০৬. 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প', সরোজকুমারী গুপ্তা, ভূমিকা, পৃঃ ৩
১০৭. 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প', সরোজকুমারী গুপ্তা, 'ভুল', পৃঃ ৮—৯
১০৮. 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প', সরোজকুমারী গুপ্তা, 'বিসর্জন' পৃঃ ১০২
১০৯. 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প', সরোজকুমারী গুপ্তা, 'অদৃষ্ট', পৃঃ ১২৫
১১০. 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প', সরোজকুমারী গুপ্তা, 'প্রেমের জয়', পৃঃ ২৯৯
১১১. 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প', সরোজকুমারী গুপ্তা, 'প্রেমের জয়', পৃঃ ৩১৬

পঞ্চম অধ্যায়

রসসাহিত্যের ধারা

কাব্য ও কবিতা

সৃষ্টিশীল বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের জন্মলগ্ন থেকেই মানুষজন ইতিবাচক সৃষ্টিকর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে সমাজ সংসার দুনিয়াদারির বৃহত্তর জনপ্রবাহের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সামাজিক দায়বদ্ধতার হাতে হাত রেখে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক দায়বদ্ধতা হোলো পাঠকের আবেগময় চেতনার পরিধিকে বিস্তৃত করা এবং তার সংবেদনশীল হৃদয়াবেগকে নতুন নতুন ভাবে সংগঠিত করা। সমস্ত সাহিত্য শিল্পেই সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক, আর্থ সামাজিক আন্দোলনের আলোড়ন এবং গণতান্ত্রিক মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে। বাঙলা সাহিত্যের কাব্যের ক্ষেত্রেও-চর্যাপদ বা সান্ধ্যভাষার কাল ও তৎপরে মঙ্গলকাব্যের বিস্তীর্ণ সময়ধারার সাথে পা মিলিয়ে চললে দেখা যাবে যে, সাহিত্যে কবিতা কোনদিনই তৎকালীন মানবের চিন্তা-চেতনা, সমাজসংসারের ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভালাভ সম্পৃক্ত অবস্থা থেকে নিতান্ত দূরে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেনি। ঐশ্বরিক শক্তি, দেব-মানবের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দেবদেবীর প্রেমলীলার সবিস্তার বর্ণনার পাশাপাশিও ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের জীবনযাপন, সংগ্রাম, সমাজসংসারের ছেঁড়াখোঁড়া দুঃখের মানুষের মেরুদণ্ড সিধে করে দাঁড়ানোর কাহিনীও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রামায়ণ, মহাভারত নির্ভর কবিতা ও মঙ্গল-কাব্যের ছায়া কিছুটা ম্লান হয়ে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সর্বগ্রাসী দাপটে কবি সাহিত্যিকগণ আদিরসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন। উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন আধুনিক ভাবভাবনার রূপকার। তাঁর কাব্য এবং মঙ্গলকাব্যের যুগের যবনিকা টেনে বাঙলা সাময়িকপত্রের প্রকাশ হোলে তা সমাদৃতও হোলো। বাঙলাসাহিত্যের কাব্যজগতে চতুর্দশপদী কাব্য উপহার দিলেন কবি মধুসূদন। সমগ্র কাব্যজগতে তাঁর কাব্য নতুনত্ব এনে

দিয়েছে, যার কোন পূর্বাপর ধারাবাহিকতা নেই। কবি রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে', কবি হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' সমসময়ের অ'দ্রিত কবিতা। কবী নবীনচন্দ্রের 'ভারত উচ্ছ্বাস' 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে ইংরাজের কাছে ভারতবাসীর স্বাধীনতা হরণের দুঃখ-ক্ষোভ, গ্লানিবোধ মানুষকে আলোড়িত করতে পেরেছে। বাংলা কাব্যজগতে মঙ্গলকাব্যিক সামাজিক কাঠামোর ভিতর ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভবের সংবেদনের রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করেছেন কবি বিহারীলাল।

উনবিংশ শতকের সাহিত্যজগতে নারীর প্রবেশ ঘটে বলতে গেলে এ-শতাব্দীর শেষের দিকের তিন-চার দশকে। যোগাযোগের মাধ্যম ছাড়া কোন ধ্যান-ধারণাই কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। তাই সূচনাকালে কয়েকজন উদারপন্থী ব্যক্তিত্ব নারীকে তার যুগযুগান্ত সযত্নে লালিত সংস্কার, বিধিনিষেধগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করলেন। তাঁরা পত্র-পত্রিকাকে মাধ্যম করে মহিলাদের জ্ঞানবৃদ্ধি প্রসারের দায়িত্ব নেন। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বামবোধিনী' (১৮৬৩) এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্তের অবলাবান্ধব (১৮৬৯) মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হলো। কিন্তু প্রশ্নটা এই যে, এসব পত্রিকার সম্পাদনার ভার অর্থাৎ পুরো কাজটাই পুরুষের, তাই গুটিকয়েক মহিলার লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য মহিলা লেখিকার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'বামাবোধিনী' পত্রিকার রৌপজয়ন্তী সংখ্যায় (১৮৮৭) ষোলজন লেখিকার নাম পাওয়া যায়, যদিও তাঁরা সবাই ছিলেন সে যুগের আলোকপ্রাপ্ত ব্রহ্মপরিবারের।

পরবর্তী সময়ে মহিলারা পত্রিকা সম্পাদনার কাজে হাত দিলেন এবং আমরা জানি যে, "ভারতী" পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বভার মূলতঃ স্বর্ণকুমারী দেবীর উপর ছিল অর্থাৎ পত্রিকার বয়সকালের বেশীরভাগ সময়টাই 'ভারতী'-র পাতায় স্বর্ণকুমারীদেবীর গল্প, উপন্যাস, কাব্য নাট্য, কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। তদানীন্তন বেশ কয়েকজন মহিলা কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে 'ভারতী'-র পাতায়। এইসব মহিলা কবিদের মধ্যে কয়েকজনের রচিত দু-একটি কাব্য-কবিতা গ্রন্থ নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। এঁরা হলেন অনঙ্গমোহিনী দেবী, অন্নদাসুন্দরী দেবী, ইন্দুমতী দাসী, কামিনীসুন্দরী দাসী, কৃষ্ণকামিনী দাসী এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

অনঙ্গমোহিনী দেবী

শ্রীযুক্তা অনঙ্গমোহিনী দেবী ছিলেন ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্যের কন্যা। তাঁর রচিত কবিতা তদানীন্তন সময়ে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে 'কণিকা', 'শোকগাথা', 'প্রীতি'। এরমধ্যে বর্তমান আলোচ্য বিষয় 'শোকগাথা' এবং 'প্রীতি' গ্রন্থ দুটি।

'শোকগাথা' গ্রন্থটিতে তেইশটি কবিতা স্থান পেয়েছে—প্রকাশকাল ১৩১৩ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থপ্রারম্ভেই কবি তাঁর আত্মনিবেদনের মধ্যদিয়ে গ্রন্থ মধ্যস্থ কবিতা-গুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন।

নিয়তির নিদারুণ নিয়মাধীনে যে মহাপ্রলয় আমার জীবনে ঘটিয়াছে তাহারই করুণ উচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে কবিতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। এই কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমি আশা করি নাই। কেবল পরম পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের উৎসাহে ও আমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র দেববর্ম্মার যত্নেই 'শোকগাথা' মুদ্রিত হোলো। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও অনুগ্রহ করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধনপূর্বক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এইজন্য এইসকল সজ্জনের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

'শোকগাথা' আমার জীবনের ঘোর বিষাদময়ী ঘটনার ও দীর্ণহৃদয়ের নিদর্শন মাত্র। সুতরাং ইহাতে কাহারও মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া আশা করি না।[১]

লেখিকা এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই তাঁর স্বামী স্বর্গীয় উজির গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে লিখেছেন—

স্বামিন, গিয়েছ স্বরগ পুরে
কোথা গো সে কত দূরে,
... ... (১ম স্তবকের, ১-২ লাইন)
নিয়ে গেছ সুখ আশা,
প্রেম প্রীতি ভালবাসা, (২য় স্তবকের, ৪-৫ লাইন)
... ...
একাকিনী সাথিহীন
জানি না ফুরাবে কবে জীবনের। (৩য় স্তবকের, ৫-৬ লাইন)

দীর্ণ হৃদি বেদনার,

অশ্রুজল বিন্দুমাথা প্রেম-উপহার। (৪র্থ স্তবকের, ৫-৬ লাইন)[২]

যে সমস্ত কবিতাগুলি এ গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে 'আঁখিজল', 'সান্ত্বনা', চির-স্মৃতি', 'বর্ষানিশায়', 'ভালবাসার পরিণাম', 'স্বপ্ন', 'বর্ষাউষায়', 'পরান না যায়', 'বিরহে', 'নিশীথে', 'কল্পনা', 'দিবা অবসান', 'মৃত্যু', 'নীরব', 'মরণ', 'বর্ষায়', 'বসন্তে জ্যোৎস্নায়', নিশীথে ঝটিকা', ''চিরঘুম', 'তরীযাত্রা', 'বিদায়', 'স্মৃতিচিহ্ন', 'সমদুঃখিনীর প্রতি'।

স্বামী বিচ্ছেদের পর জীবনের ঘোর বিষাদময় দিনগুলির কথা অনঙ্গমোহিনী দেবী তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। স্বামীর মৃত্যুতে উভয়ের মধ্যে যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে, তার যন্ত্রণা কবির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আঁখিজলে সে যন্ত্রণা উপশম করবার চেষ্টা করলেও অতীতের সুখ-স্মৃতি স্মরণে তা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয়। কখনও বর্ষানিশায়, কখনও বা নিশীথে মনে পড়ে যায় স্বামীর স্মৃতি। বর্ষানিশায় একাকী কবি কাঁদেন, প্রকৃতির সজল নয়নের সঙ্গে তাঁর নয়ন সজল হয়ে ওঠে।

তাই এ বিজনে, ঝরে দু'নয়নে,

আঁখিজল বিন্দু রাজিরে![৩]

নরনারীর ভালবাসার পরিণাম যদি চিরবিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যই তবে কবির কাছে তা কাম্য নয়।

যে পড়ে তোমার ফাঁদে

সেই জন শেষে কাঁদে,

আকুল অন্তরে,

পাশে যে রয়েছে তোর,

দারুণ বিচ্ছেদ ঘোর,

নাহি বুঝে নরে।[৪]

জাগতিক জগতে স্বামীর অনুপস্থিতি কবিকে আকুল ক'রে দেয়। তাই স্বপ্নে তিনি স্বামীকে পেয়েও যেন খুশী, যদিও তা ক্ষণস্থায়ী তবু তাঁর কাছে তা সুখের।

যেন ইন্দ্র জাল-মায়া,

স্বপনের সেই ছায়া,
রেখে গেছে স্মৃতি দরপণে!
নিদ্রা মম বিনোদন,
এনে দেয় হারা ধন,
কেবলি বিষাদ জাগরণে।[৫]

বর্ষানিশায় যেমন বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কবিকে ব্যাকুল করে, তেমনি বর্ষাউষায়, যে কোনো নিশীথে, দিবা অবসানে, কল্পনার জগতে বিচরণ করতে করতে স্বামী বিরহে বিরহিনী কবির স্বামী-স্মৃতিমন্থনে মন আকুল হ'য়ে পড়ে। তাঁর মনে যে বেদনার সঞ্চার হয়, তা হোলো, একমাত্র মৃত্যু যা প্রিয়জনকে অনেক অনেক দূরে নিয়ে যায়, মৃত্যু যেন পরপারের একটি সম্পূর্ণ নতুন দেশ যেখানে চিরসুখ বর্তমান। তাঁর ব্যথাপূর্ণ হৃদয়ে জেগে ওঠে বাসনা, মৃত্যুর সেই নতুন দেশে যাবার বাসনা, যেখানে গেলে তাঁর প্রিয়জনকে ফিরে পাবেন।

কবে আমি যাব সেই দেশে ;
মৃত্যু বিনা সে পথের,
সাথী নাহি মানবের,
এস মৃত্যু চির সুপ্তি বেশে ;
যদিও করাল তুমি তবু মম প্রিয়।
পরশি মোহিয়ে মোরে সাথে করি নিয়ো![৬]

এই একাকী সঙ্গীহীন নীরব জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালবাসা কবি তাঁর প্রাণের প্রিয় দেবতা স্বামীকে অর্পণ করতে চাইছেন।

নীরবে প্রেমাশ্রু পড়িবেক ঝরি,
নীরবে সে পদে মিশাব প্রাণ![৭]

দীর্ঘ দিবসের পতিবিরহে বিরহিনী শোকের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এ ভার বহন করবার ক্ষমতা তিনি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছেন। তাই কবি চাইছেন, তাঁর সমস্ত ভালবাসা, প্রেম, আঁখিজল, স্বামীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, এসব মনোবেদনাকে বহন করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। বিরহের অবসাদকে বিদায় দিয়ে পরিবর্তে যা বাস্তব, যা তাঁর প্রাপ্য গ্রহণ করবেন শান্ত মনে। বসন্তের জ্যোৎস্না ভরা রাত্রের সুখস্বপ্ন যা জাগরণে কবিকে কাঁদায়, নিশীথে ঝটিকায় যে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে ; মরণ যা প্রিয়জনকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে

দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, রেখে যায় শুধু বুকভরা বিচ্ছেদের যন্ত্রণা—এ সমস্ত কবিকে অত্যন্ত ব্যাকুল ক'রে তোলে। এ ব্যাকুলতাকে আবেগের বশে আর গ্রহণ করতে চাইছেন না কবি। কারণ, সুখস্বপ্ন তাঁর কাছে এখন মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পিছনে ছুটে ক্লান্তির বিষাদই জমে উঠবে, বেড়ে যাবে চিরবিচ্ছেদের, না পাবার যন্ত্রণা। তাই কবি বিদায় চাইছেন,

এল কি বিদায় কাল ?
যাও তবে প্রাণাধিপ।
টুটে যায় স্বপ্ন জাল
নিবু নিবু আশা-দীপ ![৮]

স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতি-মন্দির স্থাপনোপলক্ষে স্মৃতি-চিহ্ন কবিতাটি লিখতে বসে কবি বলেছেন,

মানস নয়ন ভরি, দেখিব গো অনুক্ষণ,
তব রূপ যে হৃদয়স্বামী।[৯]

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবি তাঁর ব্যথার কথা, যন্ত্রণার কথা বলেছেন। কিন্তু সবশেষে বলেছেন, তিনি যে তাঁর এত যন্ত্রণা, এত ব্যথার কথা বারবার বলছেন—এ উপলব্ধি করতে পারবে শুধুমাত্র তিনিই যিনি তাঁর সমদুঃখী।

সখিরে—

কেন প্রাণ কাঁদে মম সদা,
যে জ্বালায় দিন যামি, দহিয়ে আছি গো আমি,
সম দুখি বিনা কভু এ জগতে আর—
কে বুঝিবে, কেন অশ্রু, ঝরে অনিবার।[১০]

কবি তাঁর সমদুঃখীকে মনব্যথা জানাচ্ছেন এই কারণে যে, যদি তাঁর শোকসন্তপ্ত জীবনের কথা শুনে তাঁর সমদুঃখীজন অন্ততঃ একবার অনুভব করেন, যদি কবির শোকগাথা শুনে তাঁর চোখে একফোঁটা জল ঝরে তবে কবি বুঝবেন তাঁর জন্য অন্তত পৃথবীতে একজন আছেন যে তাঁর মনের ব্যথা উপলব্ধি করে ব্যথা অনুভব করছেন।

এই কবিতাগুলি রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী তার স্বর্গীয় স্বামীর চরণে উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁরই স্মৃতিতে গ্রন্থের সব ক'টি কবিতা রচনা করেছেন।

কবির হৃদয় ফলকে যথার্থ শোকগাথা রক্তের অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, তাঁর লেখনীতে তাই প্রকাশ পেয়েছে, তাহারি নকল শুধু এই শোক-গাথা ?[১১]

ভূমিকা লিখতে গিয়ে তাই শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখেছেন,

"মানুষ যখন মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদে, তখন তাহার চোখের জলে সকলেরি প্রাণ ভিজিয়া যায়, উচ্চারিত শব্দ স্বভাবতই শোকের আর্তনাদের অনুরূপ হয়, খুঁজিয়া পাতিয়া কথা জুড়িয়া তাহাকে প্রাণস্পর্শী করাইতে হয় না। এইজন্যই কবির ভাষা এত সরল হইয়াছে। ভাব এত সুবোধ্য এবং মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে এবং কবিতাগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হইতেছে।..."[১২]

অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিত্ব প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর পরবর্তী পুস্তক 'প্রীতি'-কাব্য গ্রন্থেও। একত্রিশটি কবিত্য সম্বলিত এ গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩১৭ বঙ্গাব্দ। কবিতাগুলি যথাক্রমে,

'নিবেদন', 'সাধনা', 'নীরব প্রেম', 'পেয়েছি', 'বাসনা' 'আমার সুখ', 'অদৃষ্ট প্রেম', 'মধুসম্ভাষণ', 'পূর্ণিমামিলন', 'গিয়াছে', 'স্বাপ্নকামনা', 'অশরীরী জাগরণ', 'নিশীথে', 'প্রেমসিন্ধু', 'নিয়তি', 'প্রভাতে', 'ফুল', 'বিজন কুসুম', 'শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ', 'বর্ষায়', 'বর্ষ', 'মরণ', 'বিষাদে', 'পদ্মায়', 'নিরাশায়', 'নববর্ষে', 'মিলন', 'বসন্ত', 'বাঁশী', 'প্রতিকৃতি', 'আমার কবিতা'।

উক্ত কবিতাগুলির মধ্যে নানান স্বাদ লক্ষণীয়,—প্রথমতঃ, স্বামী বিয়োগের বেশ কিছুদিন পরে এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে, নানান দুঃখ ও যন্ত্রণার অনলে নিজেকে দগ্ধ করে অবশেষে কবি যে সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন তা হোলো, পরমেশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন। কবির ধারণা এ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই পরমশান্তি লাভ করা সম্ভব এবং ইহাই মানুষকে করে তোলে মহান ঐশ্বর্য্যে ভরপুর। এ ধরণের কবিতাগুলি যথাক্রমে—'নিবেদন', 'সাধনা', 'নীরবপ্রেম', 'বাসনা', 'অশরীরী জাগরণ', 'নিশীথে', 'প্রেমসিন্ধু', 'নিয়তি', 'বর্ষ', 'নববর্ষে', 'প্রতিকৃতি', 'আমার কবিতা' প্রভৃতি। কবি পরমেশ্বরের কৃপায় যে প্রীতিলাভ করেছেন তাঁর কাছে এর মূল্য অনেকখানি,

সেই প্রীতি অমরার নদী—
প্রবাহিত কর এ অন্তরে।[১৩]

নিজেকে কবি বিধাতার শ্রীচরণে অর্পণ করেছেন,

নারীর জীবন বিধাতার দান, তাঁহার আদেশ-পালি ;
প্রীতির প্রসার অনন্ত অসীম, পর তরে তায় ঢালি।[১৪]

পরমেশ্বরের প্রীতিলাভে কবি যে শক্তির অধিকারিণী হয়েছেন, তারই ফল স্বরূপ তিনি ঐশ্বর্য্যে ভরপুর। তাই তাঁর মনে বাসনা জাগে,

এই জড় ধরা, রুদ্ধ এ আলয়,

ভাঙ্গিব সংগ্রামে যুঝিয়া,

লভি সে সময়ে প্রীতির বিজয় লইব সে দেশ খুঁজিয়া।[১৫]

কবির মনে এ বিশ্বাস তাঁকে উদার, ভয়শূন্য, ভাবনাশূন্য করে তুলেছে তিনি তাই ভাবেন, এ জীবন যদি ক্ষণস্থায়ী, সুখদুঃখ যদি ক্ষণস্থায়ী, তবে তা নিয়ে ভাবনা করা বৃথা,

বৃথা এই স্নেহ প্রীতি, বৃথা এই মান-অভিমান—

বৃথা এই সুখ দুঃখ, বৃথা এই ক্ষণিক পরাণ।

ক্ষণস্থায়ী দেহ নিয়ে কেন এত দম্ভ অহংকার?

ক্ষণিকে নিবিয়া যাবে, ধূলি ভস্মে হয়ে একাকার।[১৬]

বিধাতার কাছে তাই যতটুকু প্রাপ্য তার বেশী আশা করে এবং তা না পেলে দুঃখের হোমানলে জ্বলতে কবি রাজী নন। তাই যতটুকুই তাঁর প্রাপ্য, তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন সাদরে।

'যতটুকু তুমি দিয়েছ বিধাতঃ, সেইটুকু নিয়ে থাকি'[১৭]

মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী। বর্ষ যেমন আপন সময়ানুযায়ী এগিয়ে যায়, কখনও পিছনে ফিরে তাকায় না, তেমনি আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে হঠাৎ প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়ে পড়ে থাকে শুধু ভগ্ন দেহ। তাই কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলতে কবির আর দ্বিধা নেই।

কালস্রোতে ভেসে যাই,

... .

যতখানি থাকে বাকী

কেমনে তা ধরে রাখি

প্রবাহে যে যাবে চলি, আসিবে না আর।[১৮]

বর্ষ যেমন পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে আমন্ত্রণ জানায়, কবিও তেমনি পুরাতনকে অর্থাৎ অতীতকে আঁকড়ে ধরে রেখে আর নিজেকে ভারাক্রান্ত না করে প্রীতির স্পর্শে সবাইকে ভরিয়ে দিয়ে নিজেকে তৃপ্ত করতে প্রয়াসী।

আজি এ মঙ্গলময়

নববর্ষে, স্নেহময়।

তবে স্নেহ বিনিময়ে আর
কি দিব, কি আছে কহ ?
আজি শুধু এই লহ
মঙ্গল কামনা সহ স্নেহ-উপহার-
লহ নববরষের এ গাথা আমার।[১৯]

বিশ্বপ্রেমের মধ্যেই কবি খুঁজে পেয়েছেন পরম শান্তি। তাই আজ তাঁর কবিতা শুধু কল্পনা নয়, শুধু কিছু উপদেশ বাণী নয়, এখানে আশার ছলনা নেই, নিরাশার দুঃখ নেই,—আছে শুধু কামনাবাসনা হীন এক অসীম আনন্দ। কবি তাই মুক্ত কণ্ঠে বলেন,

মুক্ত সুখ-দুঃখ-ভার,
রুদ্ধ জীবনের দ্বার,
ফুরায়েছে প্রীতি আর বিরহের মেলা।
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা॥[২০]

দ্বিতীয়ত, পরমেশ্বরের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করেছেন কবি। কিন্তু সময়ের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর পরম শান্তির অবস্থা থেকে কিছু সময়ের জন্য কখন বেরিয়ে পড়েন বলতে গেলে নিজের অজান্তেই এবং পার্থিব সুখ-দুঃখের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেন নিজেকে। ফলস্বরূপ অতীতের যন্ত্রণা মনকে ব্যথিত করে তোলে, জীবনের ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে পতিহারানোর ব্যথা তাকে ব্যাকুল করে দেয়। কিছু সময় পরে অবশ্য পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি এ মানসিক যন্ত্রণাকে কাটিয়ে ওঠেন। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে কবির কয়েকটি কবিতায়। এগুলি হেলো যথাক্রমে—'পেয়েছি', 'অদৃষ্টপ্রেম', 'মধুসম্ভাষণ, 'পূর্ণিমামিলন', 'গিয়াছে', 'সুপ্তিকামনা', 'বিজন কুসুম', 'মরণ', 'বিষাদে', 'নিরাশায়', 'মিলন'।

উক্ত কবিতাগুলিতে কবির অতীত জীবনের স্মৃতি থেকে পুরোপুরি বিস্মৃত না হতে পারার যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার কথা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য পুরোপুরি বদ্ধ হয়ে না পড়ার জন্য এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতেও তিনি পেরেছেন। একাকীত্ববোধ কবিকে এখনও কষ্ট দেয়—

গেছ চ'লে মোরে একাকিনী হেথা
আঁধারের মাঝে রেখে॥[২১]

কবির মনে তাই আবার কামনা উঁকি মারে ;

ওহে প্রিয়, এস ধরি হাতে-হাতে,
ডুবে যাই মোরা দু'হে একসাথে,[২২]

এই কামনা বাসনাই তাঁর যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তোলে। তাই কবির লেখনীতে প্রকাশ পায়,

হাতের কুসুম রয়ে গেল হাতে—
সুখ গেল যবে ছলিয়া।[২৩]

আবার, সারাদিন আমি কার আশায় কুহকে ভুলি
পথ চাহি থাকি গো বসিয়া।[২৪]

এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই একে কাটিয়ে ওঠেন কবি, উপলব্ধি করেন মূল সত্যকে,

কেন চিত হায়, ভুলাইতে চায়—
(ওগো) আপনারি গড়া ছলনায় ?
বিনোদিতে মন রচিব স্বপন ?
নাই, নাই, তাহে ফল নাই।[২৫]

তৃতীয়ত, প্রকৃতিকে নিয়ে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। প্রকৃতির নানান বিষয়বস্তু অর্থাৎ ঋতু, ফুল, নদী প্রভৃতি সকলকে নিয়ে কবি রচনা করেছেন নতুন স্বাদের কবিতা। এ ধরনের কবিতাগুলি—প্রভাতে, ফুল, বর্ষায়, পদ্মায়, বসন্ত, প্রভৃতি। কালো রাত্রির অন্ধকার ঘুচিয়ে প্রভাত আসে যা ভরিয়ে তোলে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবার মন। কবির কলমেও তাই স্বচ্ছতা আসে।

আজি প্রভাতের বরণে
কুসুমের শোভা ধরিব ;
ঐ মুরতির চরণে
সাধিয়া জীবন বরিব ॥[২৬]

প্রকৃতিকে ভালোবেসে রচনা করেছেন কবি তাঁর কবিতা। প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধের প্রতীক ফুল। ফুলের কোমলতা কবির মনকে দোলা দেয়,

অতি প্রিয় তুমি প্রফুল্লকুসুম
মরি কি কোমল আবরণ ;
তুমি এনে দাও কোমল স্বপন
... ...[২৭]

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবির ভাবনারও পরিবর্তন হয়। কিন্তু ঋতু সকল কবির মনকে দোলা দেয়। তাই বর্ষার আগমনে যেমন কবির মন উজ্জ্বল হয়, তেমনি ঋতুরাজ বসন্তও কবির মনে দোলা দেয়। প্রকৃতিকে যেন সাদরেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবি।

উথলে যমুনা জল,
বহতহি কল কল,
চঞ্চল যামিনী আজি ![২৮]

আবার,

এস ঋতুরাজ,
অনিলের রথ ভরি' চন্দন গন্ধে,—
পীত কিসলয়-কেতন দোলায়ে মন্দে ![২৯]

স্রোতস্বিনী পদ্মা যেন কবির অতি আপনার, তাই তাকে আরো কাছের করে নেন তিনি,

তব স্নিগ্ধ ধারে শুয়ে,—
তপ্ত স্মৃতি নেব ধুয়ে,—
বাসনা বেদনা জ্বালা হবে অবসান[৩০]

প্রকৃতির সমস্ত উপকরণের সঙ্গে একান্ত না হতে পারলে, তাকে আপন করে তার মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে না পারলে বোধ হয় এমন সরল, স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ভাষায় কবিতা রচনা করা যায় না। কবির, রচনায় তাই আবেগের আতিশয্যের পরিবর্তে আছে প্রাঞ্জল ভাষা, আর বিষয়বস্তুর দৃঢ়তা। সেখানে একঘেয়েমির পরিবর্তে আছে নানান স্বাদের বিষয়। কীর্তনের আদলে রচিত হয়েছে তার 'শ্রী রাধার পূর্ব্বরাগ' কবিতাটি,

(ওগো) দেখি নাই যারে, সে কি না আমারে
পাগল করিয়া দিল।[৩১]

এ ছাড়া, 'বাঁশী' কবিতাটি উপভোগ্য, যেখানে রাধার বিরহের প্রকাশ ঘটেছে,

কাঁদে রাধা—ওগো বঁধু, শুধু কেন ছলিতে
মধু-বনে তব বাঁশী গাহে গো ?[৩২]

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর দুটি কবিতা গ্রন্থের কবিতাগুলি স্বল্পপরিসরে আলোচিত হবার পর একথা স্পষ্ট যে, কবির রচনায় প্রাণের স্পর্শ আছে যেখানে

নারী হৃদয়ের বেদনার কথা, ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আর সেই কারণেই কবির রচনার ভাষা এত সরল এবং সুবোধ্য। তাঁর কবিত্ব প্রতিভা প্রশংসার দাবী রাখে।

অন্নদাসুন্দরী দেবী

গ্রন্থকারিণীর 'অবলাবিলাপ' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৭৮ বঙ্গাব্দ (পৃঃ ৩০)। এ গ্রন্থের কবিতাগুলি পর্যায়ক্রমে—বাণীবন্দনা, বিধাতার প্রতি, মাতার প্রতি, পিতার প্রতি, সমবয়স্কার সহিত বিলাপ, সহোদর প্রতি, কালের প্রতি, ভ্রান্তি-মরীচিকা, নয়নের প্রতি, দিবা অবসান, পদ্মিনীর প্রতি, গোধূলি দর্শনে, সন্ধ্যা দর্শনে, রজনী দর্শনে, অমাবস্যা নিশার প্রতি, বিলাপের-প্রতি-ধ্বনির প্রতি, সমীরণ প্রতি, আশার প্রতি, স্মরণের প্রতি, প্রভাত দর্শনে, শিবালয় দর্শনে, মাতৃভূমির নিকট বিদায় যাচ্ঞা ইত্যাদি।

উক্ত কবিতাগুলির বিষয়বস্তুতে যাবার পূর্বে গ্রন্থকারিণী কি কারণে কবিতাগুলি রচনা করেছেন শ্রীহৃদয়শঙ্কর রায় মহাশয়ের লেখা গ্রন্থের ভূমিকার উপস্থাপনে সে বিষয়ে বোঝা যাবে।

অবলাবিলাপের জন্ম-বৃত্তান্ত ভিন্ন ভূমিকায় আমার আর কিছু লিখিবার উদ্দেশ্য নহে। এক দিবস গ্রন্থ-কর্ত্রী আপনার বিষয়-ঘটিত কয়েকটি পদ্যরচনা করিয়া আমাকে দেখিতে দেন। আমি রচনার সরলতা ও মধুরতা প্রত্যক্ষ করিয়া যারপরনাই চমৎকৃত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম এইরূপ আরও কিছু রচনা করিলে ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কন করা হইবে তখনও আমার এরূপ ভরসা হয় নাই। এবং গ্রন্থকর্ত্রীর ইচ্ছা ছিল না, উহা জন-সমাজে প্রচার করেন। কেবল তাঁহার দুর্বিসহ-শোকযন্ত্রণা লাঘবের জন্যই সময়ে সময়ে অল্পাল্প রচনা করিতেন। যদিও মুদ্রাঙ্কন লালসা তখনও আমার বলবতী হয় নাই তত্রাপি রচনা-বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতাম। অনন্তর পুস্তক-রচনা সম্পন্ন হইলে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এতদূর মোহিত হইয়াছি যে আমার এই সামান্য বিবেচনায় বঙ্গ-কামিনী-বিরচিত যে কয়েকখানি পদ্য-গ্রন্থ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছে, বোধহয় সে সকল অপেক্ষা এইখানি কখনও ন্যূন নহে। তবে বলিতে পারি না ইহা আমার ন্যায় সকলের নিকটে আদরণীয় হইবে কিনা।

এই স্থলে অবলা-বিলাপ-জননীর স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে

পারিলাম না। ইনি একজন বিশিষ্ট ভদ্র বংশজা। অতি শৈশবকালে জনক-জননী ও ভ্রাতার নিদারুণ বিয়োগ নিবন্ধন, একান্ত অধীরা ও শোক-সন্তপ্তা হইয়াছিলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার পরিণয়-সংস্কার সম্পাদিত হয়। উহা এক বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তিনি যাতনাময়ী-বৈধব্য-দশায় পতিতা হন। এই নিদারুণ ঘটনার পর রচয়িত্রীর সহোদরা ভিন্ন আপনার দুঃখ বলিবার আর দ্বিতীয় পাত্র ছিল না। এইরূপ কিছুকাল যাইতে না যাইতে কপালক্রমে সহোদরাও তাঁহার নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গ্রন্থকারিণী, এইরূপ উপর্য্যুপরি শোকার্ণবে নিপতিত হওয়াতে নিরন্তর শোক-দহনে দগ্ধীভূত হইতেছেন। উহা যখন অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে, তখন নির্ব্বাপিত অথবা লঘূকৃত করিবার মানসে এই পদ্যগুলি অবসর-ক্রমে ক্রমশঃ রচনা করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যাভিপ্রায় বিন্দুমাত্রও নাই। যদ্যপি সহৃদয় পাঠকগণ ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া বিন্দুমাত্রও সন্তোষ লাভ করেন তাহা হইলেই অভিনব গ্রন্থ রচয়িত্রীর পরিশ্রম সফল হইবে।

১২৭৮, ১৬ই ফাল্গুন। শ্রী হৃদয়শঙ্কর রায়। (পৃঃ বিজ্ঞাপন, ৵, ৯)

উক্ত ভূমিকা থেকেই স্পষ্টতঃ 'অবলাবিলাপ' গ্রন্থে কবি অন্নদাসুন্দরী দেবী তাঁর রচনায় কি বলতে চেয়েছেন। কবি তাঁর রচনায় ভ্রাতা, পিতামাতা, স্বামী, সহোদরা বিচ্ছেদের যন্ত্রণার কথাই প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকটি কবিতায় ভাষার বৈচিত্র্য এনেছেন নানারূপ শব্দচয়নের মধ্য দিয়ে, একই সঙ্গে সরল ছন্দপ্রয়োগে পদ্যের মর্যাদা বাড়িয়ে কবিতার পূর্ণতা এনে দিয়েছেন।

'বাণীবন্দনা' দিয়ে শুরু করেছেন কবি তাঁর গ্রন্থ। শ্বেত শতদলে দেবী ভারত জননীকে বন্দনা করতে গিয়ে দেবীর রূপের মহিমা বর্ণনা করেছেন গ্রন্থরচয়িত্রী। এখানে তাঁর কাব্য রচনার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়,

পক্ক-বিম্ব-ওষ্ঠাধর, জন-মনোলোভা,
নারী না বর্ণিতে পারে সে রূপের শোভা।[৩৩]

আপন মনোবেদনার কথা কবি বিধাতাকে জানিয়েছেন যা বঙ্গনারীরই মনের কথা। তিনি সকলকে হারিয়ে আজ একাকিনী। সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন জীবন তাঁর,

হেন তাপ কেন বিধি, দিলি রে আমারে,
দেখায়ে সে সুখধন ভাসালি পাথারে।[৩৪]

মাতা পিতা উভয়ের বিচ্ছেদ কবিকে আকুল করে তুলেছে। পিতা-মাতার অদর্শন তাঁর কাছে যে কতটা অসহনীয়, সেকথাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়

হে মাতঃ! কোথায় তুমি করিলে গমন!
কতদিন দেখি নাই তোমার চরণ।[৩৫]

আবার,

হে পিতঃ! কোথায় আছ দেহ দরশন
হেরিব নয়ন ভরে তোমার চরণ।[৩৬]

সমবয়স্কার কাছে মনের ব্যথা জানাতে গিয়ে সেই একই মর্ম্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে,

অজ্ঞান যখন আমি; ত্যজিলেন পিতা
পতি-শোকে মা আমার হলো সন্তাপিতা।
... ...
কি আর কহিব মম ললাটের ভোগ
দুঃখেতে করেছে গ্রাস, নাহি সুখ-যোগ।
বৈধব্য-অনলে দগ্ধ এই নিশীদিনে,
তাহাতে চঞ্চল প্রাণ সহোদর বিনে।[৩৭]

সহোদর বিচ্ছেদের ব্যথা কবিকে অত্যন্ত আকুল করে দিয়েছে, অতীতের কথা মনের কোণে উঁকি মারছে, যা আজ স্মৃতি হয়ে কবিকে মনোকষ্ট দিচ্ছে। স্বর্গীয় ভ্রাতার উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, বালিকা সময়ে তাঁর সহোদর বিয়োগ ঘটে, এরপর মাতৃবিয়োগ। বিধাতার এ নিষ্ঠুর বিচার কবির কাছে এত যন্ত্রণাদায়ক যা কচিগাছকে আগুনে পুড়িয়ে দগ্ধ করবার ন্যায়। পিতৃগৃহের পানে চেয়ে কবি বাল্যকালের স্মৃতিতে ফিরে গিয়েছেন; বাল্যকালে যখন এ-গৃহে তিনি মহানন্দে খেলা করতেন, তখন তাঁর দাদা বোনের সঙ্গে আনন্দের ভাগ উপভোগ করতেন। অথচ আজ,

সহোদর-শোক যেন কোটি ভানুদয়,
বিষম কিরণে দগ্ধ করিছে হৃদয়।[৩৮]

ভূমিকাতে উল্লিখিত হয়েছে মাতা-পিতা, ভ্রাতা, স্বামীকে চিরবিদায় দেবার পরও সহোদরা ছিল তাঁর একান্ত আপন যার কাছে কবি মনের সকল যন্ত্রণার কথা বলে শান্তি পেতেন। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সেই সহোদরাও তাঁর কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছেন মৃত্যুর পরপারে। কালের সঙ্গে যুঝে দাঁড়াবার মত শক্তির অধিকারিণী নন কবি, তাই কালের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে নিজের মনোবেদনা ব্যক্ত করেছেন,

সহোদর সহোদরা দিয়াছি সকল ;
দক্ষিণা আছে রে বাঁকি এদেহ কেবল। (পৃঃ ১৩)
... ...
কাঁদাইতে নরকুলে তোমার জনম,
জীবনাশে কিবা ফল অর রে অধম ?[৩৯] (পৃঃ ১৪)

পিতৃ-মাতৃহীনা কবি স্বামীর ঘর বেশীদিন করতে পারেননি। শূন্যময় স্বামী গৃহ ত্যাগ ক'রে তিনি যখন মাতা-পিতা-ভ্রাতা বিহীন পিতার শূন্য গৃহের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন তখন এ শূন্য গৃহের ন্যায় তাঁর হৃদয় যেন শূন্য, অসহায়া মনে হোলো।

নিঃসহায় একাকিনী বিষাদ সাগরে
হায়, বিষাদ সাগরে !
ভাসিতেছি নিরন্তর ; হতাশ অন্তরে
হায়, হতাশ অন্তরে ![৪০]

ধুতুরা ফুলের কাছে মনোবেদনা প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, স্বয়ং দেবতা শিব তোমার সহায়, তুমি তাঁর আদরের বস্তু। অথচ কবি আজ সহায়-সম্বলহীনা, তাঁর কেহই নাই,

দেখ ! রে অনাথা আমি নাহি সুখ-লেশ,
নাথের বিয়োগে ধরি যোগিনীর বেশ।
পতন হইয়া আছি, শোক-পারাবারে,
যতন করিতে কেহ নাহি এ-সংসারে।[৪১]

আপন নয়নযুগলের কাছে কবির জিজ্ঞাসা, শুধু নয়নের জল ফেলে তিনি কি আর সহোদরকে ফিরে পাবেন ?

না। পিতার বংশ প্রদীপও তাই আর জ্বলবে না।

কেনরে কাতর আঁখি দর্শন-তৃষায়,
আশাপথ চেয়ে আছ, চাতকীর প্রায় ?
আর না আসিয়া ভাই দিবে দরশন,
হবে না হবে না আঁখি, তৃষা নিবারণ।[৪২]

পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে গিয়েছেন, রাজ্য সুখ ভোগ থেকে তাই রাম বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু কার দোষে কবি ভ্রাতাকে হারিয়েছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না, সন্ধ্যাদর্শনে একথাই তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছে,

কার বোলে ভাই তুমি ত্যজে রাজাসন,
ব্রহ্মচারী বেশে কোথা করেছ গমন ?[৪৩]

শোকাতুরা কবি তাঁর প্রতিধ্বনির কাছে প্রশ্ন করেন,

তুমিও কি সহোদর হইয়াছ হারা ?
নিকটে এস গো ভগ্নি ! হইয়া আমার
সম-দুঃখী দোঁহে করি অরণ্যে বিহার।[৪৪]

সমীরণকে কবি আবেদন জানিয়েছেন, যদি কখনও তার সহোদরের সঙ্গে দেখা হয় তবে যেন সে বলে যে, তার ভগনী তার জন্য অপেক্ষা করছেন, সহোদর যেন তাঁকে একবার দেখা দেন। ভ্রাতাকে চিনতে যাতে সমীরণের কোনো অসুবিধা না হয়, সেইজন্য কবি তাঁর সহোদরের শারীরিক বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

এইরূপ চিহ্ন তুমি যাঁহার দেখিবা
অভাগীর সহোদর সেই রে জানিবা,[৪৫]

আত্ম-স্মৃতিকে ভৎর্সনা করে কবি বলেছেন, স্মৃতি তোমার কি মৃত্যু নাই। সদাসর্বদা শুধু মনকে দহন কর, প্রিয় সহোদরকে কাছে এনে দাও না, স্মৃতিতে মনন করিয়ে মনোবেদনাকে বৃদ্ধিই কর।

বিগত-ঘটনা লয়ে কর আন্দোলন,
সদা অশ্রু নীরে ভাসে অভাগী-নয়ন।[৪৬]

'শিবালয় দর্শনে' কবিতায় তাই কবি মৃত্যুঞ্জয় দেবতাকে প্রার্থনা জানিয়েছেন,

ত্রিপুরারি ধ্যান করি, হেরিরে নয়ন ভরি,
অগ্রজের নির্ম্মল বদন॥

করো কৃপা আশুতোষ,   হোক মম মন তোষ
হেরে রাঙ্গা-চরণ তোমার ।[৪৭]

যদিও গ্রন্থখানি জুড়ে অধিকাংশ কবিতায় কবি তাঁর ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মনযন্ত্রণাই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু স্বামী বিরহের কথাও প্রকাশ পেয়েছে, যথাক্রমে 'দিবা অবসান', 'পদ্মিনীর প্রতি', 'গোধূলি দর্শনে', 'রজনী দর্শনে', 'অমাবস্যা—নিশার প্রতি', 'আশার-প্রতি' কবিতাগুলিতে।

'দিবা অবসান' কবিতায় সূর্যের সঙ্গে স্বামীর এবং কমলিনীর সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য রেখে বলেছেন,

দিবা অবসান প্রায় , ভানু অস্তাচলে যায়,
সরোবরে কাঁদে কমলিনী,[৪৮]

পদ্মিনী প্রভাতে তাঁর পতি প্রভাকরের উদয়ে তাঁকে দর্শন করে সতেজ হয়ে ওঠে এবং আনন্দে উজ্জ্বল হয়। স্বামী বিরহে বিরহিনী আজ কিন্তু কবি এ সুখ থেকে বঞ্চিত। তিনি তাই পদ্মিনীকে তাঁর মনোবেদনা জানাচ্ছেন,

আছ ভালো লো পদ্মিনী ! শুন অনাথা-কাহিনী,
তুমি নহ সমান আমার[৪৯]

গোধূলি ও রজনী দর্শনে কবির মনোবেদনা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে,

ঝরে কমল-নয়ন,   শুষ্ক সুচারু-বদন
মনে জপে প্রাণেশের কথা।[৫০]

এবং,

দিনেশ-বিরহে,   কিছু নাহি রহে,
এ মহী-মণ্ডল-শোভা।[৫১]

অমাবস্যা রাত্রের নিশি যেমন অন্ধকার অর্থাৎ কালো থাকে এবং তা দেখে মনে হয় এ-নিশি শোকের বসন পরেছে, কোথাও আলো নেই, শুধু ঘন-আঁধারের মাঝে ঝিঁ ঝিঁ পোকার কাতর রোদন, তেমনি কবির জীবনও পতি বিনে অমাবস্যা রাত্রের মতে অন্ধকার।

আমার সমান দশা যামিনী তোমার,
বৈধব্য-যন্ত্রণানল, দহে অনিবার।[৫২]

আঁধার, যন্ত্রণা, ব্যথা থেকে দূরে সরে থাকবার জন্য কবির কাছে এখন প্রভাতই একমাত্র কাম্য। মানুষের জীবনের প্রভাত হয়ে ওঠে প্রকৃতির মতো

স্বচ্ছ, সুন্দর ও সুখময়। এখানে প্রভাত অর্থে কবি তাঁর শৈশব সময়কে চাইছেন,

সেই সুখময়, শৈশব-সময়,
হায় রে! হয়েছে শেষ ॥[৫৩]

কবি আশা করে শুধু বিফল মনোরথই হয়েছেন, এই কারণে তিনি এখন হতাশা থেকে মুক্ত হতে চাইছেন।

কবে বা আশিয়া প্রিয় দিবে দরশন,
কবে চিন্তানল হতে জুড়াইবে মন?
আর না হইবে পূর্ণ আমার এ আশ,
হায় রে ফুরাবে কবে দারুণ-হতাশ![৫৪]

সবশেষে, মাতৃভূমির কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। জীবনের চলার পথে প্রিয়জনদের হারিয়ে একাকী হতাশ জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য কবি একান্ত আগ্রহী

পিতামাতা ভ্রাতা স্বামী, সকলে করেছি আমি,
কালের কবলে বিসর্জন।
... ...
কবে সিদ্ধ হবে লোক, শেষ হবে সব শোক,
শেষ হবে নয়নের জল?
... ...
প্রিয়তমা জন্মভূমি! জনমের মত তুমি
দেহ মোরে বিদায় বিদায়![৫৫]

ইন্দুমতী দাসী

উনবিংশ শতকের মহিলা কবিগণের মধ্যে ইন্দুমতী দাসীর নাম সর্বজনবিদিত না হলেও সুপরিচিত। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'দুঃখমালা'—প্রকাশকাল ১২৮০ বঙ্গাব্দ। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৩০৩ বঙ্গাব্দে উক্ত কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ত্রিশ পৃষ্ঠার কাব্যগ্রন্থটির কাব্যের বিষয়বস্তুর কিছুটা আভাষ দিয়েছেন কবি তাঁর মাতৃদেবীকে লেখা কয়েক পংক্তিতে, উক্ত উদ্ধৃতি গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত হয়েছে।

শ্রীমতী-মাতৃদেবী

শ্রীচরণাম্বুজেষু

......

'...অনেক সুখানুভব করিতেছি বটে, কিন্তু এখনও আমার সেই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শিশু সহোদরটী হৃদয়ে সর্বদাই জাগরিত রহিয়াছে। অনেক দেবারাধনায় সেই ভ্রাতাটি লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু অকালে যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা আর কি বলিয়া শেষ করা যাইতে পারে? তবে মানুষের মন শোকে অভিভূত হইলে, চুপ করিয়া থাকিলে বড়ই কষ্টকর হয়; আত্মীয় স্বজনের নিকট মনোবেদনা প্রকাশ করিলে, প্রাণ অনেক শীতল হয়। সেইজন্য আমি এই ক্ষুদ্র লেখনী দ্বারা কিঞ্চিৎ দুঃখপ্রকাশ করিতেছি। যদি আপনি এবং পাঠক মহাশয়গণ সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার। আপনার অনুগ্রহকাঙ্ক্ষিনী ও স্নেহাভিলাষিণী কন্যা

সন ১২৮০ সাল, কলিকাতা শ্রীমতী ইন্দুমতী

উক্ত নিবেদন থেকে স্পষ্টতঃ যে কবি তাঁর সহোদরের সঙ্গে শিশুকালে যে চিরবিচ্ছেদ ঘটে, সেই বেদনা ভুলতে পারছেন না এবং এ মনোবেদনা কবিকে সর্বদাই ভারাক্রান্ত করে তোলে যা তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। কবি, প্রভু অন্তর্যামীকে জানাচ্ছেন,

যদিও অদৃষ্টগুণে, হারায়েছি ভ্রাতা ধনে,
শোকার্ত্ত দেখিয়া সবে দয়া কি হল না পিতঃ!
হইল বৎসরত্রয়, সবে শয্যাগত প্রায়,
যেরূপ কাতরা মাতা, তাহা হে বর্ণনাতীত।[৫৬]

সমস্ত কাব্য-গ্রন্থেই কবি তাঁর সহোদর বিচ্ছেদের কথা বলেছেন, যার বিরহে তাঁর মাতা-পিতার মনোকষ্ট। কবি তাই অন্তর্যামীকে জানাচ্ছেন—

সে ধনে বঞ্চিত হয়ে, সদাই অসুখে রয়ে,
অনন্ত যাতনানলে জ্বলিছে হৃদয়।
দয়া করে দেহ পুনঃ, জুড়াক তাপিত প্রাণ,
সুস্থির হউন পিতা হেরিয়া পুত্রের মুখ।[৫৭]

নিজের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে কবির মনে হয়েছে তিনি বোধহয় এমন কোন পাপ করেছেন, যার কারণে তাঁকে এ শোক ভোগ করতে হয়েছে,

করিয়াছি কত পাপ, তাই পাই হেন তাপ,
জন্মান্তরে কাকে বুঝি ভ্রাতৃহীন করেছি।
লয়ে কার ভ্রাতাধন, দিয়া সুখ বিসর্জ্জন,
জন্মের মতন কারে শোকনীরে ফেলেছি।[৫৮]

ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ কবিকে আকুল করে বারবার। এ বিচ্ছেদ তাঁর জীবনে শোকের ছায়া এনেছে। তিনি তাই অন্তর্যামীকে জানাচ্ছেন, এত শোক সহ্য করে এখনও কি করে তিনি বেঁচে আছেন,

আমার কেবল হায়, বিফলে জীবন যায়,
কি ফল হইবে বল করিলে রোদন।
সে যে প্রাণতুল্য ধন, তাহারে ছেড়ে এখন,
কেমনে জীবন প্রভু এখনও রয়েছে।[৫৯]

কাব্যগ্রন্থটিতে চার অধ্যায় অর্থাৎ বিভাগে, যথা—প্রথমভাগে, ১-১০ পৃষ্ঠার অংশে প্রভু অন্তর্যামীর কাছে কবির ব্যথার প্রকাশ। ভ্রাতৃবিচ্ছেদে দীর্ঘ সময়ের জন্য কবি যে মনোকষ্ট পেয়েছেন, সেইকারণে অন্তর্যামীকে তাঁর জিজ্ঞাসা—

পাষাণ বলিয়া তাই, ছাড়িয়া প্রাণের ভাই,
অনাসে সে ধন ছেড়ে বর্ষত্রয় হইল।
জীবন বিহনে দেহ, ধরিতে পারে কি কেহ,
কি করিয়া প্রাণ প্রভু এত দিন রহিল।[৬০]

দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ ১১—১৬ পৃষ্ঠার অংশটিতে কবি তাঁর সহোদরের কাছে মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন। স্বর্গগত ভ্রাতাকে তিনি বলছেন যে, আমার সাধ ছিল, তোমাকে নিয়ে আমার জীবন সুখে কাটাব। কিন্তু তোমার এ অকালে চলে যাওয়ায় সে সাধ আর পূর্ণ হোলো না। তোমার শোকে আজ মাতা-পিতা মুহ্যমান, তুমি একবার এসে দেখ,

যেরূপ অধীরা থাকেন মাতা,
বারেক আসিয়া দেখ রে ভ্রাতা।
পিতা মাতা শোক জ্বলে অনল,
পুত্রশোক মৃত করে প্রবল।[৬১]

এই কারণে স্বর্গগত শিশু সহোদরের কাছে কবির জিজ্ঞাসা,

আমাদের প্রতি হল না দয়া,
কেমনে কাটালে মায়ের মায়া?[৬২]

সহোদরকে কাছে পাবার আকুল বাসনা কবির লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে সহজ-সাবলীলভাবেই —

হেন সুখ ভাই কবে যে হবে,
ভগ্নী বলে তুমি ডাকিয়া লবে।
কভু জানি না ভ্রাতৃ সম্বোধন,
কি করে জানিব সে সুখ কেমন।[৬৩]

তৃতীয়ভাগে অর্থাৎ ১৭—২৩ পৃষ্ঠার অংশে কবি দীনবন্ধু পরমেশ্বরের নিকট তাঁর মনোবেদনা ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন,

কত কষ্ট পাই, বিনা প্রাণ-ভাই,
কি সুখ পাবে হে এ শোক দিয়ে।
... ...
ইহাতে কি তব, ওহে ভবধব
কিঞ্চিৎ হল না দয়ার লেশ ?[৬৪]

কবির মনে হয়েছে যদি তিনি পরমেশ্বরের শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে পারেন, তবে হয়ত ভ্রাতৃ-শোকের যাতনা থেকে মুক্ত হতে পারবেন। তাই তাঁর প্রার্থনা,

ভ্রাতার লাগিয়ে, শোকেতে ভাসিয়ে,
যদি তব কাছে যাইতে পারি।
... ...
দয়া কর নাথ, করি প্রণিপাত,
জুড়াই আমরা তাপিত প্রাণে।[৬৫]

স্বয়ং অন্তর্যামীর কাছে কবি ক্ষোভের সঙ্গে জানতে চাইছেন, এত শোক দেবার জন্য পরমেশ্বর কেন তাকে সৃষ্টি করেছেন।

ফেলে মায়াজালে, তুমিই পাঠালে,
তুমিই করিলে সুখের সৃষ্টি।
তবে কেন হবি, ভ্রাতৃশোকে মরি,[৬৬]
... ...

এ দারুণ মনোবেদনার জন্য পরমেশ্বরকেই কবি বারবার দোষারোপ করেছেন। কিন্তু একসময় তাঁর মনে হয়েছে পরমেশ্বর, যিনি স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি

করেছেন, তাঁকেও তো পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম নিয়ে অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সেই কারণে কবি মহেশমোহিনী দেবী শারদার কাছে প্রার্থনা করছেন যেন তাঁকে ভ্রাতৃশোক ভুলিয়ে দিয়ে দেবীর রাঙ্গাচরণে স্থান দেন এবং সবদুঃখের অবসান ঘটান।

মহেশমোহিনী, কিছুই না জানি
আমি হীনমতি তোমার স্তব!
ও রাঙাচরণ, করিয়া স্মরণ,—
... ...
দেহ সুখ মনে, ভ্রাতৃ-শোকাগুণে
পুড়ে মরি, মাগো নিভায়ে দাও।[৬৭]

চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ ২৪—৩০ পৃষ্ঠার শেষ অংশে কবি প্রভু অন্তর্যামীর নিকট তাঁর মনোবেদনা জানিয়েছেন,

না পারি সহিতে, আর সহেনা হে মোর
আমার দুঃখের নিশি হবে নাকি ভোর?
ভ্রাতৃশোক-শেল আর না পারি সহিতে
এ দারুণ ভার আর না পারি বহিতে।[৬৮]

দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) এ-গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

"...আমার অন্তরে কি রূপ দুঃখরাশি বিরাজিত, তাহা আমার মত অবস্থায় যিনি পতিত, তিনিই বুঝিবেন। তিনিই এই দুঃখমালা পাঠ করিয়া, আমার মর্ম্মবেদনার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিবেন, আর সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণও বুঝিতে পারিবেন..., এই 'দুঃখমালা' এ জগতে আমার এ জীবনের স্মৃতিচিহ্নমাত্র রহিল!......"

কলিকাতা গ্রন্থরচয়িত্রী
২৭শে আষাঢ়, ১৩০৩ সাল।

এই কারণে, এ কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি পাতায় ভ্রাতৃশোকের কথা প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত সহজ-সরল-সাবলীলভাবে এবং সহজ শব্দচয়নের দ্বারা, যেখানে ছন্দের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় না।

সহোদর তুল্য কেহ সমতুল্য নয়,
আমাদের শাস্ত্রে নাথ এইরূপ কয়।
সে ধনে আমারে প্রভু বঞ্চিত করেছ,
তবে ত কপালে নাথ আরো কি লিখেছ।[৬৯]

কাব্য প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কবির তাই একটি কথাই বারবার মনে হয়েছে যে, এ শোক সহ্য করে কিভাবে তিনি এ জীবন ধরে রেখেছেন, হয়ত বা কোনো পাপের ফল তাকে ভোগ করতে হচ্ছে। কবির এ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে কাব্যের শেষ ক'টি পংক্তিতেও.

কঠিন জীবন বলে জীবিত রয়েছি।
নতুবা এ হেন শোক কেন বা হইবে,
এ দারুণ শেল কেন হৃদয়ে বিঁধিবে।[৭০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহিলা কবির নাতিদীর্ঘ কাব্যটি তদানীন্তন সময়ে প্রশংসালাভ করেছিল। এ বিষয়ে একটি চিঠির উদ্ধৃতি রাখা হোলো।

মা ইন্দুমতী !

তোমার রচিত দুঃখমালা পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, কারণ তোমার লেখনী হইতে এমন উৎকৃষ্ট কবিতা বিনির্গত হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না, তবে তুমি যে অসাধারণ গুণ সম্পন্ন মহাশয়ের কন্যা, তোমার ইহা স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ নাই।...

আশীর্ব্বাদক

১৬ই বৈশাখ, ১২৮১ শ্রীসূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী

কামিনী সুন্দরী দেবী

ঊনবিংশ শতকের নারীরচিত কাব্যকবিতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নির্দ্ধারিত যে ক'জন কবি এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কামিনী সুন্দরী দেবীর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন এই কারণে যে, তদানীন্তন পর্দানসীন নারীদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন এই লেখিকা যাঁর কাব্যগ্রন্থে কবিতার সংখ্যা নিতান্ত বেশী না হলেও কবিতার বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী। নারীর কথা নানান অবস্থায় তুলে ধরেছেন কবি তাঁর রচনার মধ্যে। এছাড়া নারীকে অন্ধকার থেকে আলোয় পথপ্রদর্শনে যাঁরা অগ্রণী, সেইসব সমাজ-সংস্কারকগণের কথাও কবি তাঁর

রচনার মধ্যে বলেছেন। কবির কাব্যগ্রন্থ 'কল্পনাকুসুম' বর্তমান আলোচ্যবিষয়, প্রকাশকাল ১২৮৮, বৈশাখ, কলিকাতা (পৃঃ ১০৫)।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই নিজের কথা বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন ;

ভারতবাসিনী ভগিণীগণের উৎসাহ-বর্ধনের ও চিত্তসন্তোষের নিমিত্ত আমি এই সামান্ত কুসুমের মালাটি গাঁথিয়া ভারতসমাজে প্রেরণ করিলাম, এখন ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চরিতার্থ হইব। ইহা বঙ্গকুল কামিনীদিগের যে মনোহারিণী হইবে এখন ভরসা করিতে পারি না ; তথাপি মনুষ্য দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী।
(বিজ্ঞাপন, শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দেবী)

অর্থাৎ নারীদের জন্মই যেন তিনি রচনা করতে বসেছেন। গ্রন্থে কুড়িটি কবিতা স্থান পেয়েছে ; কবিতার শিরোনাম বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণই হয়েছে, যথাক্রমে 'আমাদের দশা' (পৃঃ ১—৭) ; 'বসন্ত পঞ্চমী' (পৃঃ ৭—১০), 'পক্ষীমাতা' (পৃঃ ১০—১৫) ; 'বিদ্যা' (পৃঃ ১৬—১৯) ; 'স্বর্গীয় মাতা' (পৃঃ ১৯—২২) ; 'রতির বিলাপ' (পৃঃ ২৩—২৯) ; 'ঈশ্বর' (পৃঃ ৩০—৩৪) : 'চৈতন্যদেব' (পৃঃ ৩৪—৩৮) ; 'সময় স্থির নয়' (পৃঃ ৩৮—৪০) ; 'জন্মভূমি' (পৃঃ ৪০—৪৪) ; 'ব্রজধাম' (৪৪—৪৭) ; 'যশোমতী' (পৃঃ ৪৭—৫১) ; 'কৈলাস' (পৃঃ ৫২—৫৬) ; 'অভাগীর বিলাপ' (পৃঃ ৫৬—৭৩) ; 'নারদ' (পৃঃ ৭৩—৭৭) ; 'নব্য উন্নতিশীলার মনের ব্যথা' (পৃঃ ৭৭—৮২) ; 'দুখিনী' (পৃঃ ৮২—৯০) ; 'আমার মনের কথা' (পৃঃ ৯০—৯৮) ; 'বিদ্যাসাগর' (পৃঃ ৯৮—৯৯) ; 'তপিনীর আক্ষেপ' (পৃঃ ১০০—১০২) এবং 'সকলের প্রতি' (পৃঃ ১০২—১০৫)।

নারীদের কথা কবি তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন,

কোথা গো জননি ভারতি সতি,
তোমারি বিহনে এ দুরগতি ;
কর দয়া বঙ্গমহিলা প্রতি,
নতুবা যাতনা সহে না আর।[৭২]
বঙ্গবালা বলি কেহ না সম্ভাষে,
বাঁচে কি অবলা সে অনাদরে ?[৭৩]
... ...
আমাদেরি দোষে ভারতক্ষীণ,

পুরুষসমাজ পৌরুষবিহীন,

... .

তবে কেন সব শেখেনা ঠেকে

নারী-শিক্ষা ব'লে আনে না মুখে,[৭৪]

অশিক্ষার অন্ধকারে নারীকে নিমজ্জিত হ'য়ে থাকাটা কবির কাছে মোটেই কাম্য নয়, তাঁর এ-মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দেবী সরস্বতীর বন্দনা করতে গিয়ে 'বসন্ত-পঞ্চমী' কবিতায়,

ভারত এলে মা অভাগার ঘরে,

অভাগিনী দুখ কই গো ঘুচিল ?

শুকাইতে সিন্ধু হইয়াছে মরু,

কৃপাসিন্ধু পেয়ে তৃষা না মিটিল।[৭৫]

বন-অরণ্য পক্ষীমাতার স্থান, সেখানে সে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। কিন্তু এই অরণ্য ত্যাগ করে যখন সে জনসমক্ষে এলো তখনই তার দুর্ভাগ্যের শুরু। তাই কবির জিজ্ঞাসা,

কেন বা আইলে পক্ষী মানব আলয় ?

পড়িয়া দস্যুর হাতে, পেলে শোক বিধিমতে,

সুখের ভাণ্ডার তব হইল বিলয়।[৭৬]

বিদ্যা মানবের পরমসম্পদ, এর অবস্থান মনক্ষেত্রে অর্থাৎ জ্ঞানের ভাণ্ডার মানবকে ঐশ্বর্য্যশালী করে তোলে যা দস্যু লুণ্ঠন করেও নিতে পারে না। বিদ্যা বিতরণ করলে এর বৃদ্ধি ঘটে, এ-ধনের অধিকারী যিনি তার জয় চিরকাল। তাই কবির বক্তব্য সময় নষ্ট না করে বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত। তিনি বঙ্গ-ললনাদের কাছে তাঁর এই বক্তব্য রেখেছেন। বঙ্গনারীদের কাছে কবির আবেদন,

কিন্তু এ সময় আসিবে না আর,

সাবধান হও ভগিনিগণ

ধর্ম্মে দাও মন কর সত্যব্রত,

বিদ্যামৃত-রসে হইয়া মগন।[৭৭]

স্বর্গীয় জননীকে কবি কবিতার মাধ্যমে জানিয়েছেন তাঁর মনোবেদনা,

'কে ভালবাসিবে তোমাবিনা এ জগতে ?'[৭৮]

'কল্পনাকুসুম' কবিতা গ্রন্থটি রচনা করতে করতে গ্রন্থকর্ত্রী স্বামীহানা হন। নিজেকে অভাগিনী, হিসাবে চিহ্নিত করে তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন দীর্ঘ ৩০২ পংক্তির 'অভাগিনীর বিলাপ' কবিতায়। এর প্রতিটি পংক্তিই তাঁর ব্যথা,

সুখের বাজার ভাঙ্গিয়ে গিয়াছে,
পুড়েছে সব অনলে (পংক্তি ৩৯—৪০)
... .
এ দারুণ শেল কি পাপে সহিনু
সুধায়ে ঘুচাব ব্যথা। (পংক্তি ১১১—১১২)
.. ..
যতনে গাঁথিনু কল্পনা-কুসুম
মনে আশা করি কত
এখন সকলি হইল নৈরাশ,
সকল ভরসা হত।[৭৯] (পংক্তি ২৯৩—২৯৬)

ক্ষণিকের জন্য মনোবেদনা হলেও তা দূরে সরিয়ে রেখে কবি তাঁর কবিতার ডালি উপহার দিয়েছেন বঙ্গনারীকে যেখানে তিনি বলেছেন, বঙ্গনারী অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে না থেকে শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত হও।

এস ভগ্নীগণ, লই স্বাধীনতা,
শিক্ষা করি, কবি পবিত্র হৃদয়.
করি ধর্ম্ম রক্ষা, লভি যশোধন,
স্বপদে থাকিব কিসের ভয়?[৮০]

বিধবা-বিবাহ বিধি, নারী-শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কবি তাঁর অন্তরের প্রণাম জানিয়েছেন, যিনি নারীকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখালেন।

কৃতজ্ঞতা সহ বঙ্গকুলবালা,
নমে পিত তব পায় ;
দুর্ভাগা বালিকা তোমারি দয়ায়
অকুলেতে কুল পায়।[৮১]

এই গ্রন্থে পরমেশ্বর, চৈতন্যদেব, জন্মভূমি, যশোমতী, কৈলাসবাসী মহাদেব,

নারদ প্রমুখের বিষয়ে কবিতা রচনা করলেও গ্রন্থকর্ত্রী তার যে অন্তরের অন্তঃস্থলের কথা বলেছেন, তা হোলো অন্ধকারের নারীকে আলোয় আলোকিত করা। আর এই কারণেই উনবিংশ শতকের এই মহিলা কবির রচনা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পর্দানসীন নারীর কলমে আজ তারই কথা —

সঙ্গিনী মনতোষিণী
শিক্ষিতা প্রিয়বাদিনী,
হৃদয় বাসিনী মনোমত।[৮২]

কবি নারীকে আজ পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জনসমক্ষে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়ে যে রচনা করেছেন, সে লেখনীর দৃঢ়তা বিগত শতকের পাঠক-কুলকে তো অবশ্যই এ শতকের পাঠককুলকেও আন্দোলিত করে।

কৃষ্ণকামিনী দাসী

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণকামিনী দাসীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্যতা রাখে। তাঁর কাব্য-গ্রন্থ "চিত্তবিলাসিনী" বঙ্গমহিলারচিত সর্ব-প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ৭২ পৃষ্ঠার নাতিদীর্ঘ এ কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ।

কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকাতে লেখিকা তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশনার দুঃসাহসী প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেছেন,

'অদ্যাপি অস্মদেশীয় মহিলাগণের কোন পুস্তকই প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং প্রথমতঃ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র, কিন্তু আমার অন্তকরণে যথেষ্ট সাহস জন্মিতেছে, যে সামাজিক মহাশয়েরা আপাতত স্ত্রীলোকের রচনা শুনিলেই বোধহয় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই, আর আমার পুস্তক রচনা করিবার এই এক প্রধান উদ্দেশ্য যে উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক একটা দৃষ্টান্ত পাইলে স্ত্রীলোক মাত্রেই বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী হইবে তাহা হইলেই এদেশের গৌরবের আর পরিসীমা থাকিবেক না,……।[৮৩]

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামক বালিকা-বিদ্যালয়টি স্থাপিত হলেও, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তা বিশেষ সাহায্য করেনি, কারণ বিদ্যার্জন করলে স্ত্রীলোকেরা বিধবা হবেন, তাঁদের চরিত্রদোষ ঘটবে—এ ধারণা অতিক্রম করে তদানীন্তনসমাজে বালিকাদের শিক্ষাগ্রহণ প্রায় সম্ভব ছিল

না। এরূপ প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও স্বল্পসংখ্যক সৌভাগ্য-বতীদের একজন হিসাবে কৃষ্ণকামিনী দাসী যে সামান্য সুযোগ পেয়েছিলেন, তার দ্বারাই প্রতিভাশালিনী এই মহিলা নিজের ভাবনা-চিন্তা ছন্দে গ্রথিত করে "চিত্তবিলাসিনী" কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। লেখিকা এক্ষেত্রে যে তাঁর স্বামীর অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছিলেন, ভূমিকায় স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেছেন,

'পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার সময় আমার প্রাণবল্লভ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে কেবল আমা হইতে ইহা সম্পন্ন হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা ছিল না।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কৃষ্ণকামিনী দাসীর স্বামী শিক্ষিত ছিলেন। তিনি "তত্ত্ব-চূড়ামণি", "সহজ সত্য তত্ত্বজ্ঞান", "ভবরোগ মহৌষধি", "মহাবাক্যতত্ত্বামৃতরস" প্রভৃতি রচনা করেন।

কৃষ্ণকামিনী দাসী তাঁর কাব্যগ্রন্থে "আত্মপরিচয়" কবিতার মাধ্যমে নিজের পরিচয়ও দিয়েছেন। পিতৃকুলের পরিচয় সেখানে অনুপস্থিত, বিবাহিতা নারী হিসাবে কৃষ্ণকামিনী তাঁর শ্বশুরকুলের পরিচয় দিয়েছেন,

জাহ্নবী দক্ষিণ অংশে হুগলী জিলায়।
সুখরিয়া নামে গ্রাম আছয়ে তথায়॥
সেই স্থানে বৃহৎ এক গোষ্ঠীর বসত।
কায়স্থ উপাধি মিত্র মুস্তৌফীতে খ্যাত॥[৮৩(১)]

হুগলী জেলার সুখরিয়া গ্রামের উক্ত কায়স্থ কালিদাস মিত্র মুস্তৌফী নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ কাশীদাস, মধ্যম হরদাস ও কনিষ্ঠ নৃসিংহদাস।

কনিষ্ঠের বংশধর শ্রীশশিভূষণ।
অধিনীরপ্রাণের বল্লভ সেই জন॥
তাঁর আনুকূল্যে আমি করেছি মনন।
'চিত্তবিলাসিনী' গ্রন্থ করিতে রচন॥[৮৪]

"আত্মপরিচয়"-এর শেষাংশে লেখিকা তাঁর শক্তির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে সুধী পাঠকসমাজের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আবেদন রেখেছেন,

গুণিগণ প্রতি এই আমার মিনতি।
দোষদৃষ্টে নাহি যেন হন রুষ্টমতি॥

ক্ষীণ বুদ্ধিবল আমি নিতান্ত অক্ষমা।
কৃপা করি অধিনীরে করিবেন ক্ষমা॥
এ যুক্তি বিধান হৈল এই যুক্তি মতে।
মহাত্মাগণের আস্য সহাস্য করিতে॥[৮৫]

"চিত্তবিলাসিনী" নাতিদীর্ঘ কাব্য হলেও বিষয়বস্তুর গৌরবে এবং রচনার আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে এ কাব্য অসাধারণ। অন্তঃপুরবাসিনী একজন গৃহবধু, যিনি তদানীন্তন প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের কারণে শিক্ষার অবাধ সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁর লেখনী বঙ্গসাহিত্যের আসরে স্থান করে নিয়েছে। এই কারণে ঊনবিংশ শতকের পাঠককুল বিশেষ করে নারীসমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

কবি কৃষ্ণকামিনী তাঁর কাব্যগ্রন্থে পয়ার, ত্রিপদী (দীর্ঘত্রিপদী), লঘু-ত্রিপদী, পয়ার-মিশ্র ত্রিপদী, একাবলী ও দীর্ঘললিত নামক নানাবিধ ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—

পয়ার ছন্দ :
নম ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় পরম প্রকৃতি।
পরাৎপর সারাৎসার সর্ব্ব ভূতে স্থিতি॥[৮৬]

ত্রিপদী ছন্দ :
মরি কিবে বুদ্ধিবল, করিয়াছে ধোঁয়া কল,
কলেতে চালায় বেগে গাড়ি।
অদ্ভুত ব্যাপার অতি, মরুত যিনিয়া গতি,
নাহি কিন্তু হস্তি ঘোড়া ঘুড়ি॥[৮৭]

লঘুত্রিপদী :
সর সর সর, কি কর কি কর,
যাও নিজ নিকতনে।
দেখ যদি পরে, কি বলিবে পরে,
কিছু নাহি ভাব মনে॥[৮৮]

পয়ার-মিশ্র ত্রিপদী : নাহি তরি তরবারে, কিসে যাব পারাবারে,
কিছু মাত্র উপায় না হেরি।
বল দেখি বিধুমুখী কি করি কি করি॥
তব বস্ত্র আভরণ, আমারে কর অর্পণ,
আগে গিয়ে রেখে আসি পারে।
তোমারে লইয়া যাব এসে তার পরে॥[৮৯]

একাবলী ঃ কাহারে কহিব মনের দুঃখ।
গুমরে গুমরে ফাটিছে বুক ॥[৯০]

দীর্ঘ ললিত : পুষ্প তুলে নানা জাতি, সেঁউতি গোলাপ জাঁতি
মনোমত হার সখি তাহে গাঁথিলাম লো।
প্রাণেশ আসিবে বলি, আনিয়ে কুসুমকলি
মনসুখে সুশোভন শয্যা করিলাম লো॥[৯১]

নানান ছন্দে গাঁথা কবিতা ছাড়াও লেখিকা তাঁর গ্রন্থে গদ্যরচনার মাধ্যমে কোনো প্রসঙ্গের প্রাথমিক উপস্থাপনা, কবিতায় কথোপকথন এবং গদ্যপদ্য মিশ্রণে নাট্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন। এগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর লেখনীর দক্ষতা ও সাবলীলতারই প্রকাশ। কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা হোলো।

'দয়া ছাড়া ধর্ম্ম নাই'।

একদিবস নিশীথ সময়ে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নযোগে দর্শন করিলাম, যে কোনো সুষুপ্ত মহাশয় পুরুষের নাসিকা রন্ধ্র হইতে প্রথমতঃ এক অসামান্য রূপলাবণ্য বিশিষ্ট ষোড়শবর্ষীয় কামিনী এবং পরক্ষণেই এক তরুণ বয়স্ক তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট পুরুষ নিঃসৃত হইলেন। পরে তাঁহারা একস্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর যাদৃশ কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে যাহা ঘটনা হইয়াছিল পশ্চাল্লিখিত পংক্তি কতিপয়ে প্রকাশ করিতেছি।

পুরুষের উক্তি

ঘোর রজনীতে তুমি কাহার কামিনী।
কিসের লাগিয়ে ভ্রমিতেছ একাকিনী॥
... ...

কামিনীর উক্তি

আমি হে রমণী, আছি একাকিনী,
কুলের কামিনী তায়।
তুমি হে এখানে, কিসের কারণে,
বল ওহে যুবরায়॥
... ...[৯২]

স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ ও কামিনীর এইভাবে কাব্য নাটকের ধরনে উত্তর প্রত্যুত্তর

চলে। শেষে জানা গেল উক্ত কথোপকথন একটি রূপক : কামিনী ও পুরুষ যথাক্রমে দয়া ও ধর্ম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কবির লেখনী,

দয়া ছাড়া ধর্ম্ম আছে কোনখানে।
যেখানেতে দয়া দেখ ধর্ম্ম সেইখানে ॥[২৩]

দয়া ধর্মের স্থায়ী মিলনের মধ্য দিয়েই রূপক কাব্যনাটিকার যবনিকা। এখানেই কবির স্বপ্নের শেষ। স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে লেখিকার রূপকে প্রবীণা রমণী ও নবীনা দুই ভগ্নীর কথোপকথন (পৃঃ ১৮—২৩) উপস্থিত করেছেন—রূপকের ছদ্মবেশের বাইরে যাদের পরিচয় বসুমতী, সুখ ও সন্তোষ। পূর্বের রূপকের ন্যায়ই এ কাব্যনাটিকার উপস্থাপন ঘটেছে।

ধনেতে কখন নাহি হয় সুখোদয়।
সন্তোষ সুখের হেতু জানিবে নিশ্চয় ॥[২৪]

উক্ত ছত্রদ্বয়ই দ্বিতীয় কাব্যনাটিকার শিরোনাম।

'বাল্যবিধবা মাতঙ্গিনী ও সৌদামিনীর কথোপকথন' (পৃঃ ৬০—৬৭) আট পৃষ্ঠার কাব্যনাট্যে নাট্যসংলাপে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৬-জুলাই 'বিধবা-বিবাহ আইন' পাশ হয়, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন—

সৌদামিনী। হ্যাঁলো, এমন গুণমণি গুণের সাগর কে আছে যে আমাদের দুখের দুখী হয়ে এ কাণ্ড কল্লে।

মাতঙ্গিনী। শুনিচি নাকি সে গুণের সাগরের নাম বিদ্যেসাগর।

... ...

সৌদামিনী। ...একটা কিছুর সাগর হবে, তা গুণেরি বা কে জানে, আর বিদ্যেরি বা কে জানে, সাগর না হলে কখন পুকুরে ঢেউ খেলে না,

মাতঙ্গিনী।......ধন্য ধন্য ধন্য বটে বিদ্যার সাগর।
রাখিলেন চিরকীর্ত্তি ভারত ভিতর ॥
বিধবার দুঃখভার করিতে সংহার।
মহীতে ঈশ্বর বুঝি তাই অবতার ॥[২৫]

'অধিবেদন' শীর্ষক রচনায় (৬৭—৭১ পৃঃ) ব্রাহ্মণকুমারী সদয়াস্তিকা ও নবীনা কুলীন কুলকামিনী লবঙ্গিকার কথোপকথনে, লেখিকা যে বক্তব্য তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তা হলো, সাত বৎসর বিবাহ সত্ত্বেও স্বামীবিরহে লবঙ্গিকার যে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়, তার মূল কারণ বল্লালী কুলীন-

প্রথা, উনিশ শতকের মধ্যভাগে পুরুষ-শাসিত সমাজের কেন্দ্রবিন্দু কুলীনদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন লেখিকা নির্ভয়েই। 'অধিবেদন' শব্দের অর্থ 'এক স্ত্রী সত্ত্বেও পুরুষের পুনর্বার বিবাহ'-শীর্ষক রচনায় নারীদের চরম দুর্দশার কথা এবং এই সর্বনাশা প্রথা থেকে উদ্ধারের জন্য যোগ্য সমাজসংস্কারকগণকে আহ্বান জানিয়েছেন,

এখন কুলীন যারা কুলীন বলিয়ে।
গর্ব্বে নাহি যান পদ ধরায় পাতিয়ে॥
তাহাদের গুণ যত অতি সুশোভন।
গাঁজাগুলি সুরা পানে পটু বিলক্ষণ॥
... ...
পরিণয়ে হন রত শৈশব সময়।
অশীতি হইলে পার তবু ক্ষান্ত নয়॥
কেহ হন একশত রমণীর পতি।
যাহার অধিক ন্যূন তাহার বিংশতি॥
... ...
কিছু মাত্র চিন্তা নাহি করেন অন্তরে।
অকূলে ফেলিয়া সেই অবলাগণেরে॥
... ...
হায় কবে সুধীগণ সদয় হইবে।
অধিবেদনের পাট উঠাইয়া দিবে॥
কুলীন কুমারিগণে করিতে উদ্ধার।
কি জানি ভারতে কে বা হবে অবতার॥[২৬]

নারীচরিত্র সম্পর্কে 'বাদী-প্রতিবাদী' শীর্ষক রচনায় (পৃঃ ৩২—৫৯) লেখিকা গদ্যে লিখিত উপস্থাপনায় বলেছেন,

বাদী অম্বিকানিবাসী শ্রী বেণীমাধব মল্লিক ও প্রতিবাদী সুখরিয়ানিবাসী শ্রী দক্ষিণাচরণ মুস্তৌফি নব্য সম্প্রদায়ের কয়েকজন ব্যক্তির উপস্থিতিতে তর্কযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাদী মহিলাবিদ্বেষী ও স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী এবং নারী-জাগরণকে তিনি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর ভাবেন। অন্যদিকে প্রতিবাদী নারী মহীয়সী অস্তিত্বের উপাসক এবং তিনি মনেপ্রাণে 'বন্দিনী-বামা' কুলের

মুক্তি কামনা করেন। নারী চরিত্র সম্পর্কে লেখিকার এ কবিতা যুদ্ধ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী,

বাদী।

... ...

স্ত্রীজাতি চরিত্র আমি জেনেছি বিশেষ।
অনিষ্ট ক্রিয়ায় যার নাহি পরিশেষ ॥

... ...

প্রতিবাদী।

... ...

বিদ্যাবতী গুণবতী নারী যদি হয়।
অনিষ্টসাধনে তার মন নাহি লয় ॥
অতএব স্ত্রীগণেরে বিদ্যা শিখাইলে।
সন্দেহ নাহিক তায় শুভ ফল ফলে ॥
বিনা দোষে দোষ দেওয়া অতি অনুচিত।
অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা পুরুষ নিশ্চিত ॥[৯৭]

'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকা ঘোষণা করেছেন 'অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের কোনো পুস্তকই প্রচারিত হয় নাই'। অর্থাৎ বঙ্গমহিলা রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত এ গ্রন্থে লেখিকা তাঁর রচনার বহুমুখীনতার প্রকাশ ঘটিয়ে কাব্যগ্রন্থের পূর্ণতা দিয়েছেন। শুধুমাত্র কাল্পনিক কথোপকথন জাতীয় রচনাই নয় নারীর উক্তি বা মনোভাব প্রকাশ করেছেন নানান ঘটনা ও সমস্যাকে তুলে ধরে। কবিতাগুলির শিরোনামের মধ্যেই বিষয়বস্তুর খোঁজ পাওয়া যাবে। 'বিরহিনীর উল্লাস' (পৃঃ ৮—৯), 'দিবাবসানের শোভা' (পৃঃ ১৩—১৪), 'লম্পট ব্যক্তির পত্নীর সহচরী সমীপে বিলাপ' (২৩—২৪), 'নায়ক আশয়ে নায়িকা জাগরণে যামিনী যাপন করিয়া প্রভাতে সখী প্রতি বলিতেছেন' (পৃঃ ২৪—২৫), 'কোন-বিরহিনীর বিলাপ' (পৃঃ ২৫—২৭), 'নিদ্রোথিত বিরহিনীর বিলাপ' (পৃঃ ২৭—২৮), 'আমার প্রতি প্রাণেশ্বরের উক্তি' (পৃঃ ২৮—২৯), 'মৎকর্তৃক প্রাণেশ্বর সমীপে লিপি প্রেরন' (পৃঃ ৩০), 'নববিবাহিতা কামিনী (পৃঃ ৩০—৩২) এবং 'মৎসন্নিধানে প্রাণেশ্বরের লিপি প্রেরণ' (পৃঃ ৭২), ইত্যাদি।

উক্ত কবিতাগুলির মধ্যে আকর্ষণ করে 'দিবাবসানের শোভা', যেখানে কবির বর্ণনায় সূর্য্যের ম্লান আলো, রমণীর প্রদোষকাল, চন্দ্র ও তারকাখচিত প্রথম রাত্রি, এ সকল দৃশ্য বর্ণনার মাধুর্য্য অভিভূত করে।

ভাস্করের ম্লান করে যত তরুগণ।
সুবর্ণ পত্রেতে যেন হয়েছে শোভন ॥
... ...
অরুণ কিরণ হলো ক্রমেতে বিলয়।
রমণীর কাল অতি প্রদোষ সময় ॥
... ...
এমতে হইল ঘোর রজনী আগতা।
ক্ষপাকর করে হলো ধরণী ব্যাপিতা ॥
তপন তাপেতে যারা আছিল গোপন।
অসংখ্যক গ্রহগণ দিল দরশন ॥[৯৮]

কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তারিখের "সংবাদপ্রভাকর" পত্রিকায় লেখেন, 'আমরা পরমানন্দ সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে "চিত্তবিলাসিনী" নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠান্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি, অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এদেশে প্রচলিতা হইতেছে, তাহার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ, · অবলাগণ বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন ইহাই আমারদিগের প্রার্থনা।'[৯৯]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কৃষ্ণকামিনীর রচনাশৈলীতে কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রভাব বিদ্যমান।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত যে "চিত্তবিলাসিনী" বঙ্গমহিলা রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক। অসাধারণ এই কাব্যগ্রন্থটি তদানীন্তন সময়ে পাঠকচিত্তকে যে উদ্বেলিত করেছিল কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্যে তা স্পষ্টতঃ অর্থাৎ শুধু পাঠক নয়, বিদ্বৎজনের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বামাকুলের শিক্ষার সামান্যতম সুযোগের দিনে সমাজ-সচেতন লেখিকা তাঁর এই গ্রন্থে নারীর সামাজিক সমস্যা এবং তা সমাধানের ইঙ্গিত গদ্যে-পদ্যে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা প্রশংসার দাবী রাখে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (দত্ত)

বাংলা সাহিত্যের কাব্য জগতে মহিলা কবিদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর (১৮৫৮—১৯২৪) একটি বিশিষ্ট আসন আছে। তাঁর সাবলীল বর্ণনা ভঙ্গি, অনায়াস বিবৃতি এবং স্বচ্ছন্দ প্রকাশ যা একান্তই নিজস্ব। যে স্বাভাবিক পরিমণ্ডলে তিনি বিচরণ করেছেন, সেটাই হ'ল তাঁর কাব্যজগৎ। তাঁর কাব্য তাই সহজ, সরল অথচ গভীর এবং মাধুর্যময়।

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর কাব্যসংখ্যা মোট ন'খানি—'কবিতাহার' (১৮৭৩), 'ভারতকুসুম' (১৮৮২), 'অশ্রুকণা (১৮৮৭), 'আভাষ' (১৮৯০), 'শিখা' (১৮৯৬), 'অর্ঘ্য' (১৯০২), 'স্বদেশিনী' (১৯০৬), 'সিন্ধুগাথা' (১৯০৭ , এবং নাট্যকাব্য 'সন্ন্যাসিনী' বা 'মীরাবাঈ' (১৮৯২)। এর মধ্যে নাট্যকাব্যটি ছাড়া বাকী আটখানি কাব্যগ্রন্থই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কবিতাহার—

এ গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৭৩ সাল।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর রচনা পরবর্তীকালে বসুমতী সাহিত্যমন্দির গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশ করে। উক্ত গ্রন্থে কবির নয়টি কাব্যগ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের ৪৩৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪৬৯ পৃষ্ঠা—স্থানের মধ্যে 'কবিতাহার' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে। 'কবিতাহার'-এ কবির পাঁচটি মাত্র সন্দর্ভ নিবেশিত আছে, যথাক্রমে—'উষা-বর্ণন', 'বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা'; 'শরৎ-বর্ণন', 'সঙ্গিনীর বৈধব্যে', 'লর্ডমেয়োর অপমৃত্যু'। 'কবিতাহার' সম্ভবত কবির প্রথম রচনা। তবে প্রথম প্রয়াসের ফল অত্যন্ত আশাপ্রদ যে হয়েছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। কারণ তদানীন্তন পত্র-পত্রিকা এর সাক্ষ্য বহন করেছে। গ্রন্থকর্ত্রী ভূমিকাতেই স্বমত ব্যক্ত করতে গিয়ে এ'টি যে তাঁর অপরিপক্ক রচনা সে বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

পাঠক মহোদয়গণ। অদ্যাপি আমাদিগের ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গকামিনী আমরা কেহই বিদ্যাতে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই যে, সামান্য রচনা করিয়া আপনাদের সমীপবর্ত্তিনী হই। এই আশা করা কেবল ভ্রম মাত্র। তবে অজ্ঞাতানিবন্ধন কতিপয় পদ্য পংক্তি প্রচারের কারণ এই ইতিপূর্বে মদীয় স্বামীকে লিখিত পত্রাবলী তাঁহার কোন প্রিয় বন্ধু দর্শন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া হিন্দু মহিলার পত্রাবলী নামে প্রচার করেন, তদ্দৃষ্টে অনেকেই আমাকে

উৎসাহ প্রদান করিয়া অন্যান্য বিষয় রচনা করিতে কহেন। আমি কেবলমাত্র তাঁহাদের আগ্রহাতিশয়ে সামান্য কতিপয় পদ্য রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে সাহসী হইতেছি। পরিশেষে সবিনয় নিবেদন, অনেক ভ্রম-প্রমাদাদি আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে চরিতার্থ হইব।

অলমতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা, বহুবাজার। শ্রীমতী ...[১০০]

২৯শে মাঘ, ১২৭৯

কবি যদিও ভূমিকাতে তাঁর রচনাকে অপরিপক্ক বলেছেন কিন্তু পাঁচটি রচনাই যথেষ্ট সারপূর্ণ বলে বোধ হয়। 'ঊষা-বর্ণন'—তেতাল্লিশটি স্তবকে ঊষার বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সহজ সরল ভাষা সমন্বয়ে। দ্বিতীয় রচনায় সুনিপুণ চিত্রকরের পরিচয় রেখেছেন কবি—

এমন সুখের স্থানে বঙ্গীয়া রমণী,
কেবল বিষাদে ভাসে দিবস-যামিনী।[১০১]

'সঙ্গিনীর বৈধব্যে' এ বাস্তবের সজীবতা বজায় রেখেছেন কবি। সদ্য বৈধব্য-দশাগ্রস্ত নারীর অন্তরের বেদনা লেখিকার লেখনীতে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

হায়! কে সাধিল বাদ করিয়া বৈরিতা,
উৎপাটি অমৃত-তরু ছিন্ন কৈল লতা।[১০২]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর গ্রন্থগুলি পাঠক মহলেও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। 'কবিতাহার' গ্রন্থটি প্রকাশের পর কিছু আলোচনা উদ্ধৃতে বিষয়টি স্পষ্টতঃ হবে।

জনৈক হিন্দু মহিলা-প্রণীত : গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোক প্রবেশিলে কত আহ্লাদ হয়, সকলেই জানেন। বঙ্গে এখন অন্ধকারের অবস্থা। এই দুর্দ্দিনে যদি অবরুদ্ধ-মতি প্রতিহত-গতি স্ত্রীজাতির মনীষা কিয়ৎ পরিমাণেও স্ফূর্তি পায়, তবে কোন্ মনস্বীর না আনন্দ হয়? তাহার উপর, তাঁহাদের হৃদ্বৃত্তির বিকাশ আবার যদি সম্পূর্ণ প্রোজ্জ্বল কিরণ দান করে তাহা হইলে সে প্রশংসা পাইবার অধিকারীর কত পুণ্য। কবিতাহারের রচয়িত্রী সেই সুখ্যাতিবাদ পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রয়াসের ফল-অত্যন্ত আশাপ্রদ। সুকুমার অবস্থা হইতেই তাঁহার রচনা যখন অমৃত নিঃস্যান্দিনী শক্তি পাইয়াছে, তখন পরিপক্ক লেখনী, না জানি, বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে আরো

কত মহামূল্য জ্যোতিষ্ক সংস্থাপন করিবে! কবিতাহারে 'উষা-বর্ণন', 'বঙ্গ-মহিলাগণের হীনাবস্থা', 'শরৎবর্ণন', 'সঙ্গিনীর বৈধব্যে', 'লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু', পাঁচটী মাত্র সন্দর্ভ নিবেশিত আছে। 'সঙ্গিনার বৈধব্যে' হৃদয়-ভাব অপ্রতিহত গতি দেখাইয়াছে। দ্বিতীয় সন্দর্ভে গ্রন্থকর্ত্রী সুনিপুণ চিত্রকরের মত তুলিকা-যোগে স্ব-শ্রেণীর একটা অতি বিশ্বস্ত ছবি আঁকিয়াছেন। স্ত্রী-জাতীর আন্তরিক বেদনা যাঁহারা বুঝিতে চাহেন না, সেই কঠোর প্রাণ পুরুষকে বলি, দেখ, প্রবল পুরুষ! যাঁহাদিগকে অবলা বল, তাঁহারা কি লিখিয়াছেন—একবার দেখ। আর যে ইয়োরোপীয় জাতি আমাদিগকে রাজদ্রোহী ভাবেন, তাহাদিগকে বলি, দেখুন মহাত্মন্! আমাদের অন্তঃপুরচারিণী—আমাদের জননী জাতি আপনাদের রাজত্বে কতসুখিনী—আপনাদের সমবেদনায় কেমন দুঃখিনী!

রচয়িত্রী খণ্ডকাব্য ছাড়িয়া মহাকাব্যে হস্ত প্রসারণ করিলে, প্রথম শ্রেণীর পুরুষ কবিদের সমকক্ষতায় সমর্থ হইবেন।

আর্য্যদর্শন, বৈশাখ ১২৮৮ সাল।[১০৩]

কবিতাহার তাদৃশ উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ নহে, কিন্তু সদ্গ্রন্থ বটে এবং স্ত্রীলোক মাত্রেরই সুপাঠ্য। এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে কবিত্বের কমনীয় জ্যোৎস্না ও স্ফুরণ আছে। বান্ধব, ষষ্ঠ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।[১০৪]

"* * * * Thus when she is singing of the condition of her sex in India, which she does with a force and truth which a Hindu lady alone can do, after an eloquent appeal to the stronger sex in the name of justice and humanity, in the name of the chivalry which is proper to it to give it freedom—after an exhortation to individual husbands, whatever their indifference to women as a class, to free their respective wives, for the love they bear them, she concludes with a most appropriate, natural and fervid appeal to the Almighty. We hope there is no Hindu man who can read this poem without emotion—no atheist who has his faculties generally about him, no foe of woman's Rights who is not utterly depraved, who will be disposed to question the perfect naturalness and sincerity of that reverent expostulation with the Supreme Being, the enquiry why the All-merciful is

(apparently) the All-merciless to her sex—why having created woman and endowed her with such a weak nature and tender heart, he has condemned her to subjection. But her doubt of the divine wisdom is only momentary—only the weakness of the flesh under the ceaseless rack of the Hindu social system. She soon regains her equanimity, and in the last lines though still harping on her state of imprisonment and darkness, she becomes almost cheerful with a melancholy cheerfulness in her expression of dutifulness to God :—

Oh for sweet Liberty—a free, free home
Whence I may glide at will and freely roam !
Imprisoned like some caged bird, I stay
In this recess, and sigh the hours away,
Condemned to thraldom, oh how sad my lot !
This globe, this life itself avail me not !
Ah me ! were freedom mine and fetters off,
I would the nectar'd draughts of knowledge quaff,
And still as nature's beauties charmed my eyes :
I'd sing thy praise, my Maker kind and wise !

* * * * Kavitahara, as being altogether modern and secular in subject and treatment is infinitely more pleasant reading. The writer excels in description and the expression of tender, womanly sentiment natural to her. Besides the pieces already alluded to, there is a short piece on Autumn and a pretty long one on the Morning or rather Day, from the latter of which we translate a few stanzas,—

In anger fierce, the God of day
With flame envelopes earth and sky,
The air grows hot beneath his ray,
As he rides in his zenith high.
Now Sol, in glowing vesture drest.
Seeith his vapour—tribute paid ;
Men, beasts, birds are with heat opprest,
And panting travellers seek the shade.

The dark doth now on clouds in air,
In carols loud for rain—drops call ,
All living thing to streams repair :—
For the fiery blast oppresseth all.
E'en the Zenana's beauteous throng,
With nimble steps, by glare opprest,
Fly where the streamlet glides along,
And deck like lotus—blooms its breast.

The Hindu Patriot published sometime ago translations from the same poem as well as one from another, both finely rendered into verse by Babu O. C. Dutt.

One of the excellences of this little collection that makes it a gem is its equality in respect of quality. All the pieces, and they are only five, are of more or less merit. But of all these five, none is so powerful so deeply moving as the Lament for a Friend's Widowhood. It is—a direct spring of emotion from the living heart -tears in words. It is a true picture of death in a household rather than of Hindu Widowhood, in particular, but the knowledge of Hindu Widowhood doubtless furnishes much of the inspiration. An ever—torturing perpetual widowhood is one of the darkest spots in our social system. Power is not the characteristic of her muse, but rather a quite tenderness, but the first sight of the woeful change hurricane uprooting a fine orchard in an hour—a loving sister blooming in youth and beauty, surrounded by all comforts that wealth can command and blest with the highest treasure for such a one, a youthful husband's initiatory love, struck down in a moment and rendered for ever miserable, worse than a beggar's wife need be—evidently impressed her profoundly, and if anything were wanting, the dread, may be of the same fate (God forbid !) for herself, completed the effect on her—quickened her fancy and intensified her passion."

—Mookerjee's Magazine, June, 1873.[১০৫]

'Kavitahara is a collection of some exquisite pieces of poetry in Bengali by a Hindu lady of high respectability in Calcutta. It may be interesting to the readers to know that the poetess is only fifteen years of age".

—Hindoo Patriot, March 10, 1873.[১০৬]

"A Bengalee girl of fifteen has published Kavitahara which the Hindoo Patriot describes "a collection of some exquisite pieces of poetry" in Bengalee. The critic should translate them".

· The Friend of India, March 13, 1873.[১০৭]

ভারতকুসুম—

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ভারতকুসুম, প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী। ৪৭১ থেকে ৫৫৮ পৃষ্ঠা স্থানের মধ্যে রচয়িত্রীর ভারতকুসুমের কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে। এটি তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম দিককার রচনা। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁর 'ভারতকুসুম'-এর ভূমিকাতেই এ-বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

পাঠক মহাশয়গণ পূর্ব্বে মৎপ্রণীত "কবিতাহার" পাঠে আমাকে উৎসাহ দিয়া কবিতা লিখিতে কহেন। আমি সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সময়ে সময়ে কবিতা রচনা করি। হিন্দুবালার কোন পুস্তক প্রণয়নে যে কত ব্যাঘাত, তাহা বোধহয়, সকলেই জানেন।

অতএব, পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার নিমিত্ত আপনাদিগকে আর অধিক কিছু বোধ করি, বলিতে হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণ আমি উক্ত কবিতাগুলি ভারতকুসুম নাম দিয়া জন-সমাজে প্রচারিত করিলাম। ইহার কয়েকটি কবিতা বঙ্গমহিলা, আর্য্যদর্শন, বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত হয়। বঙ্গমহিলাতে "পতিভক্তি" শীর্ষক কবিতাটি দেওয়া হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় উক্ত নামের পরিবর্তে 'ভারতমাতা' নামে প্রচার করিয়াছিলেন। অধুনা পুরাতন, কিন্তু তৎসময়ের লিখিত দুই একটি কবিতা আপনাদের বিরক্তকর হইবে। স্ত্রীলোকের রচনা, সুতরাং ভ্রম-প্রমাদের অসদ্ভাব নাই। যাহাহউক, পাঠক-পাঠিকাগণ! মলিন

ভারত-কুসুমের একটি কুসুমও যদি আপনাদের মনোনীত হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা জনৈক হিন্দুমহিলা।[১০৮]

১লা কার্ত্তিক, ১২৮১, সাল

যে কবিতাগুলি এ-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তা হলো, যথাক্রমে 'বসন্তপঞ্চমী', 'সে কোথায়', 'প্রাবৃট্ কমল', 'মনের প্রতি', 'ঈশ্বরের প্রতি', 'পতি-ভক্তি', 'বঙ্গ-বিনোদিনী', 'সতীত্বের খনি', 'নিশীথিনী', 'কোজাগর-পূর্ণিমা', 'জাগ্রতে স্বপ্ন', 'দাম্পত্য প্রণয়', 'মধ্যাহ্নে চিন্তাতুরা', 'বাল্যকাল ও বালিকা', 'সুখের সীমা', 'সাগর পারে', 'নিশীথে-বংশী-ধ্বনী', 'শারদীয় উৎসব', 'একি ভালবাসা', 'কর্ণের প্রতি ভীষ্মের উত্তেজনা বাক্য', 'নদীর প্রতি', 'দীনবন্ধু অস্তাচলে', 'তপোবন', 'আশা অসীমা', 'করবী-বন্ধন', 'মধুকরোত্তেজিতা শকুন্তলা', 'যৌবন', 'ময়ূরী', 'সখীর প্রতি', 'হৃদয়'।

'ভারতকুসুম'-এর কবিতাগুলি নানান স্বাদের। নারীর কথা বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন যথা—'মনের প্রতি', 'পতি-ভক্তি', 'বঙ্গ-বিনোদিনী', 'সতীত্বের খনি' ইত্যাদি কবিতা যেখানে তৎকালীন নারীসমাজের কথা, তাঁর যন্ত্রণার কথা, সামাজিক রীতিনীতির বন্ধনে আবদ্ধ নানান সংস্কারের বেড়াজালে বন্দী নারীর কথা বলেছেন, যেখানে বাস্তবতার ছোঁয়া মেলে,—

বঙ্গ-বিনোদিনী সতীত্বের খনি ;
এমন রমণী আছে কি আর ?[১০৯]

'ভারতকুসুম' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন কিছু পত্র পত্রিকায় যে আলোচনা প্রকাশিত হয়, তা তুলে ধরা হোলো,—

কবিতাহার এবং ভারতকুসুম রচয়িত্রী এতদিন আত্ম নাম প্রকাশ করেন নাই। অধুনা, তিনি ভারতী এবং কল্পনায় নাম স্বাক্ষর করিয়া কবিতা লিখিতেছেন। তাঁহার আধুনিক কবিতাগুলি—"গ্রাম্যছবি", "ছাই" প্রভৃতি, তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতেছে। কবিতাহার এবং ভারতকুসুম তাঁহার অল্পবয়সের লেখা, অপরিপক্কাবস্থার ফল। কিন্তু বালিকার ক্রীড়াকাস্তাবস্থায়ও ভবিষ্য রূপমাধুরির আভাষ পাওয়া যায়।

সাহিত্যের দোষগুণ বিচারকালে, আমরা নারীজাতির প্রতি পক্ষপাতিত্বের

ধার রাখিনা। গিরীন্দ্রমোহিনীর সম্মুখে যশোপথ বিস্তারিত রহিয়াছে, একটুমাত্র উদ্যমের অপেক্ষা। —কল্পনা[১১০]

বইখানি একজন হিন্দুমহিলা প্রণীত। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ ছোট ছোট কয়েকটী কবিতায় এই বইখানি শেষ হইয়াছে। ইহাতে যে দোষ নাই তাহা নহে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এত সুন্দর জিনিষ আছে যাহা পড়িলে দোষের দিকে আর তত লক্ষ্য থাকে না। কেবল তাহা নয়, যখন দেখা যায় যে কবিতাগুলি লেখিকার কত অল্প বয়সের লেখা তখন অনেকটা আশ্চর্য্য হইতে হয়, এবং ভবিষ্যতে কবির প্রতিভা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না। —'ভারতী' জৈষ্ঠ্য ১২৯৩। [১১১]

BHARATA KUSUMA—This is a collection of Poems written on a variety of subjects by a Hindu Lady who has already made her mark in the literary world by her excellent poetical production. She has had a wide range of subjects to choose her themes from and a pleasant variety of metre (including the blank verse) to clothe them in.

The poems generally indicate a delicacy of touch and tenderness of spirit reflecting the utmost credit on the fair writer. The effusions would meet with warm approbation, even if they came from the hand of a veteran writer of the Sterner Sex.

—The Indian Mirror. [১১২]

Reis and Rayyet, in an article headed "A Bengali Poetess" wrote in its issue of June 11, 1887 :—

The muse of the lady-writer of Kabitahara which was reviewed at some length in Mookerjee's Magazine and other periodicals some years ago, has not been idle.

She has given another proof of her powers, and Bharata Kusuma (Indian flowers of poesy) of which an advertisement has been apearing in this journal, has, rather too long, been lying on our table. For this apparent neglect we apologise to the authoress although the compliment she has paid in dedicating the work to us made the grateful task of reviewing it in our own columns one of some delicacy. The more

is this the case as it is impossible to speak of the work except in terms of high praise. Some of the poems originally appeared in high class vernacular periodicals like the Aryadarsan, and Bangadarsan, which fact in itself is no small testimony to their merits. Others are productions of her girlhood, which good in their way, are like her maiden work Kabitahar, still more interesting for the promise of future excellence which has been realized. What constitutes a special merit of the ever unhappy poetess, now cast out of all hope in the world by the death of her valetudinarian lord is the fact of her owing little to other for the culture she has attained. Belonging to the most respectable rank of Hindu Society, both on her father and father-in-law's side, immurred in the Zenana and never having even the advantage of the foreign Zenana teaching, the progress of her mind has chiefly been her own work, being only the easily development of considerable natural gifts. And a gem of a woman is she, in the perspicuity and delicacy of her mind, the richness of her fancy, and above all the purity of her life and conversation. And a true representative Hindu Lady in her cheerful spirit of sacrifice. It is much to be regretted that the merit of Bharata Kusuma has received but scant encouragement from the public.

The book has been edited by Baboo Mohindra Nath Roy, sub-editor of the Aryadarsana and the author of the lives of Hanemann and Akhoy Kumar Dutta in Bengali. Considering the difficulty of a Zenana lady's appearance in print, Baboo Roy, has by kindly seeing the work through the press, done a public service. [১১৩]

আভাষ—

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'আভাষ', প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে। গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলীর ১ পৃষ্ঠা থেকে ১১৯ পৃষ্ঠায় মোট ১৫৫টি ছোট-বড় মাপের কবিতার সমন্বয়ে এই গ্রন্থ। এখানে স্থান পেয়েছে নানান স্বাদের রচনা,—প্রকৃতি, প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি কবির নিবেদন, কবির জীবনের

চলার পথের অতীত এবং বর্তমানের নানান স্মৃতি বিষয়ক কবিতা এবং নারীর নানান অবস্থাকে আশ্রয় করে বেশ কিছু কবিতা।

প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি যথাক্রমে—'প্রকৃতি', 'বাদল', 'গোধূলী, 'গ্রাম্য-সন্ধ্যা', 'কোজাগর নিশি', 'বর্ষা', 'শিশির', 'সায়াহ্নে', প্রভৃতি—

হৃদয় পরাণ মোর, অইরূপে সদা ভোর,
আকুল হয়েছে আঁখি অইরূপ-সুধা পিয়া। [১১৪]

শৈশবের স্মৃতি কবিকে স্মরণ করায় জীবনের ফেলে আসা দিনগুলি

পড়িছে মনেতে মায়ের কাছেতে ভাই, বোন, সখা-সখী,
কত গল্প শুনি কত কি কাহিনী উপকথা 'চখা-চখী' [১১৫]

'প্রেম', 'অলসপ্রেম', 'অতৃপ্তি', 'পিপাসা', 'অভিনয়' প্রভৃতি কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রেমের অভিব্যক্তি,

ঘরে বসি পায় দেখা, প্রেম অন্ধরে! [১১৬]

নারীর কথা দেখি কবির প্রায় সবকটি কাব্যগ্রন্থেই, এ-গ্রন্থেও রচিত আছে বেশ কয়েকটি কবিতা, যথাক্রমে—'অবলা', পতিতা', 'পঠ-মঞ্জরী', 'অভাগিনী', প্রভৃতি।

মুখে প্রকাশিতে ভালবাসা জানে না নারী
তার গভীর প্রণয়-সিন্ধু নিথর বারি।
সমীর কাঁপায় কূলে, ঝড়েও গিরি না টলে,
আছে প্রবাদ, গণ্ডুষ জলে খেলে সফরী। [১১৭]

'শিখা'—

কবির এ-গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৯৬ সাল। প্রকাশক শ্রী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলীর ২৬৭ পৃষ্ঠা থেকে ৩৫৬ পৃষ্ঠা স্থান জুড়ে 'শিখা'। ছোট-বড় ভিন্নমাপের মোট ছিয়াত্তরটি কবিতা, নানান স্বাদের রচনায় এ-কাব্যগ্রন্থটি পরিপূর্ণ। প্রকৃতির কবি রচনা করেছেন,—'আষাঢ়ে', 'শ্রাবণে', 'ভাদরে', 'শরৎ-নিশীথে', 'প্রকৃতি' ইত্যাদি বেশ কিছু কবিতা যেখানে কবি প্রকৃতিকে ভালবেসে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন—

তোমার অতুল রূপে ভরে গেছে প্রাণ।
কেহ বেচে চুরী করে, কেহ কিনে রাখে ঘরে,
... ... [১১৮]

শুধু প্রকৃতির কবি নয়, গুণী জনেরও সম্মান জানিয়েছেন কবি তাঁর রচনায়,

মহাকবি বিশ্বপিতা, কে বুঝিবে তবগাথা

এ নাট্য সমাপ্তি কোথা-নর-ভাগ্য-শেষ ![১১৯]

নানান স্বাদের কবিতায় পূর্ণ এ-গ্রন্থে কবি তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন, যার ভাষা অতি সহজ-সরল এবং সাবলীল। এ-গ্রন্থে বেশ কিছু কবিতা আছে যা ঘটনাবহুল হলেও কাব্যিক রসে পূর্ণ,—'অদর্শনে-বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'সোনার তরীর-কোনও কবিতা পাঠে', 'ঈশ্বরী পাটনী', 'লছিমার প্রতি বিদ্যাপতি', 'সখীর প্রতি ডেস্‌ডিমোনা', ইত্যাদি। এছাড়া আছে প্রেমের কবিতা,—'তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার', 'ঈপ্সিতমিলন', 'কারে ভালবাসি', 'সুন্দরের প্রতি', 'কি দিব তোমায়'। সময়ের সঙ্গে পা-মিলিয়ে চলবার বাসনা কবিকে করেছে ব্যাকুল, দিয়েছে কাব্যিক ভাষা। তাই লেখনীতে ফুটে ওঠে,—'শৈশবে', 'যৌবনে', 'প্রৌঢ়ে', 'স্থবিরে', 'জীব ও মৃত্যু' প্রভৃতি কবিতা। কবি এ-গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতায় বলেছেন,

মানব-জনম এই ক্ষুদ্র তরীখানি,
কিছু দিন তরঙ্গেতে হেলে হেলে দুলে,
মিশাবে বিস্মৃতি—গর্ভে এই শুধু জানি !
... ...
সন্ধ্যার সুবর্ণ-রাগে মরি পথ ভুলে—
কম্পিত এ শিখা ক্রমে হ'য়ে আসে ক্ষীণ ! [১২০]

সিন্ধুগাথা—

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর যে আটখানি কাব্যগ্রন্থ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার মধ্যে এই 'সিন্ধুগাথা' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩১৩ বঙ্গাব্দ। গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলীর ৩৫৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪০৯ পৃষ্ঠার মধ্যে নিবদ্ধ আছে সিন্ধুগাথার কবিতাগুলি, মোট আটত্রিশটি কবিতা, যথাক্রমে, 'সিন্ধু', 'সমুদ্রদর্শনে', 'জলধি', 'আমাদের কুটীর', 'অভিশপ্তা', 'ডলফিন্‌সনোজ', 'অচেনা', 'নব-বৈধব্য', 'চিত্রে', 'উপেক্ষিত', 'স্বপ্ন সম্ভাষণ', 'পালিত', 'নিরাভরণা', 'সমুদ্রস্নানে', 'মধ্যাহ্নে সমুদ্র', 'অপরাহ্নে', 'সন্ধ্যায়', 'পারাবার', 'খেলা', 'লুকোচুরি', 'প্রবাসে বর্ষা', 'শ্রাবণে', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'স্বাগত', 'সীমাদ্রি শিখরে', 'নদী-বধূ', 'তমসাতীরে', 'আয়েষা',

'ভাবনা', 'ধীরে', 'শিখাও', 'পূর্ণিমায়', 'মুগ্ধা', 'মধুমাসে মাধবী', 'চিত্র', 'সমুদ্র-গর্জন-শ্রবণে', 'হৃদয় ও সিন্ধু', 'সিন্ধুর প্রতি বিদায়োক্তি'।

উক্ত কবিতাগুলির শিরোনামেই বিষয়বস্তুর আভাষ মেলে। প্রকৃতির কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী যখনই মনে হয়েছে প্রকৃতিকে ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ রচনা করেছেন নানান বর্ণের কবিতা—কখনও বা বর্ষাকে ভালবেসেছেন যার প্রকাশ ঘটেছে তার রচনায়, কখনও বা কবির অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে —দিবসের নানান বর্ণের ছটায় রাঙিয়ে নেবার তাগিদে। তাই তো, কবির কলমে শোভিত হয়েছে একগুচ্ছ রচনা। নারী-হৃদয়ের ব্যথা কবি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, আর তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে কবিতায়,

অঙ্গে অঙ্গে মোর অতৃপ্ত পিয়াসা সে যে গো গিয়াছে রাখি ;—
... ... [১২১]

এরই ফাঁকে স্মরণ করেছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে কবি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। মাতৃভূমির প্রতি অবহেলা, শৃঙ্খলিত জননীকে অশ্রুমুক্ত করবার জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণ নিয়েছেন,

শ্যামলা সুজলা জননী তোমার
তোমারে স্মরিয়া মুছে অশ্রুধার।
"বন্দে মাতরং" বল একবার
সকলে মায়েরে ঘেরি ;
দাও মুছায়ে নয়নবারি। [১২২]

অর্ঘ্য—

এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে (১৩০৯ বঙ্গাব্দে, ১১ই আশ্বিন, মহালয়া)। গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলীর ১২১ থেকে ১৭৭ পৃষ্ঠা, এ-কাব্য গ্রন্থে পঁয়তাল্লিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এখানের কবিতায় প্রথমেই কবির ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন,

কি দিয়ে পূজিব আজি—প্রফুল্ল প্রসূন—রাজি
শুকায়েছে—ফুল-সাজি, কালের উত্তপ্ত বায়! [১২৩]

প্রকৃতির কবির কলমে ফুটে ওঠে প্রকৃত ভালবাসার কথা,—যেখানে সবার সঙ্গে তাঁর ব্যতিক্রম,

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ ;
... .
তুমি ভালবাস রূপ-গৌরব,
সুকোমল তনু শিরীষপেলব
... ... [১২৪]

কবির কাছে তাই প্রকৃত পাওয়া ভালবাসা। নারী জীবনের বিড়ম্বনা কবিকে ভাবায়, তাই তাঁর লেখনী বলে,

স্বাধীন হৃদয় শুধু বিড়ম্বনা নারীদেহে ওরে সখী,
আপনার মাঝে ডুবিয়া আপনি, পরখি' দেখিও দেখি। [১২৫]

সমস্ত আশা-নিরাশা, প্রেম-ভালবাসা, চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে কবির যে অনুভূতি তা হোলো এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের, যেখানে মৃত্যু সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে তাঁকে নিয়ে যাবে এক অজানা দেশে, তার প্রতি কবির সাদর আমন্ত্রণ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখনীতে,

তোমারে ভাবিনে কেবা পর !
প্রতিদিনই গণ' দিন,
তবু নহে আশা ক্ষীণ ;—
হেন কত যুগ যুগান্তর ! [১২৬]

স্বদেশিনী—

এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। কবি এ গ্রন্থখানির প্রথমেই লিখেছেন—

ভারতের
স্বদেশ-ভক্ত নর-নারীর
করে

স্বদেশিনীকে
অর্পণ করিলাম।

রচয়িত্রী [১২৭]

পৌষ, ১৩১২

এ-গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে স্বদেশিকতার ছোঁয়া রয়েছে। আঠারোটি কবিতা যথাক্রমে,—'আশীর্ব্বাদ', 'রাখী সংক্রান্তি', 'আহ্বান গীত', 'যশোদার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি', 'শ্যামাপূজা', 'অঙ্গচ্ছেদ', 'রাখীমন্ত্র', 'মাতৃ-স্তোত্র', 'মিলন গীত', 'আগমনী', 'বঙ্গে ভঙ্গে কৃষকের গান', 'শিবাজী উৎসব', 'আদেশবানী', 'শ্যামাসঙ্গীত', 'কে যাবে ?', 'আত্মদ্রোহিতা, 'ঋণ-শোধ', 'সমুদ্র-গর্জন শ্রবণে', সমন্বয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলীর ৪১১-৪৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্থানে কবির এ নিবেদনে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেই সঙ্গে স্বদেশবাসীকে উদ্দীপিত হবার আহ্বান—

ঝটিকার মত আয়—উচ্ছৃঙ্খল—
—উদ্দাম বেগে ছুটিয়া—
ঘরভরা মোর সাধের ভাণ্ডার
চোরে ঐ নিল লুটিয়া। [১২৮]

রাখীবন্ধনের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান বিভেদ ভুলে সবাইকে এগিয়ে আসবার আহ্বান জানিয়েছেন কবি,

ভুলি হিন্দু মুসলমান
প্রীতিসূত্র কর দান ;
বাঁধ সূক্ষ্ম সূত্র-মূলে বিরাট জীবন।
কর মনে দ্রৌপদার বেণী বাঁধা পণ। [১২৯]

অকালবোধনে আগমনীগান গাইতে গিয়ে দেবীর কাছে কবি প্রার্থনা জানিয়েছেন

হৃদয়ে দেহ ভক্তি   বাহুতে দেহ শক্তি
দুর্বল সুতে ভবানী। [১৩০]

সমস্ত গ্রন্থে আঠারোটি কবিতাতেই কবি নানানভাবে স্বদেশের প্রতি সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্য। কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে,

দেহ দেহ নবশিক্ষা নবমন্ত্রে লহ দীক্ষা
ভুলাও ভারতে ভিক্ষা দেহ প্রাণে নব বল ; [১৩১]

আবার,

> সদা বীর-প্রসূ ভারতজননা
> বীর-রত্ন-মালে কোহিনূর মণি
> স্মর শিবময় শিবাজী কাহিনী
> সহায় ভবানী অমূল্য দান।[১৩২]

এবং

> বাঙ্গালী-বিহারী-শিখ-উৎকল,
> মারাঠা-পাঞ্জাবী-পাঠান-মোগল ; (ষষ্ঠ স্তবকের ১-২ পংক্তি)
> ... ...
> যেখানে একতা সিদ্ধি সেইখানে
> ... ... (অষ্টম স্তবকের ৩ পংক্তি)[১৩৩]

নারীকেও কবি গুরুত্ব দিয়েছেন, তাকে উদ্দীপিত করতেও তাই কবির প্রচেষ্টার অন্ত নেই,

> এমনি প্রচণ্ড নৃত্যে নারী গরীয়সী
> নেচেছিল ঝান্সীর শ্রেয়সী মহিষী। (পংক্তি ১৩-১৪)
> ... ...
> গগন কম্পিত করি ?—মহাঘোর রোলে (পংক্তি ৩১)[১৩৪]

অশ্রুকণা—

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অশ্রুকণা' উৎকর্ষতা এবং জনপ্রিয়তা দু-দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৮৭ সাল। 'অশ্রুকণা' নামকরণের মধ্যে কাব্যবস্তুর কিছুটা পরিচয় আছে। ভূমিকায় কবি বলেছেন—"অধিকাংশ কবিতা শোক সম্বন্ধীয় বলিয়া পুস্তকের নাম 'অশ্রুকণা' রহিল। গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলীর ১৭৯ থেকে ২৬৬ পৃষ্ঠায় 'অশ্রুকণা'র কবিতা গুলি স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থকর্ত্রীর হৃদয়ের অপরিসীম বেদনা এবং শোকের মধ্যে 'অশ্রুকণা'র কবিতাগুলি রচিত। সেদিক থেকে অনুভূতি, স্বাভাবিকতা এবং আকুলতায় অনবদ্য হয়ে ওঠার সুযোগ ও পরিসর ছিল কবিতাগুলিতে। গীতি কবিতার যে সুর-মূর্চ্ছনা কবিতাকে একটি বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় নিটোল করে, 'অশ্রুকণা' সেই ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত। তাই অশ্রুকণার আবেদন ও আহ্বান দুই-ই কালজয়ী।

মানব-প্রকৃতির যে বিশেষ 'অবস্থায়' কবিতাগুলির জন্ম, সে অবস্থায় ছবি সর্বকালীন, সেদিক থেকেও 'অশ্রুকণা'র কাব্যমূল্য অপরিসীম। এ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশকালে অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে, এর কারণ এর কবিতায় সার্বজনিক আবেদন ছিল প্রকটভাবেই।

'অশ্রুকণা' মোট নিরানব্বইটি কবিতা সম্বলিত গ্রন্থ। গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা শোক সম্বন্ধীয় হলেও, অন্য কবিতাও আছে। মোটামুটিভাবে কবিতাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করলে দাঁড়ায়,—শোক সম্বন্ধীয়, অপত্য স্নেহ, ভগবৎপ্রেম, নিসর্গপ্রীতি এবং দাম্পত্য প্রণয়। শোক সম্বন্ধীয় কবিতার মধ্যে—'একটি বিধবার প্রতি', 'হায় কেন ? একি হৃদয়পাখী', 'কতদিন', 'মরীচিকা', 'কোথায়', 'আকুল ব্যাকুল হৃদি', 'ছাই', 'অশ্রু', 'বিষাদ', 'শ্মশান', 'বিধবা', 'তুমি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতিপ্রেমের অর্থাৎ নিসর্গ প্রীতির কবিতাগুলির মধ্যে—'পূর্ণিমাগীতি', 'মাধবী', 'গোলাপ', 'পাখী', 'গ্রাম্যছবি', 'যমুনাকূলে', 'পাড়াগাঁ', 'বর্ষা', 'গার্হস্থ্যচিত্র', 'প্রজাপতি', 'জ্যোৎস্না', 'কাননে', 'পর্বতপ্রদেশ' প্রভৃতি। দাম্পত্য প্রণয়ের কবিতার মধ্যে—'প্রেম', 'পিপাসা', 'সুধা না গরল', 'উৎকন্ঠিতা', 'প্রিয়তম', 'বাঁশরী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গগত দিক দিয়ে পৃথক হলেও প্রায় সমস্ত কবিতাতেই কবির শোকদগ্ধ হৃদয়ের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য বিষয়বস্তুর ওপর এই শোকের ছায়া কবিতার ওপরেও কিছুটা বাড়তি মাধুর্য আরোপ করেছে। বেদনা এবং আনন্দ একসঙ্গে মিশে কোন কোন কবিতায় একটি অনাস্বাদিত রসের সৃষ্টি করেছে। শোক তাই কাব্যের কোথাও অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। কবির নিজের কথায় 'নয়নে প্রেমের সিন্ধু, হৃদয়ে সৌন্দর্যরাশি'। এরই রসসিঞ্চনে 'অশ্রুকণা' পরিপুষ্ট।

বৈধব্য অবস্থার ছবিগুলি কবি অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অবস্থা এ সময় তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যদিয়ে ব্যক্ত করেছেন,—'প্রাণের মাঝে শ্মশানভূমি, চারিদিকে উড়ছে ছাই।'

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর অশ্রুজল কোথাও মুক্তায় পরিণত হয়েছে। তাঁর শোকাশ্রু হোলো,

এ শোকাশ্রু ! নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা।
এ শোকাশ্রু ! বাসনার অনন্ত পিপাসা-মাখা।

এ শোকাশ্রু ! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু ! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন।[১৩৫]

এই শোকাশ্রুতেই পরিপূর্ণ কবির অন্তর। তাঁর সমস্ত অনুভূতি স্বামীবিরহে কেন্দ্রীভূত,—

তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
তার নামে সব সুখ।
তার প্রেম-আশ তাহার আবাস,
তাহার আমি—এ বাদ,
তাহার এ দেহ তাহার বিরহ
ত্যজিতে নাহিক সাধ ![১৩৬]

তাঁর মানসিক অবস্থার বিষয়ে একসময় তিনি নিজেই অকপটে বলেন,

মনের মাঝার যদি দেখাবার হ'ত, সই
তবে দেখাতাম খুলে, কত যে যাতনা সই ![১৩৭]

এ জীবন সম্পর্কে তাই কবির প্রশ্ন জেগেছে,

এ দীর্ঘ জীবন পথে একেলা কি হবে যেতে ?—
পথে কি হবে না দেখা সঙ্গে কভু তার !
কে ব'লে দেবে গো মোরে, পাব কত দিন পরে ?—
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার ![১৩৮]

দীর্ঘ দিন এ বিরহ-যাতনা সহ্য করে তিনি কাতর হয়ে পড়েছেন। তিনি অধীর হয়ে পড়েছেন, তাই তিনি বলেছেন,—

ক্রমে তার অদর্শন হ'ল অর্দ্ধ যুগ ;—
ফাটিল না, ফাটিল না তবু পোড়া বুক ![১৩৯]

অধৈর্য হলেও কিন্তু কবি কোন কোন মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে তিনি তো স্বামী ছাড়া নন। তাঁর সমস্ত অস্তিত্বে স্বামীর স্পর্শ সুস্পষ্ট, তাঁর সমগ্র জীবনই তো স্বামীর স্মৃতিকে ঘিরে,

তুমি কি গিয়াছ চলে ? নানা, তা ত নয়।
যদিন বাঁচিব আমি, তদিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো শুধু তোমা-ময়।[১৪০]

কিন্তু এ-সান্ত্বনা তো ক্ষণিকের জন্য। জীবজগতের সবকিছুর মধ্যে কবি

তাঁর বিষাদময় অন্তরের সুর-সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর যাতনা তো তাঁর একার নয়। তাঁর মনে হয়েছে,

তটিনী যেতেছে বহি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
দুখীর রোদন সম, বাঁধিয়া বাঁধিয়া!
পূর্ণিমার নিশি যেন বিবশা হইয়া,
তটিনীর উপকূলে পড়েছে শুইয়া![১৪১]

মলিন-মাধবীকে দেখে কবি নিজের অবস্থার সঙ্গে তার তুলনা করবার চেষ্টা করছেন, মেলাতে চেষ্টা করছেন তার সঙ্গে নিজের দুঃখকে। তাই তিনি মাধবীকে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেছেন,—

তুমিও কি অভাগিনী?
তোমারো কি গেছে, নাথ, চিরসুখ, মধুমাসে?
কাঁদিবে আমার মত মলিন বৈধব্য-বাসে![১৪২]

বস্তুজগতের এত কিছুর সমারোহ দেখে কবির মনে হ'য় স্বামীবিরহে বিরহিনীর কাছে এ-সমস্ত সমারোহ মূল্যহীন, সবকিছুই তো তার শোকের কাছে ম্লান হয়ে যায়। কবির সামনে একান্ত মূল্যবান মনে হয়েছে,

বৃথা কেন, এই পাঠাগার,
জীবনের নাই-পরপার!
ঘুচে গেল যত গণ্ডোগোল,
বল হরি, হরি, হরিবোল![১৪৩]

কবির এই ক্রন্দন শোকসর্বস্ব নয়, তাঁর ব্যাকুল হৃদয়ের প্রেমাঞ্জলি।

এ হৃদয়ে—এই সিন্ধু কভু না শুকাবে,
তোমারি উদ্দেশে, নাথ, সতত বহিবে।[১৪৪]

তাঁর এই শোকাশ্রুর মধ্যে কোথাও ফাঁকি নেই। হাহাকার আছে কিন্তু শূন্যতা নেই, দুঃখ বেদনা আছে, কিন্তু নৈরাশ্য নেই। এই জন্যেই হয়তো দাম্পত্য প্রণয় ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। কবির বক্তব্যের সারকথা,

জানি শুধু—এই শুধু, তুমি মহা আকর্ষণ!

এবং এই অস্তিত্ব, এই অনুভূতির সঙ্গে আছে তাঁর আন্তরিক আত্মসমর্পণ,

কেন ভালবাসি তোমা, তাহা আমি নাহি জানি ;
তোমায় যে বাসে ভাল, সে পায় তা, অনুমানি ![১৪৫]

প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, গিরিন্দ্র-মোহিনীর প্রকৃতিটি প্রকৃতই কবিজনোচিত, যেখানে গর্ব নেই, দ্বেষ নেই, নেই কোনো আড়ম্বর, শান্ত মৃদু কথাবার্তায় মিষ্ট মধুর বচনে অবরোধবাসিনী কবি যেন নিতান্তই 'প্রকৃতিপালিকা'। কবির কাব্য রসাস্বাদন করতে গেলে তাঁর এই প্রকৃতিটি স্মরণ করা একান্তই কর্তব্য। আড়ম্বরহীন শান্ত মৃদু মিষ্ট মধুর বচনের গুণেই তার কাব্য হয়েছে মধুর। কবির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি তাঁর কাব্যকে কতটা মর্ম্মস্পর্শী করতে পেরেছে দু'একটি উদাহরণ দিয়ে তা বোঝানো যেতে পারে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে পূর্ণতা দেয় যে ফুল, সেই গোলাপ ফুলকে নিয়ে তিনি বলেছেন—

তুই কিরে নিরমল প্রেম,
ধরায় ফুটিলি হয়ে ফুল ?
তাই কি রে তোরে হেরে সদা,
প্রাণ হয় এমন আকুল ![১৪৬]

এই স্বাভাবিকতার মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি করানোই হোলো কবির কাব্য-গুণের বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যের ভাষা সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যার ফলে কাব্যগুণ বৃদ্ধি করেছে। মনে হয় অসীম যেন সীমার মাঝে এসে ধরা দেয়,

প্রেম যদি কালকূট হবে,
ত্যজিতে পারি না কেন তারে ?
রাখি কেন বুকের মাঝারে ?
মাখি কেন ছানিয়া ছানিয়া ?
—তবে বুঝি, প্রণয় অমিয়া ?—[১৪৭]

চিত্রধর্মীতার কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী হলেন যথাযথ চিত্রকর। তাঁর তুলি যেমন নিপুন, তেমনি সুস্পষ্ট। নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের দুটি সার্থক দৃষ্টান্ত হল তাঁর 'গ্রাম্যছবি' ও 'গার্হস্থ্যচিত্র' কবিতা দু'টি। গ্রাম বাঙলার অনাদিকালের

এবং চিরকালের বাঙালি পরিবারের ছবি অপরূপ সুষমায় চিত্রিত এই কবিতা দু'টিতে,

পিঁজরায় বস্ত্র বাঁধা, 'বউ-কথা' কহে কথা,
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে ;
মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা ;
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।[১৪৮]

আবার, একটি অনবদ্য ছবি—

ফুট্-ফুটে জোছনায়, ধব্-ধবে্ আঙ্গিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে,
গৃহ-কাজে অবসর পেয়ে।[১৪৯]

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী উনবিংশ শতকের কবি, তাঁর কাব্য আজ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আজও যদি কখনও কোন শোকদগ্ধ তাপিত হৃদয়ে অথবা সৌন্দর্যস্পৃহার আকুল আর্তিতে কোন কাব্যরসিক 'অশ্রুকণা'-র পাতায় মনোনিবেশ করেন, তবে তিনি উপভোগ করবেন, আলোড়িত হবেন—যে আলোড়ন শুধু বিস্ময়ের নয়, পুলক এবং বিষাদেরও। জীবনে যেমন 'অশ্রুকণা'-র আবেদন সর্বজনীন এবং সর্বকালীন, কাব্যজগতেও তেমনি 'অশ্রুকণা' অনন্য এবং অনবদ্য। কাব্যপাঠক কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের এ-কাব্য সম্পর্কে যে মত প্রকাশ পেয়েছে তা হোলো,

স্বামীরে আছিলে আগে, হে সুন্দরী, এবে তুমি
বিপুল বঙ্গবাসীর আপনার-জন।[১৫০]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী রচিত ন' খানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অশ্রুকণা' কাব্যগ্রন্থটি সর্বোৎকৃষ্ট। তদানীন্তন পত্র-পত্রিকায় এ-কাব্যগ্রন্থের বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়, এরমধ্যে সংগৃহীত কিছু উপস্থাপিত হোলো—

পুস্তকখানি অল্পদিন হইল বাহির হইয়াছে। আমরা ইতিমধ্যে সমগ্র পুস্তকখানি দুই-তিনবার পড়িয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর যে যথেষ্ট গুণপণা প্রকাশ পাইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। গ্রন্থকর্ত্রী বাঙ্গলায় আর অপরিচিত থাকেন, আমরা ইচ্ছা কার

না। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকে আমরা জানিনা। তবে এই পর্য্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, তিনি একজন বঙ্গবিধবা। ইঁহার বৈধব্য দশায় বাঙ্গলাভাষা উপকৃত হইলেন। তিনি বিধবা না হইলে এই অশ্রুকণা বাঙ্গলা ভাষা অলঙ্কৃত করিত কি না সন্দেহ। গ্রন্থকর্ত্রী দুঃখ করিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "সংসার সুখের অভিলাষী, শোকাশ্রু কি কাহারও ভাল লাগিবে।" আমরা তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছি, ভাল লাগিবে। ভাল লাগিয়াছে! প্রাণ ভাসাইয়া অন্যের গলা ধরিয়া যে কাঁদিতে জানে, তার ক্রন্দনে পাষাণ-সদৃশ প্রাণও গলে। কে এমন আছেন বঙ্গ-বিধবার এরূপ ক্রন্দনে যাঁর প্রাণে আঘাত না লাগে :

মরিয়া বাঁচিয়া যাই, চলে যাই যে নগর,
প্রাণের দেবতা মম বাঁধিছেন যেথা ঘর।
হে ধরণি, খুলে নে গো, স্নেহের শিকল তোর!
দে গো ছেড়ে, যাই উড়ে, জনম-তরেতে মোর!
কি আশে রাখিবি পুষে এই তুচ্ছহীন প্রাণ,
কোন্ কাজ হবে, ধরা, আমা হ'তে সমাধান!

(গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ২০০ 'জীবন হইতে যদি' ৯-১৪ পংক্তি)

বঙ্গ-বিধবার এই বিলাপে আমাদের প্রাণ অবসন্ন, শরীর নিস্তেজ, নয়ন অশ্রুপূর্ণ; বঙ্গ-বিধবার গভীর প্রেমের আত্মত্যাগ হৃদয়কে বৈরাগ্যে লইয়া যায়; দেখ তাহা কত গভীর, কত মধুর :—

আজীবন ও মুরতি বসায়ে মানসে,
প্রেমের কুসুম-হার দিব গলদেশে!
এ হৃদয়ে—এই সিন্ধু কভু না শুকাবে,
তোমারি উদ্দেশে, নাথ, সতত বহিবে।
… … … …
… … … …

(গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ২০৬, 'প্রেমাঞ্জলি', ১৭—২০ পংক্তি)

তারপর মৃত পতির জন্য সাধ্বীর হৃদয়ের প্রার্থনা দেখ সে মধুর প্রার্থনায় কত আত্মত্যাগের ভাব।

এই ভিক্ষা দাও নাথ,
যা দেবে আমারে দিও, দুঃখ বা যাতনা ভার!

ব্যথিত সে সখা মোর, যেন নাহি দহে আর।
বড় সে যাতনা পেয়ে ধরা হ'তে চলে গেছে।
স্নেহেতে ডাকিয়া তারে, লও নাথ, লও কাছে।
সেই ক্ষীণ দেহ খানি, শীতল শান্তির ছায়,
বিরাম-শয়নে যেন আরামে ঘুমাতে পায়!"

(গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ২০৪, 'ভিক্ষা-গীতি' দ্বিতীয় সংস্করণ ২-৮ পংক্তি)

এরূপ সতী যে স্বামীর ভাগ্যে মিলে সে চির অমর, ৺নরেশচন্দ্র দত্ত বাঙলা প্রদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিত্বশক্তি কেবল বিলাপ উক্তিতেই প্রস্ফুটিত না তা নয়, কবির প্রকৃতির বর্ণনা আরও মধুর, সমস্ত কবিতা তুলিয়া না দেখাইতে পারিলে সাধ পুরে না। সর্বত্রই নতুন চিন্তা, নতুন ভাব, নতুন গান সে সব শুনিতে শুনিতে প্রাণ মোহিত; হৃদয় স্তম্ভিত। এরূপ প্রতিভাময়ী ললনার আবির্ভাবে বাঙালা আজ ধন্য। এতদিনে এদেশে স্ত্রী শিক্ষার সুফল ফলিয়াছে। এ দেশে গিরীন্দ্রমোহিনীর সমতুল্য মহিলাকবি আরও আছেন বলিয়া আমরা জানি না। তাঁহার "পূর্ণিমা গীতি"; "যমুনা কূলে", "গ্রাম্যছবি", "গার্হস্থ্যচিত্র", "জ্যোৎস্না", "বর্ষা", "বরুণযাত্রা", "সমাধিস্থান", "পর্বতপ্রদেশ" প্রভৃতি কবিতায় ঐ শক্তি আশ্চর্য্যরূপ বিকশিত হইয়াছে। নমুনা স্বরূপ একটি স্থান দেখাইব।

শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্য্য-রাশি
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ' মা বলিছে 'আয় চাঁদ'
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে।
মা নাই ঘরেতে যার ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে!
চাঁদে-চাঁদে হাসা-হাসি, চাঁদে-চাঁদে মেশামেশি
স্বর্গে-মর্ত্তে প্রভেদ কি আছে!

(গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ২২৬-২২৭, গার্হস্থ্যচিত্র, পংক্তি ১৭-২৪)

প্রশংসার কথা অনেক বলিয়াছি আর বলা সম্ভব নয়। আমরা তাঁহার গ্রন্থখানি সমগ্র তুলিয়া না দিতে পারিলে সকল সৌন্দর্য দেখান যায় না……… এ পুস্তকখানি ঘরে ঘরে থাকে এই ইচ্ছা, এ ইচ্ছা কি সফল হইবে?……[১]

Asrukana is a collection of poetical pieces of singular pathos and beauty of expression. The authoress is Sreematty Girindra Mohini Dasi, a Hindu widow belonging to a very respectable family of Calcutta. It is a series of mournful songs that the reader is here presented with and they must touch a sympathetic cord in every heart that can feel. There is a singular appropriateness in the title of the work, and in its pious dedication to the memory of the husband of the fair writer.

—**The Indian Nation,** August 28th, 1887[১৫২]

Asrukana by GIRINDRA MOHINY DASI—The authoress is not unknown to Bengali readers. She has already published two or three poems by which she is favourably known, but between these poems and this is a difference that hardly admits of being measured. The difference is like the difference of one age from another, of one world from another. Something has happened to the authoress and that something has completely changed her own perspective in relation to the world, and the world's perspective in relation to her. She has become, for the World, sad, but not sordid, perhaps sweeter ; and her world has become for her deeper, Vaster and holier, who ever reads this poem will see what has wrought this marvellous change. It is Fate's saddest decree for the Hindu Woman. But whoever feels the nature of the change that decree has wrought, will say that she has risen superior to Fate as indeed all true womanhood must.

This is poetry in life—and as the expression of that poetry, Asrukana is the History of the soul of a noble Hindu Woman.

We have read Srimati Girindra Mohiny's poems in a reverential spirit. The poems are all of a lyrical description. The lyre is soft, sweet and tender, but awfully strong. It sends no weak or uncertain note. Within its inexpressible softness is found a toughness that indicates very strong fibre. This is true womanly lyre—the lyre of her who is an enigma by reason of her mysterious embodiment of softness and vigour.

The tone, of the poems, is inexpressibly gentle, inexpressibly pure, and inexpressibly tender and affectionate. It is the tone of a World-Mother. The perspective, disclosed in the poems is a perspective of Heaven and Earth, in sweet soothing, serene and sainty combination.

Bengal should be proud of this poem.

The Calcutta Review, Oct. 1887[১৫৩]

সূত্র নির্দেশ

১. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্রী অনঙ্গমোহিনী দেবীর নিবেদন।

২. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্রী অনঙ্গমোহিনী দেবীর নিবেদন, আগরতলা—নূতন হাবেলী, উজীর বাড়ীতে বসে লেখা; চার স্তবক, —যথাক্রমে প্রথম স্তবকের ১, ২ পংক্তি, দ্বিতীয় স্তবকের ৪, ৫ পংক্তি, তৃতীয় স্তবকের ৫, ৬ পংক্তি এবং চতুর্থ স্তবকের ৫, ৬ পংক্তি।

৩. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষা নিশায়' কবিতার দ্বিতীয় স্তবক, পৃষ্ঠা ১৪, অনঙ্গমোহিনী দেবী।

৪. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'ভালবাসার পরিমাণ' কবিতার তৃতীয় স্তবক, পৃষ্ঠা ১৮।

৫. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'স্বপ্ন' কবিতার চতুর্থ স্তবক, পৃষ্ঠা ২৩।

৬. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'মৃত্যু' কবিতার চতুর্দশ স্তবক, পৃঃ ৫২।

৭. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'নীরব' কবিতার দ্বাদশ স্তবক, পৃঃ ৫৬।

৮. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী 'বিদায়' কবিতার দ্বাদশ স্তবক, পৃঃ ৮০।

৯. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'স্মৃতি-চিহ্ন' কবিতার অষ্টম স্তবক, পৃঃ ৮৩।

১০. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'সমদুঃখিনীর প্রতি' কবিতার প্রথম স্তবক, পৃঃ ৮৪।

১১. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'সমদুঃখিনীর প্রতি' কবিতার সপ্তম স্তবক, পৃঃ ৮৬।

১২. 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ভূমিকা, শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সম্বলপুর, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৩।

১৩. 'প্রীতি' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'নিবেদন' কবিতার ১১-১২ পংক্তি, পৃঃ ১।

১৪. 'প্রীতি' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'সাধনা' কবিতার তৃতীয় স্তবক, পৃঃ ৩।

১৫. 'প্রীতি' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'বাসনা' কবিতার পঞ্চম স্তবক পৃঃ ১০।

১৬. 'প্রীতি' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'নিশীথে' কবিতার ৩৫-৪২ পংক্তির, পৃঃ ২৬।

১৭. 'প্রীতি' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'নিয়তি', কবিতার ১৫ পংক্তি, পৃঃ ৩১।

১৮. 'প্রীতি' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'বর্ষ', কবিতার চতুর্থ স্তবক, পৃঃ ৪৩।

১৯. 'প্রীতি' কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'নববর্ষে' কবিতার ষষ্ঠ স্তবক, পৃঃ ৫৭।

২০. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘আমার কবিতা’ কবিতার ১৮-২১ পংক্তি, পৃঃ ৬৬।

২১. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘গিয়াছে’, কবিতার তৃতীয় স্তবক, ৯-১০ পংক্তি, পৃঃ ১৯।

২২. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘সুপ্তি-কামনা’ কবিতার ১১-১২ পংক্তি, পৃঃ ২১।

২৩. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘বিজন কুসুম’ কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে, ৩-৪ পংক্তি, পৃঃ ৩৫।

২৪. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘বিষাদে’ কবিতার ১৭-১৮ পংক্তি, পৃঃ ৪৮।

২৫. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘নিরাশায়’ কবিতার দ্বিতীয় স্তবক, ৫-৮ পংক্তি, পৃঃ ৫৪।

২৬. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘প্রভাতে’ কবিতার তৃতীয় স্তবক, পৃঃ ৩২।

২৭. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘ফুল’ কবিতার প্রথম স্তবক, ১-৩ পংক্তি, পৃঃ ৩৩।

২৮. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘বর্ষায়’ কবিতার ১৭-১৯ পংক্তি, পৃঃ ৩৯।

২৯. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী. ‘বসন্ত’ কবিতার ১-৩ পংক্তি, পৃঃ ৬০।

৩০. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী বেবী, ‘পদ্মায়’ কবিতার দ্বিতীয় স্তবক, পৃঃ ৫০।

৩১. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ’ কবিতাব ৭-৮ পংক্তি, পৃঃ ৩৭।

৩২. ‘প্রীতি’ কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ‘বাঁশী’ কবিতার ১১-১২ পংক্তি, পৃঃ ৬২।

৩৩. ‘অবলাবিলাপ’ কাব্যগ্রন্থ অন্নদাসুন্দরী দেবী, ‘বাণী বন্দনা’ কবিতার ১১-১২ পংক্তি, পৃঃ ১।

৩৪. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'বিধাতার প্রতি' কবিতার ১৫-১৬ পংক্তি, পৃঃ ৪।

৩৫. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'মাতার প্রতি' কবিতার ১-২ পংক্তি, পৃঃ ৬।

৩৬. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'পিতার প্রতি' কবিতার ৩-৪ পংক্তি, পৃঃ ৭।

৩৭. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'সমবয়স্কার প্রতি' কবিতার যথাক্রমে ২৭-২৮ এবং ৪১-৪৪ পংক্তি, পৃঃ ৯-১০।

৩৮. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'সহোদর প্রতি' কবিতার (গৃহপানে চাহিয়া) শিরোনাম স্তবকের ১১-১২ পংক্তি, পৃঃ ১২।

৩৯. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'কালের প্রতি' কবিতার যথাক্রমে ৩-৪ পংক্তি, পৃঃ ১৩ এবং ২৫-২৬ পংক্তি, পৃঃ ১৪।

৪০. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী (শূন্যময় স্বামী-গৃহ ত্যাগ ও পিতার শূন্যগ্রহ দর্শন করিয়া) শিরোনাম কবিতার ১৭-২০ পংক্তি, পৃঃ ১৬।

৪১. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, (ধুতুরা ফুলের সহিত মনোদুঃখকথন) শিরোনাম কবিতার ১৭-১৮ পংক্তি, পৃঃ ১৭-১৮।

৪২. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'নয়নের প্রতি' কবিতার ১৯-২১ পংক্তি, পৃঃ ২১।

৪৩. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'সন্ধ্যাদর্শনে' কবিতার ২১-২২ পংক্তি, পৃঃ ২৫।

৪৪. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী 'বিলাপের প্রতিধ্বনির প্রতি' কবিতার ৬-৮ পংক্তি, পৃঃ ২৮।

৪৫. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'সমীরণ প্রতি' কবিতার ৩১-৩২ পংক্তি, পৃঃ ৩০।

৪৬. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'স্মরণের প্রতি' কবিতার ৭-৮ পংক্তি, পৃঃ ৩২।

৪৭. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'শিবালয় দর্শনে' কবিতার ১৫-১৮ পংক্তি, পৃঃ ৩৪।

৪৮. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'দিবা অবসান' কবিতার ১-২ পংক্তি, পৃঃ ২২।

৪৯. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'পদ্মিনীর প্রতি' কবিতার ৯-১০ পংক্তি, পৃঃ ২৩।

৫০. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'গোধূলিদর্শনে' কবিতার ৭ ৮ পংক্তি, পৃঃ ২৪।

৫১. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'রজনীদর্শনে' কবিতার ৯-১০ পংক্তি. পৃঃ ২৬।

৫২. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'অমাবস্যা নিশার প্রতি' কবিতার ১৭-১৮ পংক্তি, পৃঃ ২৭।

৫৩. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'প্রভাতদর্শনে' কবিতার ১১-১২ পংক্তি, পৃঃ ৩৩।

৫৪. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী, 'আশার প্রতি' কবিতার ১৫-১৮ পংক্তি, পৃঃ ৩২।

৫৫. 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাসুন্দরী দেবী 'মাতৃভূমির প্রতি বিদায় যাচ্ঞা' কবিতার ৯-১০ এবং ৪৩-৪৮ পংক্তি, পৃঃ ৩৷-৩৭।

৫৬. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, ৭-১০ পংক্তি, পৃঃ ১।

৫৭. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, ৩৩-৩৬ পংক্তি, পৃঃ ২।

৫৮. 'দুঃখমালা, কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, ৭৩-৭৬ পংক্তি, পৃঃ ৪।

৫৯. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, ১৭৭-১৮০ পংক্তি, পৃঃ ১০।

৬০. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, ১৮৭-১৯০ পংক্তি, পৃঃ ১০।

৬১. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, দ্বিতীয় ভাগ, ৯—১০ পংক্তি, পৃঃ ১২।

৬২. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, দ্বিতীয় ভাগ, ৪৯-৫০ পংক্তি, পৃঃ ১৪।

৬৩. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, দ্বিতীয় ভাগ, ৯৩-৯৬ পংক্তি, পৃঃ ১৬।

৬৪. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, তৃতীয় ভাগ, ১৫-১৬ এবং ১৯-২০ পংক্তি, পৃঃ ১৭।

৬৫. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, তৃতীয় ভাগ, ৪৫-৪৬ এবং ৫৯-৬০ পংক্তি, পৃঃ ১৯।

৬৬. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, তৃতীয় ভাগ, ৭৩-৭৫ পংক্তি, পৃঃ ২০।

৬৭. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, তৃতীয় ভাগ, ১১৭-১২০ এবং ১৩৩-১৩৪ পংক্তি, পৃঃ ২২-২৩।

৬৮. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, চতুর্থ ভাগ, ৫-৮ পংক্তি, পৃঃ ২৪।

৬৯. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, চতুর্থ ভাগ, ১২৫-১২৮ পংক্তি, পৃঃ ৩০।

৭০. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, চতুর্থ ভাগ, ১৩৭-১৪০, পংক্তি, পৃঃ ৩০।

৭১. 'দুঃখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, দ্বিতীয় সংস্করণ, (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

৭২. 'কল্পনাকুসুম', কাব্যগ্রন্থ, কামিনী সুন্দরী দেবী, 'আমাদের দশা' কবিতার প্রথম স্তবক, পৃঃ ১।

৭৩. 'কল্পনাকুসুম', কাব্যগ্রন্থ, কামিনী সুন্দরী দেবী, 'আমাদের দশা' কবিতার দ্বিতীয় স্তবক, পৃঃ ১।

৭৪. 'কল্পনাকুসুম', কাব্যগ্রন্থ, কামিনী সুন্দরী দেবী, 'আমাদের দশা' কবিতার দ্বাদশ স্তবক, পৃঃ ৬-৭।

৭৫. 'কল্পনাকুসুম', কাব্যগ্রন্থ, কামিনী সুন্দরী দেবী, 'বসন্ত পঞ্চমী' কবিতার দশম স্তবক, পৃঃ ৯।

৭৬. 'কল্পনাকুসুম', কাব্যগ্রন্থ, কামিনী সুন্দরী দেবী, 'পক্ষীমাতা' কবিতার, ষষ্ঠ বিংশতি স্তবক, পৃঃ ১৫।

৭৭. 'কল্পনাকুসুম', কাব্যগ্রন্থ, কামিনীসুন্দরী দেবী, 'বিদ্যা' কবিতার সপ্তম স্তবক, পৃঃ ১৭।

৭৮. 'কল্পনাকুসুম', কাব্যগ্রন্থ, কামিনীসুন্দরী দেবী, 'স্বর্গীয় মাতা', কবিতার সপ্তম স্তবক পৃঃ ২০।

৭৯. 'কল্পনাকুসুম', কাব্যগ্রন্থ, কামিনীসুন্দরী দেবী, 'অভাগিনীর বিলাপ' কবিতার, ৩৯-৪০ পংক্তি, পৃঃ ৫৮ ; ১১১-১১২ পংক্তি, পৃঃ ৬২ এবং ২৯৩-২৯৬ পংক্তি, পৃঃ ৭৩।

৮০. 'কল্পনাকুসুম', কাব্যগ্রন্থ, কামিনীসুন্দরী দেবী, 'নব্যউন্নতিশীলার মনের কথা' কবিতার অষ্টাদশ স্তবক, পৃঃ ৮২।

৮১. 'কল্পনাকুসুম', কাব্যগ্রন্থ, কামিনীসুন্দরী দেবী, 'বিদ্যাসাগর' কবিতার ১৭-২০ পংক্তি, পৃঃ ৯৯।

৮২. 'কল্পনাকুসুম' কাব্যগ্রন্থ, কামিনীসুন্দরী দেবী, 'আমার মনের কথা' কবিতার ৫২-৫৪ পংক্তি, পৃঃ ৯৩।

৮৩. চতুরঙ্গ পত্রিকা ১৩৯৭, আষাঢ় সংখ্যা, কবিকৃষ্ণকামিনী : 'চিত্তবিলাসিনী'—বসন্তকুমার সামন্ত, হইতে সংগৃহীত, পৃঃ ২১৬।

৮৩(১) চতুরঙ্গ পত্রিকা ১৩৯৭, আষাঢ় সংখ্যা, কবি কৃষ্ণকামিনী ঃ 'চিত্তবিলাসিনী'—বসন্তকুমার সামন্ত, হইতে সংগৃহীত, পৃঃ ২১৭।

৮৪. চতুরঙ্গ পত্রিকা ১৩৯৭, আষাঢ় সংখ্যা, কবি কৃষ্ণকামিনী : 'চিত্তবিলাসিনী'—বসন্তকুমার সামন্ত, হইতে সংগৃহীত, পৃঃ ২১৭।

৮৫. চতুরঙ্গ পত্রিকা ১৩৯৭, আষাঢ় সংখ্যা, কবি কৃষ্ণকমিনী : 'চিত্তবিলাসিনী'—বসন্তকুমার সামন্ত, হইতে সংগৃহীত, পৃঃ ২১৭।

৮৬. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'ব্রহ্মবন্দনা' পৃঃ ৩।

৮৭. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'বিরহিনীর উল্লাস', পৃঃ ৮।

৮৮. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'কামিনীর উক্তি', পৃঃ ১৫।

৮৯. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'উপনায়কের উক্তি', পৃঃ ৫৩।

৯০. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'কোন বিরহিণীর বিলাপ' পৃঃ ২৭।

৯১. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'নায়ক আশ্রয়ে নায়িকা জাগরণে যামিনী যাপন করিয়া প্রভাতে সখি প্রতি বলিতেছেন', পৃঃ ২৪।

৯২. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'পুরুষ ও কামিনী', পৃঃ ১৪—১৮।

৯৩. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'দয়া ও ধর্ম', পৃঃ ৭১।

৯৪. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'প্রবীনা রমণী ও নবীনা দুই ভগ্নীর কথোপকথন', পৃঃ ১৮।

৯৫. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'বালবিধবা মাতঙ্গিনী ও সৌদামিনীর কথোপকথন', পৃঃ ৬১-৬২।

৯৬. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'অধিবেদন', পৃঃ ৭০-৭১।

৯৭. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'বাদী-প্রতিবাদী', পৃঃ ৩৪-৩৫।

৯৮. 'চিত্তবিলাসিনী', গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'দিবাবসানের শোভা', পৃঃ ১৩-১৪।

৯৯. চতুরঙ্গ পত্রিকা ১৩৯৭, আষাঢ় সংখ্যা, কবি কৃষ্ণকামিনী: 'চিত্তবিলাসিনী': বসন্তকুমার সামন্ত, হইতে সংগৃহীত, পৃঃ ২২১।

১০০. 'কবিতাহার', গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪৩৭।

১০১. 'কবিতাহার', গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, 'বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা' কবিতার ৩-৪ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪৪৮।

০২. 'কবিতাহার', 'সঙ্গিনীর বৈধব্য' কবিতার ৯-১০ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪৫৮।

১০৩. 'আভাষ' (১২৯৭) কাব্যগ্রন্থ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট হইতে, পৃঃ ১-২।

১০৪. 'আভাষ' (১২৯৭) কাব্যগ্রন্থ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট হইতে পৃঃ ২।

১০৫. 'আভাষ' (১২৯৭) কাব্যগ্রন্থ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট হইতে পৃঃ ৩-৬।

১০৬. 'আভাষ' (১২৯৭) কাব্যগ্রন্থ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট হইতে পৃঃ ৬।

১০৭. 'আভাষ' (১২৯৭) কাব্যগ্রন্থ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট হইতে, পৃঃ ৬।

১০৮. গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪০১।

১০৯. 'ভারতকুসুম', 'পতি-ভক্তি' কবিতার চতুর্বিংশতি স্তবক, ৩-৪ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী পৃঃ ৪৮৯।

১১০. 'আভাষ' (১২৯৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬।

১১১. 'আভাষ' (১২৯৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭।

১১২. 'আভাষ' (১২৯৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭।

১১৩. 'আভাষ' (১২৯৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭-৯।

১১৪. 'আভাষ', 'প্রকৃতি' কবিতার ৫-৬ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী (১৩৩৪), পৃঃ ৩।

১১৫. 'আভাষ', 'বাল্যস্মৃতি' কবিতার ১১-১২ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী (১৩৩৪), পৃঃ ১০।

১১৬. 'আভাষ', 'প্রেম' কবিতার ৮ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী (১৩৩৪), পৃঃ ১১৮।

১১৭. 'আভাষ', 'মালা' ছড়াগুচ্ছের 'নারী' শিরোনাম, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, (১৩৩৪), পৃঃ ৫৩।

১১৮. 'শিখা', 'প্রকৃতি' কবিতার ১৫-১৬ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী (১৩৩৪), পৃঃ ৩১৬।

১১৯. 'শিখা', 'অক্ষয়কুমার দত্ত' কবিতার ১৯-২০ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২৯৯।

১২০. 'শিখা', 'শিখা' কবিতার ৬-৮, ১৫-১৬ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬।

১২১. 'সিন্ধুগাথা', 'নববৈধব্য' কবিতার ৩ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৩৬৯।

১২২. 'সিন্ধুগাথা', 'বঙ্কিমচন্দ্র' কবিতার ষষ্ঠ স্তবক, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৩৯১।

১২৩. 'অর্ঘ্য', 'অর্ঘ্য' কবিতার ১-২ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১২২।

১২৪. 'অর্ঘ্য', 'প্রভেদ' কবিতার ১-২, ৯-১০ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১২৫।

১২৫. 'অর্ঘ্য', 'কবিযশ' কবিতার ৭-৮ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১২৭।

১২৬. 'অর্ঘ্য', 'মরণের প্রতি', কবিতার ৫-৮ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, ১৫৩।

১২৭. 'স্বদেশিনী', গিরিন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪১১।

১২৮. 'স্বদেশিনী', 'আহ্বানগীত' কবিতার দ্বিতীয় স্তবক, ১৩-১৬ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, (১৩৩৪), পৃঃ ৪১৫।

১২৯. 'স্বদেশিনী', 'রাখীমন্ত্র' কবিতার দ্বিতীয় স্তবক' ১৫-১৮ পংক্তি পৃঃ ৪১৮-৪১৯।

১৩০. 'স্বদেশিনী', 'আগমনী' কবিতার ১৯-২০ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪২১।

১৩১. 'স্বদেশিনী', 'অঙ্গচ্ছেদ' কবিতার ১৩-১৪ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪১৭।

১৩২. 'স্বদেশিনী', 'শিবাজী উৎসব' কবিতার ৪-৭ পংক্তি গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪২২-৪২৩।

১৩৩. 'স্বদেশিনী, 'আদেশবানী' কবিতার, ষষ্ঠ স্তবকের ১-২ পংক্তি, অষ্টম স্তবকের ৩ পংক্তি, পৃঃ ৪২৪।

১৩৪. 'স্বদেশিনী', 'সমুদ্রগর্জন শ্রবণে' কবিতার ১৩-১৪ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪৩৬।

১৩৫. 'অশ্রুকনা', 'উপহার' কবিতার ৭-১০ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী, গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১৮০।

১৩৬. 'অশ্রুকণা', 'কোথায়' কবিতার ৭-১২ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১৮৭।

১৩৭. 'অশ্রুকণা', 'প্রেমময়ী' কবিতার ১-২ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২৪৪।

১৩৮. 'অশ্রুকণা', 'ধ্রুব' কবিতার ৬-৯ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১৯৩।

১৩৯. 'অশ্রুকণা', 'ছয় বছর' কবিতার ১০-১১ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২১৪।

১৪০. 'অশ্রুকণা', 'তুমি' কবিতার ১-৩ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২০৭।

১৪১. 'অশ্রুকণা', 'আজ' কবিতার ৭-১০ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১৯৯।

১৪২. 'অশ্রুকণা', 'মাধবী' কবিতার ১৩-১৫ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২১৮।

১৪৩. 'অশ্রুকণা', 'ছাই' কবিতার ২২-২৫ পংক্তি. গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১৯৭।

১৪৪. 'অশ্রুকণা', 'প্রেমাঞ্জল' কবিতার ১৯-২০ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২০৬।

১৪৫. 'অশ্রুকণা', 'প্রভাতে' কবিতার ৯-১০ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২০১।

১৪৬. 'অশ্রুকণা', 'গোলাপ' কবিতার ১১-১৪ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২২৭।

১৪৭. 'অশ্রুকণা', 'সুধা না গরল' কবিতার ৭-১১ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২৩৭।

১৪৮. 'অশ্রুকণা', 'গ্রাম্যছবি' কবিতার ৫-৮ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২২৪।

১৪৯. 'অশ্রুকণা', 'গার্হস্থ্যচিত্র' কবিতার ১-৪ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২২৫।

১৫০. 'সাহিত্য' পত্রিকা (১২৯৮) দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সংগৃহীত।

১৫১. 'আভাষ' (১২৯৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৯-১২।

১৫২. 'আভাষ' (১২৯৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৪।

১৫৩. 'আভাষ' (১২৯৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৪-১৫।

উপসংহার

উনবিংশ শতাব্দীর লেখিকাদের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও নিতান্ত নগণ্য নয়। এঁদের মধ্যে সকলের রচিত প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, কবিতা ইত্যাদি আলোচিত না হলেও বেশ কয়েকজন বিশেষ করে তদানীন্তন সময়কার উল্লেখ্য লেখিকার বিভিন্ন রচনা এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে। তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকজন ব্রাহ্মমহিলা লেখিকা, তৎসঙ্গে হিন্দু মহিলার বিভিন্ন রচনা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন মহিলাও ছিলেন।

আলোচনান্তে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তারমধ্যে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বেশ কয়েক শতকের বঞ্চিত নারীর স্ব-অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবার দাবি জানিয়ে যে লেখিকারা কলম ধরেছেন তাদের মধ্যে কৈলাসবাসিনী দেবী অগ্রগণ্য। তিনি তাঁর 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩) প্রবন্ধ গ্রন্থে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন যেখানে নারীর দুরাবস্থার প্রতিবাদে তাঁর কণ্ঠ সোচ্চারিত হয়েছে। সমাজে নারীকে যেভাবে নির্যাতিত হতে হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ করেছেন লেখিকা।

স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, বিধবাবিবাহের পক্ষে, বাল্যবিবাহ রোধে কৈলাসবাসিনী দেবী ছাড়াও বেশ কয়েকজন লেখিকার লেখনী সক্রিয় হয়েছে। অবশ্য এ-প্রবন্ধের আলোচনাকে গুটিয়ে আনবার তাগিদেই আমাদের কিছুটা পরিমিতি বজায় রেখে এবং যথোচিত আলোচনা করা দরকার। আর সেই কারণেই যদি তদানীন্তন লেখিকাদের বিবিধ রচনার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত বক্তব্য খুঁজতে চেষ্টা করা যায় তবে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে যথা—

১। সামাজিক বক্তব্য।

২। রাজনৈতিক, দেশাত্মবোধক বক্তব্য।

৩। ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে বক্তব্য।

৪। জীবনী, আত্মজীবনীর কথা।

৫। বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য।

উল্লিখিত বক্তব্যগুলি কিভাবে তদানীন্তন লেখিকাগণের রচনায় প্রবেশ করেছে সে বিষয়ে অবগতির জন্য কিছুটা তথ্যের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। সামাজিক বক্তব্য তদানীন্তন লেখিকাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকের রচনাতেই কম বেশী স্থান পেয়েছে। প্রকারভেদে এর প্রকাশ ঘটেছে, যথা—পারিবারিক বিষয়, শিক্ষা, বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং নানান কুসংস্কার বিষয়ক রচনার সমাবেশ ঘটেছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা', 'কাহাকে', এবং প্রসন্নময়ীদেবীর 'অশোকা' উপন্যাসে যেখানে তদানীন্তন হিন্দু-সমাজের নারীর অন্তরের প্রেম, ব্যথা, বঞ্চনা, না পাবার যন্ত্রণা, মুখ বুজে সহ্য করবার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। বিনোদিনীর 'কনক ও নলিনী' কাব্যগাথা এবং মানকুমারী বসুর 'বনবাসিনী' স্বল্পদৈর্ঘ্যের উপন্যাসে পরিবারের নারীর দেনা-পাওনার চুলচেরা হিসেবের উল্লেখ আছে যেখানে আর্থিক চাপ বা স্বচ্ছলতার অভাব নারীকে সমাজ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি, একই সঙ্গে নারীর মাতৃত্ব রূপের প্রকাশ ঘটিয়ে লেখিকা তার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন।

স্ত্রীশিক্ষার কথা বলেছেন কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' প্রবন্ধে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধে এবং কৃষ্ণকামিনী দেবীর 'চিত্তবিলাসিনী' গদ্য ও পদ্য আখ্যায়িকায় এ বিষয়ে লেখনী সোচ্চারিত হয়েছে।

তদানীন্তন নানান কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখা নারীর যন্ত্রণা এবং তার প্রতিবাদের কথা প্রকাশ পেয়েছে শরৎকুমারী চৌধুরানীর যথাক্রমে—'সোনার ঝিনুক', 'যৌতুক', 'কলিকাতার স্ত্রীসমাজ', 'মেয়েযজ্ঞি', 'কন্যাদায়', 'একাল ও একালের মেয়ে', 'শাশুড়ী ও বৌ', 'আদরের না অনাদরের' প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে এবং 'শুভবিবাহ' উপন্যাসে। নারীসমাজের সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ফুটে উঠেছে শরৎকুমারী দেবীর উক্ত রচনায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য শরৎকুমারী দেবীর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মন্তব্য করেছেন তা হোলো, মেয়েদের কথা বলবার জন্যই সার্থক এই লেখিকা।

ব্রাহ্ম সমাজের কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে রাজলক্ষ্মী দেব্যার রচনায়।

সমাজের নারী যে কতখানি সহনশীলা তার পরিচয় ফুটে উঠেছে হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা'—গ্রন্থের বিষয় বস্তুতে।

তদানীন্তন লেখিকাগণের কলমে রাজনৈতিক বক্তব্যের সমাবেশ পরিলক্ষিত না হলেও দু'একজন লেখিকার কলমে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, যিনি তদানীন্তন সমাজে বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন প্রতিভাময়ী লেখিকা। তাঁর 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। 'ফুলের মালা' উপন্যাসখানিতে লেখিকা সামাজিক একঘেয়েমিকে কাটিয়ে উঠে ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে সঙ্গে নিয়ে উপন্যাসের পূর্ণতা এনেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ছাড়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মহর্ষিপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর রচনা দেশাত্মবোধ এবং বিদ্রোহের কথা বলে—প্রবন্ধ 'ইংরাজনিন্দা ও দেশানুরাগ', বড়গল্প 'আশ্চর্য্য পলায়ন'। তাঁর অনুবাদ সাহিত্য 'ভাউসাহেবের বখর' ইতিহাসাশ্রিত লেখা। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর কাব্যগ্রন্থ 'স্বদেশিনী'তে দেশাত্মবোধের কথা বলা হয়েছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মিসেস হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স মূলতঃ ধর্মীয় প্রচারার্থে যে উপন্যাসখানি লেখেন সম্ভবতঃ এ'টি প্রথম বাঙ্গলা উপন্যাস। মিসেস ম্যালেন্স এ-উপন্যাসে স্ত্রীলোকের নানান আচরণ বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে তদানীন্তন লেখিকাদের কলম যথেষ্ট সোচ্চার না হলেও এর পক্ষে কোনো প্রশ্ন স্থান পায়নি। বরং ভারতের ঐক্যতার বন্ধন দৃঢ় করেছেন হেমলতা সরকার তাঁর 'ভারতের ইতিহাস' প্রবন্ধে।

আত্মজীবনের দুঃখবেদনার কথা তুলে ধরেছেন মানকুমারী বসু তাঁর 'প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়' গ্রন্থের ছোট ছোট প্রবন্ধে, যেখানে লেখিকার বেদনা যেন সমাজের সমগ্র সদ্য বিধবা যুবতীর কথা যার প্রতিটি শব্দ বাস্তবকে ছুঁয়ে আছে। প্রসন্নময়ীর দেবীর 'তারাচরিত', ইন্দিরা দেবীর 'প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-মহাশয়ের জীবন চরিত ও প্রবন্ধ কুসুম' প্রবন্ধ গ্রন্থের বিষয়বস্তু জীবনীমূলক যার প্রতিটি চরিত্রই লেখিকার অত্যন্ত নিকটাত্মীয়কে নিয়ে। মহিলা কবিদের কাব্যগ্রন্থের রচিত কবিতার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছে, এঁরা হলেন অনঙ্গমোহিনী দেবী, অন্নদাসুন্দরী দেবী, ইন্দুমতী দাসী, কামিনী সুন্দরী দাসী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রমুখ। ভ্রাতৃবিয়োগ,

পতি-বিয়োগ, মাতা-পিতা বিয়োগের কথা এবং স্বজীবনের বেদনার নানান বাস্তব অভিজ্ঞতার ছবি ফুটে উঠেছে উক্ত মহিলা কবিদের রচনায়।

বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ তৎকালীন লেখিকাদের কলমে একেবারেই জোরদার নয়। কিন্তু, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' গ্রন্থটি এর ব্যতিক্রম—এ'টি সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের পুস্তক।

মুসলমান নারী পর্দানসীন। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী সমাজ, যেখানে হিন্দু নারীর স্থানই ছিল পর্দার আড়ালে। এমতাবস্থায় মুসলিম লেখিকার কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সেই সময় মুসলমান মহিলার রচনাও চোখে পড়ে। গদ্যে-পদ্যে লেখা ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর 'রূপজালাল' (ঢাকা—১৮৭৬) প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে মর্যাদাপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর 'রূপজালাল' গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম লেখিকার রচনা আলোচিত হয়নি, তবে একথাও ঠিক যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম লেখিকার সংখ্যা নগণ্যই ছিল। এর কারণ অবশ্যই নারীর পর্দাপ্রথা—বিশেষ করে মৌলবাদীর শিকার স্বয়ং মুসলিম নারী, যাঁকে সর্বদাই বোরখার আড়ালে থাকতে হোতো। তুলনামূলকভাবে বিংশ শতাব্দীর লেখিকাগণের মধ্যেও মুসলিম লেখিকার সংখ্যা কম। 'রূপজালাল'—গ্রন্থে লেখিকার রচনাশৈলী, ঘটনা বিন্যাসের সমতা পাঠককুলের উপভোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখিকাদের রচনার বিষয়বস্তু এবং ধারাবাহিকতায় কিছুটা গণ্ডীবদ্ধতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হলেও বেশ কয়েকজন লেখিকা এ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে তাঁদের রচনায় সমাজের নানান দিকের প্রতি আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন। পূর্ণসফলতা না এলেও সে শতাব্দীর প্রতিভাময়ী কয়েকজন লেখিকার প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য। যদিও বেশীর ভাগ লেখিকার লেখনীতে নারীর কথা প্রকট হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ'দের মধ্যে কারো কারো কলম নারীর লাঞ্ছনার, বঞ্চনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। প্রশ্ন এসে যায়, উক্ত শতাব্দীর লেখিকাগণের রচনায় সাধারণ মানুষের অর্থাৎ যারা সমাজের নীচুতলার মানুষ, অবহেলিত, বঞ্চিত, তাদের কথা স্থান পেয়েছে কিনা। উত্তরে বলা যায় যে, পরোক্ষভাবে এঁদের কিছু কিছু রচনায় সাধারণ মানুষের কথা উঁকি মারলেও প্রত্যক্ষভাবে এ ধরনের লেখা বলতে গেলে অনুপস্থিত। অবশ্য আলোচিত রচনাগুলির মধ্যে মানকুমারী বসুর 'বনবাসিনী'-তে কিছুটা

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাধান্য এসে পড়লেও অর্থের অভাবে লোকালয় ছেড়ে বনবাসী হবার ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অভাবেও মনুষ্যত্ব অক্ষুন্ন রাখবার পরিচয় মিলেছে।

সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতিফলনই সমকালীন সাহিত্য। সেই কারণে উনবিংশ শতকের তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যে। পর্দানসীন নারীর পক্ষে তাই সমাজের সমস্ত অংশের মানুষজনের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়নি। তবুও তৎকালীন লেখিকাগণের কলমে দৃঢ়তা প্রকাশের যথেষ্ট পরিচয় মেলে।

॥ পরিশিষ্ট ॥

লেখিকাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অনঙ্গমোহিনী দেবী—ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য-এর কন্যা। স্বামীর নাম গোপীকৃষ্ণ। সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন অনঙ্গমোহিনী দেবী, শিল্প নৈপুণ্যে আমেরিকা ও জাপান থেকে প্রশংসা লাভ করেন। তাঁর কবিতা একসময়ে প্রায় সব বাংলা মাসিক পত্রেই নিয়মিত প্রকাশিত হত। রচিত কাব্যগ্রন্থ, 'কণিকা', 'শোকগাথা' (১৩১৩), 'প্রীতি' (১৩১৭ বঙ্গাব্দ)।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১৮৫৮, ১৮ আগষ্ট, কলকাতা ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর কাব্যানুরাগ প্রকাশ পায়। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি আধ আধ ভাষায় বলতেন—

আমার নামটি বাবু চাঁদা।
পাখী মারি, ভাত খাই, চোখে লাগাই ধাঁধা।

দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর যা কিছু লেখাপড়া গৃহে পিতা এবং স্বামীর কাছে। ১৮৮৪ সালে স্বামী নরেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হলে রচনা করেন বিখ্যাত শোককাব্য 'অশ্রুকণা'। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল 'অশ্রুকণা'র কবিতা নির্বাচন করেছিলেন। তিনি ছিলেন অন্তঃপুরবাসিনী; সেজন্য তাঁর কবিতা অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ্যচিত্র সম্পন্ন এবং আত্মগত। পরবর্তী কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব স্বীকৃত হয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় সখ্য ছিল। তিনি ছবি আঁকতেও পারতেন। ১৩১৪ থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি 'জাহ্নবী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর কাব্য গ্রন্থ সংখ্যা নয়টি, যথাক্রমে—'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম', 'অশ্রুকণা', 'আভাষ', 'অর্ঘ্য', 'শিখা', 'স্বদেশিনী', 'সিন্ধুগাথা', 'সন্ন্যাসিনী'। পাঁচটি পত্র সম্বলিত তাঁর রচিত এবং প্রকাশিত গ্রন্থ 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' (১৮৭২)। তিনি ১৯২৪ সালে পরলোকগমন করেন।

রাজলক্ষ্মী দেব্যা—নদীয়া জেলার শান্তিপুরে আনুমানিক ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস যশোহর জেলার বাঘআঁচড়া গ্রাম।

তাঁর পিতা ছিলেন প্রাণনাথ মল্লিক। কৈলাসচন্দ্র বাগচীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মী দেবীর বিবাহ হয়। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি উপাসনায় যোগ দেন। পাঁচ পুত্রের জননী তিনি। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, খুব বেশী লেখাপড়া শেখেননি। তাঁর লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব'-এ তাঁর নিজের কথা ছাড়াও ব্রাহ্ম সমাজের অনেক সংবাদ আছে। প্রৌঢ় বয়সে বাগচী দম্পতির ধর্মমতের পরিবর্তন হয় এবং নব হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে রাজলক্ষ্মী দেবী রচনা করেন 'কেদার-বদরী ভ্রমণ কাহিনী' এবং 'নেপালের পথে' ভ্রমণ কাহিনী। এছাড়া রচনা করেন 'ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস মহারাজের জীবনস্মৃতি'। 'নেপালের পথে' গ্রন্থটি যখন তিনি রচনা করেন তখন তাঁর বয়স সত্তর।

মিসেস হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স—হানা ক্যাথেরীন ল্যাকরয় কলকাতায় ১৮২৬, ১লা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন ইংরেজ, খৃষ্টান মিশনারী সমাজের মহিলা। তাঁর কর্মক্ষেত্র মুখ্যতঃ মিশনারী সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তিনি গতানুগতিক খৃষ্টান ধর্মমতে আস্থাশীল ছিলেন। ১৮৪৫, ১৯ জুন মিঃ জে. ম্যলেন্সের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁর রচিত উপন্যাস "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" কলকাতার খৃষ্টান ট্র্যাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তিনি খৃষ্টানধর্ম প্রচারের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত উক্ত উপন্যাসখানির বিষয়বস্তুতে এ ধর্মপ্রচারের কথাই গুরুত্ব পেয়েছে। ১৮৬১, ২১শে নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

শরৎকুমারী চৌধুরানী—বাংলা সাহিত্য জগতের একজন বিশিষ্ট লেখিকা। জন্ম হয় মাতুলালয় চানকে (ব্যারাকপুরে) ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ১ শ্রাবণ (১৮৬১ সাল, ১৫ জুলাই)। দুই বছর বয়সে তিনি পিতার নিকট লাহোরে যান এবং সেখানেই তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তিন বছর বয়সে তিনি স্থানীয় বঙ্গ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁর 'প্রবাসের পাঠশালা' প্রবন্ধে এই বিদ্যালয়ের একটি সুন্দর চিত্র আছে। ১৮৭১, ১২ মার্চ ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ট বন্ধু, সদ্য এম. এ. পাশ করা অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি পুনরায় পিতার সহিত লাহোরে চলে যান। এর বছর পাঁচেক পরে তিনি কলকাতায় স্বামীর কাছে চলে আসেন। 'ভারতী' সম্পাদকীয় চক্রের তিনি উৎসাহী সভ্য ছিলেন। শরৎকুমারীর বহু রচনা তৎকালীন বেশকিছু সাময়িক

পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করে আছে। যথাক্রমে—'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি। নারী বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ, গল্প উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একমাত্র 'শুভবিবাহ' ছাড়া শরৎকুমারী দেবীর আর কোন রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। ১৯২০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

সরোজকুমারী গুপ্তা—১৮৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মথুরানাথ গুপ্ত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন 'ট্রিবিউন', 'প্রভাত' প্রভৃতি পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৮৮৬ সালে কলকাতার কলুটোলার যোগেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে বিবাহ হয়। তিনি শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করেন সাহিত্যানুরাগের সঙ্গে একাত্ম হয়েই। তাই তাঁর লেখা ১২৯৫ বঙ্গাব্দ থেকে 'ভারতী' পত্রিকায় এবং ১২৯৭ বঙ্গাব্দ থেকে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশ পেতে শুরু করে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ—'হাসি ও অশ্রু', 'শতদল', 'অশোকা'। গল্পগ্রন্থ 'কাহিনী', 'অদৃষ্টলিপি', 'ফুলদানি' প্রভৃতি। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প নিয়ে একত্রে প্রকাশিত গ্রন্থ 'কাহিনী ও ক্ষুদ্রগল্প সংকলন'। ১৯২৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

উল্লেখপঞ্জী

প্রথম অধ্যায় ঃ

১। বাংলার বিদ্বৎসমাজ—বিনয় ঘোষ, কলিকাতা ১৯৭৮।

২। সাধক সাহিত্য চরিতমালা—যোগেশচন্দ্র বাগল।

৩। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতা ১৯৬৩।

৪। স্ত্রী শিক্ষা—যোগেশচন্দ্র বাগল।

৫। আদিম কলকাতা ও বঙ্গসমাজ—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।

৬। এ নগরীর নারীকথা—কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, কলকাতা ১৯৯১।

৭। শিক্ষার অঙ্গনে এদেশের নারী—কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, কলকাতা ১৯৯৩।

৮। A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjee
—Ramchandra Ghosh

৯। প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য—সুকুমারী ভট্টাচার্য।

১০। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র—ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১১। হিতকারীসভা স্ত্রীশিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
—ডঃ বসন্তকুমার রায়।

১২। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আলোকে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, কলকাতা ১৯৮৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

১। আমার জীবন -রাসসুন্দরী দেবী।

২। আত্মকথা—সারদাসুন্দরী দেবী।

৩। হিন্দু ফিমেলস্ বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা
—কৈলাসবাসিনী দেবী।

৪। সেকালের কথা—নিস্তারিণী দেবী।

৫। আত্মকথা—কৈলাসবাসিনী মিত্র।

৬। পিতৃস্মৃতি—সৌদামিনী দেবী।

৭। কল্যাণপ্রদীপ—মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়।

৮। অন্তপুরের আত্মকথা—চিত্রাদেব।

৯। পুরাতনী—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

১০। আমাদের কথা—প্রফুল্লময়ী দেবী।

১১। সেকালের কথা— স্বর্ণকুমারী দেবী।

১২। সাধক সাহিত্য চরিতমালা—যোগেশচন্দ্র বাগল।

১৩। পূর্ব্বকথা—প্রসন্নময়ী দেবী।

১৪। জীবনীস্মৃতি—সুদক্ষিণা দেবী।

১৫। আমার সংসার—শরৎকুমারী দেবী।

১৬। আমার খাতা—ইন্দিরা দেবী।

১৭। জীবনের দৃশ্যমালা—কৃষ্ণভাবিনী দাসী।

১৮। জীবন কথা—লীলাবতী মিত্র।

১৯। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনরচিত—হেমলতা সরকার।

২০। জীবনের ঝরাপাতা—সরলাদেবী চৌধুরাণী।

২১। বামা বোধিনী পত্রিকা, ১২৯৫, আষাঢ়, শ্রাবণ।

২২। ভারতী ও বালক পত্রিকা ১২৯৮, আশ্বিন, কার্ত্তিক।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

১। হিন্দু ফিমেলস্ বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা (১৭৮৫ শক)
—কৈলাসবাসিনী দেবী।

২। হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভাস ও তাহার সমুন্নতি (১৭৮৭ শক)
—কৈলাসবাসিনী দেবী।

৩। পৃথিবী, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ—স্বর্ণকুমারী দেবী।

৪। তারাচরিত, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ—প্রসন্নময়ী দেবী।

৫। রচনাবলী, শ্রাবণ ১৩৫৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
—শরৎকুমারী চৌধুরানী।

৬। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুসুম, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ
—ইন্দিরা দেবী।

৭। প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়, ১৩২২ বঙ্গাব্দ—মানকুমারী বসু।

৮। ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব—রাজলক্ষ্মী দেব্যা।

৯। ভারতী পত্রিকা ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, চৈত্র ; ১২৯০ বঙ্গাব্দ, মাঘ সংখ্যা।

১০। প্রবাসী পত্রিকা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ কার্ত্তিক-চৈত্র সংখ্যা।

১১। মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কার্তিক সংখ্যা।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

১। দীপনির্বাণ, ১৮৭৬ সাল—স্বর্ণকুমারী দেবী।

২। ছিন্নমুকুল, ১৮৭৯ সাল—স্বর্ণকুমারী দেবী।

৩। স্নেহলতা (১৮৯০ ১ম), (১৮৯৩ ২য়)—স্বর্ণকুমারী দেবী।

৪। বিদ্রোহ, ১৮৯০ সাল—স্বর্ণকুমারী দেবী।

৫। ফুলের মালা, ১৮৯৫ সাল—স্বর্ণকুমারী দেবী।

৬। কাহাকে, ১৮৯৮ সাল—স্বর্ণকুমারী দেবী।

৭। অশোকা, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ—প্রসন্নময়ী দেবী।

৮। শুভ বিবাহ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ—শরৎকুমারী চৌধুরানী।

৯। কনক ও নলিনী (১৯০৫ সাল)—বিনোদিনী দাসী।

১০। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র সংখ্যা।

১১। রূপজালাল (বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে মোঃ আবদুল কুদ্দুস সম্পাদিত গ্রন্থ ১৯৮৪ সাল)—ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী।

১২। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ—হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স (নতুন সংস্করণ, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ)।

১৩। মনোরমা, ১২৮১ বঙ্গাব্দ—হেমাঙ্গিনী দেবী।

১৪। কাহিনী ও ক্ষুদ্রগল্প সংকলন (১৩১৫ বঙ্গাব্দ)—সরোজকুমারী গুপ্তা।

১৫। শোক গাথা, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ—অনঙ্গমোহিনী দেবী।

১৬। প্রীতি, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ—অনঙ্গমোহিনী দেবী।

১৭। অবলাবিলাপ—অন্নদাসুন্দরী দেবী।

১৮। দুঃখমালা—ইন্দুমতী দাসী।

১৯। কল্পনাকুসুম—কামিনীসুন্দরী দাসী।

২০। চতুরঙ্গ পত্রিকা, ৫১ সংখ্যা ৩রা জুলাই ১৯৯০ সাল।

২১। রচনাবলী (বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) —গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত।

২২। আভাষ—গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত।

———